Contents

দিগদর্শন-২

(সম্পাদকীয় সংকলন)

[১২/১ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮ হ'তে ১৮/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত]

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

معالم الطريق–٢

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৫৭
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

১ম প্রকাশ
রজব ১৪৩৭ হি.
বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
১০০ (একশত) টাকা মাত্র

Digdorshon-2 [Compilation of Editorials (Oct 2008-Sept 2015) of Monthly At-Tahreek] by the Founder & Chief Editor **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-

প্রকাশকের নিবেদন

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা **মাসিক আত-তাহরীক**-এর শুরু হয়েছিল **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুখপত্র হিসাবে। যা ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। দেশের সার্বিক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে 'আত-তাহরীক' তার আপোষহীন ভূমিকা শুরু থেকে এ যাবৎ অব্যাহত গতিতে পালন করে যাচ্ছে। যার সুফল দেশে ও দেশের বাইরে সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতি গতানুগতিকতা ছেড়ে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় জীবনে সংস্কারের এক নতুন স্পন্দন শুরু হয়েছে।

এই আন্দোলনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে নিজেই এর সম্পাদকীয় সমূহ লিখতেন এবং আজও লিখে চলেছেন। তবে মাঝে-মধ্যে সাথীদের দিয়ে লিখাতেন তাদের হাত পাকা করার জন্য। যার সুফল তিনি পেয়েছিলেন যখন তিনি দীর্ঘদিন কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাতে গড়া সাথীরা সৎসাহসের সাথে পত্রিকা চালিয়ে গেছেন। একটি সংখ্যাও বন্ধ হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

ইতিপূর্বে আমরা মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের কারাগার-পূর্ব ৭৯টি সম্পাদকীয় (সেপ্টেম্বর ১৯৯৭-মার্চ ২০০৫ইং) নিয়ে ১০টি শিরোনামে একত্রিতভাবে দিগদর্শন-১ প্রকাশ করেছি। এক্ষণে তাঁর কারামুক্তির পর থেকে সেপ্টেম্বর'১৫ পর্যন্ত লিখিত ৭২টি সম্পাদকীয় নিয়ে দিগদর্শন-২ বের করলাম। যেগুলি ১০টি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় হ'ল আন্দোলনের প্রাণ। এর মাধ্যমে যেমন আন্দোলন-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যাবে, তেমনি অনেক পুরানো তথ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। সে দিক বিবেচনায় সম্পাদকীয় সমূহ হ'ল স্ব স্ব সময়ের দর্পণ স্বরূপ। জ্ঞানী পাঠকের নিকট তা মূল্যবান খোরাক হবে বলে আমরা আশা করি। ইতিপূর্বে 'দর্শন' বিষয়ক ১৬টি সম্পাদকীয় নিয়ে 'জীবন দর্শন' নামে প্রকাশিত বইটি সকলের অন্তর কেড়েছে। দিগদর্শন-১ একইভাবে সাড়া জাগিয়েছে। আশা করি দিগদর্শন-২ বিদগ্ধ পাঠকগণের সম্মুখে সমাজ পরিবর্তনে নতুন চিন্তার দুয়ার সমূহ খুলে দিবে। আল্লাহ মাননীয় লেখককে এবং গবেষণা বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন -আমীন!

বিনীত

-প্রকাশক

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্মাদুহু ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম

ধর্মীয়

১. আলোর পথ

মানুষকে আল্লাহ জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই সাথে তার জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য ইবলীসকে পাঠিয়েছেন। তাকে অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছেন বিভিন্ন যুক্তিতর্কে ও প্রলোভনে মানুষকে তার সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক থেকে বিভ্রান্ত করতে। বান্দা যেন শয়তানের ফাঁদে পড়ে বিপথে না যায় সেজন্য আল্লাহ দয়া করে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর হেদায়াত সমূহ প্রেরণ করেছেন। যারা তার অনুসরণ করবে তারা সুপথে থাকবে। আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা শয়তানের তাবেদার হবে। মূলতঃ এটাই হ’ল পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে এবং পরকালে জান্নাত-জাহান্নাম নির্দিষ্ট হবে। আল্লাহ্র দেখানো পথ হ’ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। যাকে হাদীছে ‘উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ’[১] তথা আলোর পথ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের পথকে কুরআনে ‘জাহেলিয়াত’ ও ‘যুলুমাত’[২] অর্থাৎ মূর্খতা ও অন্ধকারের পথ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি সোজা রাস্তা, যার দু’পাশে খাড়া প্রাচীর রয়েছে। তাতে খোলা দরজা সমূহ রয়েছে। যাতে পর্দা ঝুলানো আছে। রাস্তার মাথায় একজন আহ্বানকারী আছেন, যিনি লোকদের ডেকে বলছেন, তোমরা সোজা পথ ধরে এসো, আঁকাবাঁকা পথে নয়। তার উপরে আরেকজন আহ্বানকারী আছেন যে সর্বদা তাকে আহ্বান করে। যখনই বান্দা ডান-বামের দরজা খুলতে চেষ্টা করে, তখনই তাকে ডাক দিয়ে বলে, সর্বনাশ দরজা খুলো না। কেননা একবার খুললেই তুমি তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর উদাহরণটির ব্যাখ্যা দিয়ে

১. আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭, সনদ হাসান।
২. আলে ইমরান ৩/১৫৪, মায়েদাহ ৫/৫০; বাক্বারাহ ২/২৭৭।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, সরল পথটি হ'ল 'ইসলাম'। খোলা দরজাগুলি হ'ল আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। ঝুলানো পর্দাগুলি হ'ল আল্লাহর সীমারেখা সমূহ। রাস্তার মাথায় আহ্বানকারী হ'ল 'কুরআন'। আর তার উপরে আহ্বানকারী হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উপদেশদাতা, যা প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে বিরাজ করে'।[৩] এই উপদেশদাতাকে কুরআনে 'নফসে লাউয়ামাহ' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)* অর্থাৎ তিরষ্কারকারী নফস বলা হয়েছে। এটাই হ'ল সুস্থ বিবেকের তাড়না বা কষাঘাত। যদি আল্লাহ এটা না করতেন, তাহ'লে সারা পৃথিবীতে শয়তানের একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম হয়ে যেত। বিবেক ও মনের দ্বন্দ্বে যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, কুরআন ও হাদীছ তথা আল্লাহ্র অহী তখন তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। এর বাইরের পথ দুনিয়াবী প্রলোভনের পথ, তাগূত ও শয়তানের পথ। যারা দুনিয়ায় মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি চায়, তারা অহীর পথ আঁকড়ে ধরে থাকে এবং শয়তানী ধোঁকা হ'তে দূরে থাকে।

বিভিন্ন নামে ও মুখোশে শয়তান যুগে যুগে তার প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। কখনো শয়তান সাময়িকভাবে জয়ী হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে সে সর্বদা পরাজিত। তার কৌশল সর্বদা দুর্বল *(নিসা ৪/৭৬)*। বিগত যুগের 'আদ, ছামূদ, নমরূদ ও ফেরাউনরা যেমন ধ্বংস হয়েছে, এযুগের ফেরাউনরাও তেমনি সর্বদা মার খাচ্ছে ও খাবে। কিন্তু শয়তানের তাবেদাররা এগুলো অনুধাবন করতে চায় না। তারা সিডর-নার্গিস, ঝড়-বন্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে এবং যালেম নেতা-নেত্রীদের চূড়ান্ত পরিণতিকে রাজনৈতিক বিপর্যয় বলে। এসবের পিছনে আল্লাহ্র নির্দেশ যে কার্যকরী আছে, সেকথা এরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না।

সম্প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের উপর দিয়ে যে নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেল, তাতে নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের সাময়িক কষ্ট হ'লেও তাদের ঈমান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে তারা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের ঈমানের পরীক্ষা বলে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে তারা পরকালে নাজাতের আশা করেন। তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাদের হৃদয়ের কান্না শুনেছিলেন।

---

৩. আহমাদ হা/১৭৬৭১; মিশকাত হা/১৯১, সনদ ছহীহ।

ফলে নির্যাতনকারীদের উপরে আল্লাহ্‌র যে কঠোর শাস্তি ও মর্মান্তিক দুনিয়াবী গযব নেমে এসেছে এবং যা এখনও অব্যাহত রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে কোন দেশে আছে কি? বাংলাদেশে এমন কোন রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, যারা ওদের টুটি চেপে ধরতে পারত। তাই ঈমানদার মযলূমদের পক্ষে আল্লাহ নিজ হাতেই ওদের দমন করেছেন। এরপরেও কি লোকদের চোখ খুলবে না?... বস্তুতঃ ঈমানদারগণকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব *(রূম ৩০/৪৭)*।

ইসলামের অনুসারীদেরকে প্রকৃত ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য শত্রুরা নিত্যনতুন মতবাদের জন্ম দেয় ও মুসলিম দেশগুলিতে তার পরীক্ষা চালায়। এজন্য তারা ব্যয় করে অঢেল অর্থ। তাদের সর্বোচ্চ থিংক ট্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট (২০০৭) অনুসারে, পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পার্টনার হ'ল মুসলমানদের মধ্যকার চারটি দল : ধর্মনিরপেক্ষ (Secularists), উদারপন্থী (Liberals), মডারেট সুন্নী (Moderate traditionalists) এবং ছূফী (Sufis)। এখানে 'মডারেট' বলতে ঐসব সুন্নীদের বুঝানো হয়েছে, যারা সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক। যাদের নিকট সবকিছুই হযমযোগ্য। তাদের ভাষায় They are natural allies of the west অর্থাৎ 'তারা হ'ল পাশ্চাত্যের স্বাভাবিক মিত্র'। অপরদিকে তারা সালাফীদের 'মৌলবাদী' (Fundamentalists) বলেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্য সকল দলকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করার জন্য মার্কিন সরকারকে ও পাশ্চাত্য শক্তিবলয়কে পরামর্শ দিয়েছেন। দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার দীর্ঘ এই রিপোর্টে সালাফীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার সত্ত্বেও এক স্থানে গবেষকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, Over the long term, the social costs of the spread of the salafi movement to the masses would be very high. অর্থাৎ 'দূর ভবিষ্যতে সালাফী দাওয়াত প্রসারের সামাজিক মূল্য জনগণের মাঝে অতি উচ্চে অবস্থান নিবে'। শুধু তাই নয়, রিপোর্টের শেষে পাশ্চাত্যের পোষ্য কিছু মুসলিম নামধারী লোকদের দিয়ে মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়েছে অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসার জন্য। আর আহ্বানকারী হিসাবে যে ১২ জনের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে আছে তাসলীমা নাসরীন, সালমান রুশদী, মারিয়াম নামাযী, মেহদী মুযাফফরী, আইয়ান হিরসী আলী প্রমুখ ধিকৃত লোকগুলি।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একমাত্র সালাফীরাই আছে অন্ধকারে। বাকী সব মুসলিম দল ফিরে গেছে তাদের দেখানো তথাকথিত আলোর পথে। আসলে কি তাই? অথচ ইসলামে মডারেট ও মৌলবাদী বলে কোন ভাগ নেই। কুরআন ও হাদীছের যথার্থ অনুসারী ব্যক্তিই হ'লেন প্রকৃত মুসলিম। আর সেকারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের উপরে নেমে এসেছে নির্যাতনের স্টীম রোলার বিদেশী শক্তিবলয়ের স্বার্থরক্ষাকারী এদেশীয় সরকারের মাধ্যমে। তাই এ মুহূর্তে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ঈমানদার ভাইদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা নির্যাতনের ভয়ে শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিবেন? নাকি নিজ আক্বীদা ও আমলের উপরে দৃঢ় থাকবেন? তারা সুদৃঢ় সাংগঠনিক ঐক্যের মাধ্যমে বাতিল শক্তির মুকাবিলা করবেন, নাকি শয়তানী মতবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করবেন? এরূপ কঠিন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যেকথা শুনিয়েছিলেন, আমরাও আমাদের সাথী ভাই-বোনদের সেকথা শুনাতে চাই। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। আমরা সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করি। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেখানো পথকেই আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ মনে করি। শয়তানের দেখানো আঁকাবাঁকা পথে আমরা যেতে চাই না। যুগের পরিবর্তনে ইসলামের কোন পরিবর্তন হয় না। বরং ইসলাম যুগকে পরিবর্তন করে। এটাই হ'ল চিরন্তন আলোর পথ। আর এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। বাকী সবই অন্ধকারের পথ। যার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে সুদৃঢ় রাখুন- আমীন![৪]

---

৪. ১২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮।
দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে কারা নির্যাতন ভোগের পর ২৮শে আগষ্ট'০৮ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বগুড়া যেলা কারাগার থেকে যামিনে বের হয়ে এটাই ছিল আমীরে জামা'আতের প্রথম সম্পাদকীয়।- প্রকাশক।

২. হে মানুষ! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে

‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই’। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, জীবন ও মরণ দাতা হিসাবে, আইন ও বিধানদাতা হিসাবে, রোগ ও আরোগ্যদাতা হিসাবে, রূযী ও শক্তিদাতা হিসাবে, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানদাতা হিসাবে, বিপদহন্তা ও হেফাযতকারী হিসাবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই, কোন শক্তি নেই। কোন উপাস্য নেই। যার তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধারক ও সবকিছুর ব্যবস্থাপক। বিপদে ও সম্পদে আমরা তাঁকেই ডাকি, তাঁর কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করি। তাঁকে রাযী-খুশী করার জন্যই আমরা আমাদের সবকিছুকে বিলিয়ে দেই। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে আমরা তাঁরই রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় চাই। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করার মত সাধ্য আমাদের নেই। পুলছিরাতের নীচের জ্বলন্ত অগ্নিগহ্বরে আমি পড়তে চাই না। সেখানকার বাঁকানো আংটায় আমি বিঁধে যেতে চাই না। আমি ঐ উত্তপ্ত হুতাশন পেরিয়ে যেতে চাই বিদ্যুৎ বেগে, আলোর গতিতে। যেন জাহান্নামের অগ্নিদাহের কোন আঁচ আমার গায়ে না লাগে। চোখের পলকে পুলছিরাত পেরিয়ে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই। এজন্য আমি দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে কেবল আল্লাহ্‌রই বিধান মানতে চাই। তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলতে চাই। কিন্তু ....

কিন্তু আমি পারছি কই! কে আমাকে বাধা দিচ্ছে? হ্যাঁ, বাঁধা আমার ঘরে-বাইরে, চারপাশে সর্বত্র। আল্লাহ্‌কে পেতে গেলে গায়রুল্লাহকে ত্যাগ করতে হয়। পুণ্য অর্জন করতে গেলে পাপ বর্জন করতে হয়। আল্লাহ্‌র দাসত্ব করলে শয়তানের দাসত্ব ছাড়তে হয়। আমি একজন কর্মক্ষম মানুষ। হালাল রূযীর সন্ধানে বেরিয়েছি। কিন্তু সর্বত্র সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি জোঁকের মত ধেয়ে আসছে, যা আমাকে জাহান্নামের খোরাক বানাবে। আমি স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌র আইন ও রাসূলের বিধান মেনে চলব। কিন্তু দেশের আইন ও প্রচলিত বিধানসমূহ আমাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। আমি রাসূলের দেখানো ছহীহ হাদীছের পথে নিরিবিলি ইবাদত করব। কিন্তু বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার ধূম্রজালে আমি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। দুনিয়া পূজারীরা নানাবিধ রঙিন বেশে ও চটকদার কথায় আমাদের ভুলাতে চায়। স্বার্থপরদের অন্যায় দাবী আমাদের বিপর্যস্ত করে ফেলে। হিংসুকেরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে চায়। ওরা দুনিয়ার ক্ষতি করে আমাদের ভয় দেখাতে চায়। আখেরাত থেকে

আমাদের বঞ্চিত করতে চায়। কিন্তু জান্নাত পিয়াসী মুমিন কি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত হারাতে পারে?

হে মুমিন! তুমি সবকিছু ছেড়ে জান্নাতের পানে ধাবিত হও। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব শক্তিধররা রব-এর আসন দখল করে বসে আছে, জগদ্দল পাথরের ন্যায় যারা জনগণের ঘাড়ের উপর চেপে আছে, তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। ছাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবীর সেই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার ন্যায় তুমি বলে ওঠো 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। নকল উপাস্যদের ছেড়ে তুমি বেরিয়ে যাও তোমার প্রকৃত উপাস্যের দিকে। যেমন বেরিয়ে গিয়েছিলেন একদিন তোমার পিতা ইবরাহীম জন্মভূমি ছেড়ে এই বলে যে, 'আমি চললাম আমার প্রভুর পানে। সত্বর তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৯)*।

সেদিন ইবরাহীমের সাথে কেউ ছিল না স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত ব্যতীত। তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল কওমের গালি, অপবাদ ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। তাহ'লে তুমি কেন ভেঙ্গে পড়বে?

ইবরাহীমের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদের ভাগ্যেও জুটেছিল নিজ কওমের দেওয়া অন্যূন ১৬ রকমের অপবাদ ও গালি, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ও অবশেষে হত্যার পরিকল্পনা ও পরিণতিতে হিজরত। কা'বা চত্বরে সিজদারত নবীর মাথায় উটের ভুড়ি চাপানো, গলায় কাপড় পেচিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা, সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দা ও অভিশাপ প্রদান, মুখে থুথু নিক্ষেপ ও কুরআন পাঠের সময় হৈ চৈ করা, ত্বায়েফের মর্মান্তিক নির্যাতন কোনকিছুই সেদিন নিঃসঙ্গ নবীকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। ওহোদ যুদ্ধে গমনরত নবীকে ভীত করার জন্য পথিমধ্যে হাযারের মধ্যে সাড়ে তিনশ' মুনাফিকের দলত্যাগ ও নানা অপবাদ দান ও অপকৌশল সমূহ নির্ধারণ- কোনকিছুই নবী ও তাঁর নির্ভেজাল সাথীদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তবে আজ কেন হে পরপারের পথিক! তুমি ভেঙ্গে পড়বে? কেন তুমি দুনিয়ার ফাঁদে পা দিবে? জান্নাত যে তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তোমার স্নেহশীল পিতা-মাতার ন্যায় তোমাকেও তো কাল ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে ভূগর্ভে (কবরে) স্থান নিতে হবে। তবে

কিসের এত পিছুটান? যালেমদের যুলুমের ভয়? দুনিয়ার লোভ? মনে রেখ মযলূম ইবরাহীম ছিলেন বিশ্বনেতা, যালেম নমরূদ নয়। সম্বলহীন মূসা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয় নেতা, ধনকুবের ক্বারূণ নয়। অতএব হে মুমিন! যতদিন হায়াত পাও, সাধ্যমত শেষনবীর আদর্শ মেনে চল। ডাইনে-বামে তাকিয়ো না। অন্যের জৌলুসে ভুলো না। গোনাহ থেকে তওবা কর। নেকীর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি কর। ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে। তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের শক্তি দিন- আমীন![৫]

৩. আইলার আঘাত : এলাহী কষাঘাত : আমাদের করণীয়

২৫শে মে'০৯ দুপুর ২-টা ও তার পরের ঘটনা। দূর থেকে দেখা গেল নদী ফুঁসে উঠে পাহাড়ের মত উঁচু ধবধবে সাদা পানির স্রোত, সামনে ধেয়ে আসছে। দূর থেকে বাঁধে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করছে অনেকে। ভাবতেই পারেনি যে, এতদূর থেকে পানি এত দ্রুত কাছে আসবে। কিন্তু ভুল ভাঙলো কিছু পরেই। পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌঁড়ালো সবাই। বাড়ী এসে দেখা গেল ছেলে-বৌ সব যে যার মত চলে গেছে। বাড়ী-ঘর গবাদি-পশু হাঁস-মুরগী সব ফেলে জান নিয়ে ছুটলো সবাই। কিন্তু না। আইলা ধরে ফেলল অনেককে। চোখের পলকে বাপ-বেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনদিন পরে বাপকে পাওয়া গেল প্রায় তিন মাইল দূরে একটা উপড়ানো গাছের ডাল-পালার মধ্যে। বিকৃত লাশ চেনা গেল তার কোমরে বাঁধা গামছা দেখে। ঘেরের মাছ বিক্রির ৩৫ হাযার টাকা ঘরে বালিশের নীচে আছে। কিন্তু রাস্তা থেকে ঘরে গিয়ে টাকা গুলো আনার ফুরছত পায়নি। গত বছরে ৬০ হাযার টাকায় কেনা ৪টি গরু মাত্র ২৬ হাযার টাকায় বেঁচে দিল বাধ্য হয়ে সুযোগ সন্ধানী এক ধনীর কাছে পশুখাদ্যের অভাবে। অগণিত লাশ ট্রাকে ও লঞ্চে ভরে নিয়ে গেল সেনাবাহিনী চোখের সামনে দিয়ে, যাদের পরিচয় আর কেউ কখনো জানবে না। এগুলি হ'ল সাতক্ষীরা শ্যামনগরের দুর্গত এলাকার কিছু ঘটনা। এরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে দক্ষিণাঞ্চলে মুহূর্তের মধ্যে অবিশ্বাস্য গতিতে। যার সঠিক ইতিহাস কখনোই লিখিত হবে কি-না সন্দেহ। অথচ মাত্র এক সপ্তাহ পর ত্রাণ দিতে গিয়ে ঐ নদী পার হ'লাম নৌকায়। পানি নেমে গেছে তীর থেকে অনেক

৫. ১২তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৯।

Contents

নীচে। কতই না শান্ত-শিষ্ট। চিন্তাই করা যায় না যে, এই নদী এক সপ্তাহ পূর্বে ফুঁসে উঠে বাঁধ ছাপিয়ে সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে কি তাণ্ডব না ঘটিয়ে গেছে তীরবর্তী মানব বসতিগুলোর উপর দিয়ে।

পানি অবলা। বাতাস কথা বলে না। ওরা রাগে না, কাঁদে না, হাসে না। ওরা প্রাণহীন, অনুভূতিহীন। তাহ'লে কিভাবে ওরা ফুঁসে উঠলো? কিভাবে ওরা মানুষগুলোকে তাড়া করল? তাদের হত্যা করল ও বাঁধ-ভেড়ী ভেঙ্গে রাস্তা-ঘাট বাড়ী-ঘর একাকার করে আবার শান্ত হয়ে নিজ স্থানে ফিরে এল? কর্ম আমরা দেখলাম। অথচ কর্তা নেই। কথা শুনছি অথচ কথক নেই। লেখা পড়ছি অথচ লেখক নেই। ধোঁয়া দেখছি অথচ আগুন নেই। এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে কি? আমরা আইলার রুদ্ররূপ দেখলাম। কিন্তু এর সৃষ্টিকর্তা ও হুকুমদাতা কেউ নেই, এরূপ কথা বিশ্বাস করা যাবে কি? মূর্খরা বলে, এটা প্রকৃতির খেয়ালিপনা মাত্র। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী যারা তারা বিশ্বাস করেন যে, এসবের পিছনে আছেন এক মহাশক্তিধর প্রজ্ঞাময় সত্তা, যিনি আল্লাহ। যার হুকুমেই এ পৃথিবী ও সমস্ত মাখলূক্বাতের সৃষ্টি হয়েছে। যার একক নির্দেশেই চলে সবকিছু। অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার জন্য স্নেহময় পিতা যেমন অনেক সময় কঠোর হন, দয়াময় আল্লাহ তেমনি অবাধ্য বান্দাদের সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মাঝে-মধ্যে আযাব প্রেরণ করে থাকেন। আর তখনই তাঁর হুকুমে শান্ত নদী হঠাৎ ফুঁসে ওঠে। মৃদুমন্দ বায়ু হঠাৎ ঘুর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। নিথর সাগর হঠাৎ উত্তাল হয়ে জলোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। মুষ্টিমেয় পাপীর লাগামহীন পাপকর্মের জন্য হাযারো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরাধী ও নিরপরাধ সবধরনের মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। পাপীদের শাস্তি দেখে অন্য পাপীরা সাবধান হয়। ফলে পৃথিবী আপাততঃ শান্ত হয়। মুমিন যারা মারা পড়ে, তারা শহীদের মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়।[৬] অন্যেরা পাপীদের শিক্ষা হাছিলের বস্তু হয় এবং আল্লাহ্র করুণার পাত্র হয়।

'আইলা' নিয়ে গেছে সবকিছু। অনেকের ভিটে-মাটি নেই। খাবার পানি নেই, খাদ্য নেই। ঘেরের মাছ সব ভেসে গেছে। তীব্র লোনা পানিতে গাছ-পালা মরে যাচ্ছে। অমাবশ্যা-পুর্ণিমার গোনে পানি উঠানামা করছে। ভীত সবাই।

৬. মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১।

আগামী অক্টোবর পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। এমতাবস্থায় আমরা যারা বেঁচে আছি ও সুস্থ আছি, আমাদের কর্তব্য কী?

আমাদের প্রথম কর্তব্য হ'ল নিজ নিজ পাপ থেকে তওবা করা ও অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। **দ্বিতীয় কর্তব্য হ'ল**, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে যাওয়া ও তাদের দুর্দশা লাঘবে সাধ্যমত চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহম করবেন।[৭] তিনি বলেন, আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।[৮] 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন।[৯] তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি মুসলিম নয়, যে পেট ভরে খায় ও তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন প্রকারের লোক জান্নাতী। তন্মধ্যে এক- ঐ শাসক যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, দানশীল এবং যাকে সৎকাজের যোগ্যতা দান করা হয়েছে। দুই- ঐ ব্যক্তি, যিনি দয়ালু এবং নিকট ও দূরের সকল মুসলিমের প্রতি কোমল হৃদয়'।[১১] 'আল্লাহ বলেন, হে বনু আদম! তুমি (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর। আমি তোমার জন্য ব্যয় করব। আর যদি ব্যয় করতে গিয়ে গণনা কর (অর্থাৎ কৃপণতা কর), তাহ'লে আমিও (তোমাকে অনুগ্রহ করতে) হিসাব করব'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, গবাদি-পশু সহ (ক্ষতিকর নয় এমন) প্রত্যেক প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের অশেষ পুরস্কার রয়েছে।[১৩]। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দয়াশীল বান্দাদের উপরে দয়া করে থাকেন'।[১৪]

---

৭. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫৬।
৮. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
৯. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।
১০. বায়হাক্বী, শু'আব হা/৫৬৬০; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬২।
১১. মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৯৬০।
১২. বুখারী হা/৪৬৮৪; মুসলিম হা/৯৯৩; মিশকাত হা/১৮৬২।
১৩. বুখারী হা/২৩৬৩, মুসলিম হা/৫৯৯৬।
১৪. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৪৯৪৭।

উল্লেখ্য যে, যারা স্রেফ মানবিক তাকীদে দান করে থাকেন, তাদের এ দয়া ও দান দুনিয়া ও আখেরাতে ফলবলহীন। দুনিয়াতে ফলহীন এজন্য যে, তার এ তাকীদ হয় ক্ষণস্থায়ী এবং দ্রুত তা কোন একটি স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যারা পরকালীন স্বার্থে দান করে থাকেন, তাদের তাকীদ হয় স্থায়ী। তাদের দান হয় দুনিয়া ও আখেরাতে বরকতমণ্ডিত। ঐ দানের ছওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ এমনকি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ছওয়াব দিয়ে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। যার কখনোই কমতি হয় না। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৫]

৪. হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব

আপেক্ষিকতা সূত্র (Law of Relativity)-এর উদ্গাতা জন আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খৃ.)-এর পর অনেকের নিকট বর্তমান বিশ্বের সেরা পদার্থ বিজ্ঞানী হ'লেন ড. স্টিফেন হকিং (জন্ম : লণ্ডন, ১৯৪২), যিনি মধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভাবক স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭)-এর ন্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লুকাসিয়ান অধ্যাপক'-এর বিরল সম্মাননায় ভূষিত, তিনি স্বীয় গবেষণার বিষয়বস্তু তথা ফিজিক্স-এর বাইরে গিয়ে মেটাফিজিক্স বা থিওলজি সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে সম্প্রতি এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা তাঁর সুউচ্চ সম্মানকে কালিমালিপ্ত করেছে। বৃটেনের প্রভাবশালী দৈনিক গার্ডিয়ানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে 'পরকাল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই। স্বর্গ ও নরক মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র'। এর আগেও গত বছর তিনি 'স্রষ্টার অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের শৃংখলা' নিয়ে তার বই 'দি গ্রাণ্ড ডিজাইনে' অনেক ঔদ্ধত্যপূর্ণ কটাক্ষ করেন। সেখানে তিনি দাবী করেন যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তাকে 'মানব কল্পিত রূপক' হিসাবে বর্ণনা করেন। হকিং-এর এসব মন্তব্য স্রেফ কল্পনা নির্ভর হ'লেও যেহেতু তারা বিজ্ঞানী, অতএব তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বহু মানুষ। বিশেষ করে দুর্বল বিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ এইসব মন্তব্যগুলিকে তাদের পক্ষে বড় দলীল হিসাবে সোৎসাহে পেশ করে থাকেন।

---

১৫. ১২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৯।

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথাক্রমে শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের নানামুখী আবিষ্কারে হতচকিত হয়ে সাময়িকভাবে অনেক বিজ্ঞানী বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা বিশ্ব চরাচরের সবকিছুকে 'প্রকৃতির লীলাখেলা' মনে করতে থাকেন। কিন্তু এখন তাদের অধিকাংশের হুঁশ ফিরেছে এবং হোয়াইট হেড (১৮৬১-১৯৪৭), আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪), জেম্স জীন্স (১৮৭৭-১৯৪৬) সহ বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞানী স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, Nature is alive 'প্রকৃতি এক জীবন্ত সত্তা'। কেবল জীবন্ত নয়, বরং ডব্লিউ.এন. সুলিভান (১৮৮৬-১৯৩৭)-এর ভাষায় বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের সার নির্যাস হ'ল, The ultimate nature of the universe is mental. 'বিশ্বলোকের চূড়ান্ত প্রকৃতি হ'ল মানসিক'। অর্থাৎ সৌরজগত আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি বা এটা কোন বিগব্যাং (Big-Bang) বা মহা বিস্ফোরণের ফসল নয় বা অন্ধ-বোবা-বধির কোন ন্যাচার (Nature) বা প্রকৃতি নয়, বরং একজন প্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল। আর তিনিই হচ্ছেন 'আল্লাহ'। যিনি বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। যাঁর পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনায় সবকিছু চলছে *(ইউনুস ১০/৩১)*। হ্যাঁ, বিগব্যাং যদি হয়ে থাকে, তবে সেটা দুনিয়ার মানুষ বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে মরু আরবের নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ দিয়ে শুনেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না'? *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

অতঃপর পরকাল কেন? কেন মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে? আল্লাহ বলেন, '...তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। যাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান দিতে পারেন। আর যারা কাফের তাদের জন্য থাকবে তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের অবিশ্বাসের ফল হিসাবে' *(ইউনুস ১০/৪)*। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ, বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই, তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*। অদৃশ্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানীদের নেই। তাই তাদের জ্ঞান অপূর্ণ। সেকারণেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, Religion

without science is blind and Science without religion is lame. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু'।

আজকের হকিংদের ন্যায় সেকালে মক্কার মুশরিক নেতাদের অনেকের ধারণা ছিল যে, মানুষ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা ধ্বংস হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তারা বলে যে, পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি। আর আমাদের কেউ ধ্বংস করে না কাল ব্যতীত। বস্তুতঃ এব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণা করে মাত্র' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। আরব নেতারা বলেছিল, 'যখন আমরা মরব ও মাটি হয়ে যাব (অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হব), সেই প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত' *(ক্বাফ ৫০/৩)*। এ নিয়ে তারা ঝগড়ায় লিপ্ত ছিল। আল্লাহ বলেন, 'তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে'? 'মহা সংবাদ সম্পর্কে, 'যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে'। 'কখনোই না, শীঘ্র তারা জানতে পারবে'। 'অতঃপর কখনোই না, শীঘ্র তারা জানতে পারবে' *(নাবা ৭৮/১-৫)*।

কি সে মহা সংবাদ? সেটি হ'ল পুনর্জন্মের মহাসংবাদ। কেননা মানবজীবনে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হ'ল জন্মগ্রহণ করা। আর সবচেয়ে দুঃসংবাদ হ'ল মৃত্যুবরণ করা বা বিলীন হয়ে যাওয়া। এ দুনিয়াতে কেউ মরতে চায় না। কিন্তু যে মানুষের জন্য আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেই মানুষ গড়ে একশ' বছরের মধ্যেই মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ইহজীবনে তার আশা-আকাংখার অনেক কিছুই পূরণ হচ্ছে না। তাই এই অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ জগত থেকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ আরেকটি জগতে হিজরত করতে হয়। যেখানে যালেম তার সমুচিত শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথাযথ পুরস্কার পেয়ে তৃপ্ত হবে। আর সে জগতটাই হ'ল পরজগত। মৃত্যুর পরেই হবে যার শুরু এবং ক্বিয়ামতের দিন হবে যার পূর্ণতা। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। আর এটাই হ'ল জগদ্বাসীর প্রতি আল্লাহ্র সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। অতএব যদি পরকাল বিশ্বাস না থাকত, তাহ'লে সবল ও দুর্বলের হানাহানিতে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত।

অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্যই আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে মে‘রাজে নিয়ে জান্নাত-জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এরপরেও কি হকিংদের চোখ খুলবে না?

হে বিজ্ঞানী স্টিফেন! কোন সে শক্তি যিনি আপনাকে ১৯৬৩ সাল থেকে বিগত ৪৮ বছর যাবত মাথা ব্যতীত পুরা দেহ প্যারালাইসিসে পঙ্গু করে রেখেছেন? দুনিয়ার সকল চিকিৎসা সুবিধা নাগালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি সুস্থ হ’তে পারছেন না? আপনার বুকের মধ্যের রূহটা কি কখনো দেখতে পেয়েছেন? ওটা কার হুকুমে এসেছে, আর কার হুকুমে চলে যাবে? আপনি কি ১৯৮৬ সালে শিকাগো শহরে আগের বছরের দেয়া তত্ত্বের ভুল স্বীকার করেননি? তাহ’লে বিজ্ঞান স্রেফ অনুমিতি নির্ভর বস্তু নয় কি? অথচ ‘আল্লাহ্র কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ..’ *(আন‘আম ৬/১১৫)*। ঐ শুনুন আপনার সৃষ্টিকর্তার বাণী, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমুন্নীত হয়েছেন। তিনিই সকল কিছু পরিচালনা করেন... *(ইউনুস ১০/৩)*। অতএব তওবা করুন! মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করুন!! পরকালে ভাল থাকবেন ইনশাআল্লাহ।[১৬]

৫. অহি-র বিধান বনাম মানব রচিত বিধান

নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে বলা হয় অহি-র বিধান। পক্ষান্তরে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বিধানকে বলা হয় মানব রচিত বিধান। দু’টি আইনের উৎস হ’ল দু’টি : আল্লাহ এবং মানুষ। এক্ষণে আমরা দু’টি আইনের মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরব।-

(১) মানব রচিত আইনের নীতিমালা সমসাময়িক সমাজের প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। এই আইন সমাজের প্রয়োজনের অনুবর্তী ও বশবর্তী হয়। এভাবে মানব রচিত আইন সমূহকে প্রথম যুগ থেকে এযাবৎ বড় বড় কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হয়েছে এবং বর্তমানে তা একটি দর্শনের

১৬. ১৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১১। ‘মিসকীন ওবামা’ শীর্ষক রাজনৈতিক ও ‘হকিংয়ের পরকাল তত্ত্ব’ শীর্ষক ধর্মীয় সম্পাদকীয় দু’টি একই সংখ্যায় বের হয়।

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে ছিল না। যদিও এই দর্শন স্রেফ মানবীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত, যা অপূর্ণ। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান হ'ল এমন এক সত্তার নাযিলকৃত বিধান যার জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং যা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের গণ্ডীভূত নয়। যেখানে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অন্য কোন জ্ঞান সূত্রের প্রয়োজন নেই।

(২) মানবীয় বিধান ও অহি-র বিধান উভয়ের উদ্দেশ্য সামাজিক শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানবীয় বিধান ভবিষ্যত ধারণার ভিত্তিতে রচিত হয় এবং যা বার বার পরিবর্তনশীল। ফলে তা চিরন্তন হয় না এবং এই সমাজে শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ সর্বদা অনিশ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান অভ্রান্ত জ্ঞানসত্তার পক্ষ হ'তে প্রেরিত হওয়ায় তা চিরন্তন হয় এবং এই সমাজে শান্তি ও অগ্রগতি সর্বদা নিশ্চিত থাকে।

(৩) মানবীয় বিধান মানবীয় আবিষ্কার সমূহ এবং তার অভূতপূর্ব প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম হয়। ফলে তাকে ঘন ঘন হোঁচট খেতে হয় ও বারবার বিধান ও উপ-বিধান সমূহ রচনা করতে হয়। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান সমূহ এমনামন মৌলিকত্বে সমৃদ্ধ, যার আবেদন ও ব্যাপ্তি সার্বজনীন ও সর্বযুগীয়। যেমন বলা হয়েছে 'তোমরা পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ কর' *(আলে ইমরান ৩/৯)*। 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদা ৫/২)*। 'কারু ক্ষতি করো না ও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না'।[১৭] 'অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*। 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' *(হাশর ৫৯/৭)*। 'ধনীদের নিকট থেকে নাও এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা ফিরিয়ে দাও'।[১৮] 'আল্লাহ্র জন্যই সৃষ্টি ও শাসন' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। 'সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। 'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো' *(মায়েদা*

---

১৭. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; আহমাদ হা/২৮৬৭; ছহীহাহ হা/২৫০।

১৮. বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।

Contents

৫/৯০)। 'যাবতীয় মাদকদ্রব্য হারাম'।[১৯] 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২০] 'তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা ন্যায় বিচারের উপর দণ্ডায়মান থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*। 'যে ব্যক্তি ছোটকে স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২১] উপরোক্ত বিশ্বজনীন মূলনীতি সমূহ যদি মানুষ সর্বদা মেনে চলে, তবে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতি সর্বদা অটুট থাকবে।

(৪) মানবীয় বিধান সমূহ নিজেদের স্বার্থদুষ্ট লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে, যা অনেক সময় সামাজিক অশান্তি ও সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান সর্বদা অন্যায়ের প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। যা সমাজ উন্নয়নের গ্যারান্টি হয়।

(৫) অহি-র বিধান সকল মানুষ ও সৃষ্টিজগতের জন্য কল্যাণকর। মানবীয় বিধান সকলের জন্য সমভাবে কল্যাণকর নয়।

(৬) অহি-র বিধান সমাজে সর্বদা একদল মহৎ, পুণ্যবান ও সৎকর্মশীল আধ্যাত্মিক মানুষ তৈরী করে। যুগে যুগে এরাই হলেন সমাজের আদর্শ ও সকল মানুষের অনুসরণীয়। পক্ষান্তরে মানবীয় বিধান স্বার্থপর ও বস্তুবাদী মানুষ তৈরী করে। যাদের নিকটে নিঃস্বার্থপরতা নিতান্তই দুর্লভ বস্তু।

উপরোক্ত আলোচনায় অহি-র বিধানের ছয়টি মৌলিক দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। ১. পূর্ণতা ২. চিরন্তনতা ৩. বিশ্বজনীনতা ৪. ন্যায়পরায়ণতা ৫. কল্যাণকারিতা এবং ৬. মহত্ত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ইসলামের এইসব মহান নীতিমালা মওজুদ থাকতে ইসলামী দেশসমূহে পাশ্চাত্য ও মানবীয় আইন সমূহ কিভাবে শাসকের মর্যাদায় স্থান নিল? একটু চিন্তা করলেই এর জবাব পাওয়া যাবে। আর তা হ'ল- (১) এই দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য বিদেশীদের নিরন্তর ষড়যন্ত্র (২) তাদের পদলেহী দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ (৩) চাকচিক্য সর্বস্ব তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ততা। (৪) ইসলামী আইন ও বিধান

---

১৯. মুসলিম হা/২০০২; মিশকাত হা/৩৬৩৯।
২০. মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০।
২১. আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; মিশকাত হা/৪৯৭০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০।

সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতা (৫) দেশের আলেম সমাজের অধিকাংশের মধ্যে অনুদারতা এবং অহি-র বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অপ্রতুলতা।

উক্ত কারণগুলি দূর করার জন্য আমাদের করণীয় ছিল মূলতঃ দু'ধরনের। এক- প্রশাসনিক ও দুই- সামাজিক। প্রথমোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে ইংরেজ চলে যাওয়ার পর হ'তে বিগত ৬৪ বছরেও আমাদের কোন পরিবর্তন আসেনি। কেবল নেতা ও মানচিত্রের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে। নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। বৃটিশের রেখে যাওয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি সবই প্রায় বহাল আছে শতভাগ। দ্বিতীয়টিতে কিছু আশা এখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে। তাই বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ সংশোধন ও গণজাগৃতির কিছু প্রয়াস বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক অনীহা বা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায় শ্যেনদৃষ্টির ফলে এবং দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে এই উদ্যোগগুলি আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে দেশ ও সমাজ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

বিশ্বের সর্বত্র অবনতির প্রধান কারণ হ'ল অহি-র বিধানের পরিত্যাগ। যে জাতি যত বেশী অহি-র বিধানের অনুসারী হবে, সে জাতি তত বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যে জাতি যত বেশী এই বিধান থেকে দূরে যাবে, সে জাতি তত বেশী অবনত ও অপদস্ত হবে। কারণ এলাহী বিধানের অবর্তমানে কেবল শয়তানী বিধান অবশিষ্ট থাকে। তখন মানুষ আল্লাহ্র আনুগত্য করে না। বরং তার নফসের আনুগত্য করে। এ দু'টির মধ্যবর্তী অন্য কিছু নেই, যার আনুগত্য করা যায়। আর নফসের অপর নাম হ'ল শয়তান। যা মানুষের রগ-রেশায় চলমান। শয়তান কখনোই মানুষের মঙ্গল চায় না। সে প্রলোভন দিয়ে মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। সে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর স্কন্ধে সওয়ার হয়ে কাজ করে এবং দ্রুত সমাজকে ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে দেয়। অথচ নেতারা ভাবেন, তারা সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ফেরাঊন তার জনগণকে বলেছিল, 'আমি তোমাদের কল্যাণের পথ ভিন্ন পরিচালিত করি না' *(মুমিন ৪০/২৯)*। ফেরাঊন মূসা (আঃ)-এর আনীত অহি-র বিধান মানেনি। বরং মানুষকে নিজের মনগড়া বিধানের মাধ্যমে অত্যাচার ও দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ রেখেছিল। সে তার সীমাহীন অত্যাচারকে তার দেশ

ও সমাজের জন্য কল্যাণকর ভেবেছিল। মক্কার কুরায়েশ নেতারা একইভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যুলুম করেছিল এবং একেই সমাজের জন্য কল্যাণ ভেবেছিল। শয়তানী প্রবৃত্তি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'অতঃপর যদি তারা তোমার কথায় সাড়া না দেয় তবে জানবে যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে'? *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*। তিনি তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহফ ১৮/২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূলনীতি আকারে বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।[২২]

অতএব মানুষকে বেছে নিতে হবে দু'টি পথের যেকোন একটি। হয় মনগড়া বিধানের পথ, নয়তো অহি-র বিধানের পথ। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল মানুষকে শয়তানের পথ ছেড়ে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানিয়েছেন। বস্তুতঃ শান্তি কেবল সেপথেই নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই মানুষকে তার স্বভাবধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত করছে। এমনকি যে ৪০টি দেশে 'ইসলাম' রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে রয়েছে, সেখানেও রয়েছে চরম রাষ্ট্রীয় প্রতারণা। 'এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক' বলে কুফরীর সঙ্গে ইসলামকে মিলাতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এখন তাদের পরিচয় হারাতে বসেছে। সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার, জুয়া-লটারী, মাদকতা, হত্যা-সন্ত্রাস সহ প্রায় সবধরনের শয়তানী কাজ এইসব রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধে চলছে। প্রশ্ন হ'ল, এভাবেই কি চলতে থাকবে? মানব রচিত বিধানের কাছে অহি-র বিধান এভাবেই কি সর্বদা পদদলিত হবে?...। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![২৩]

---

২২. আহমাদ হা/১০৯৫; মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০।
২৩. ১৫তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১২।

৬. ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য

আল্লাহ বলেন, তিনিই সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত (কুরআন) ও সত্যদ্বীন (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে' *(তওবা ৯/৩৩; ছফ ৬১/৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিজয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপ থেকে কুফর ও শিরক চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ওছমানীয় খেলাফতের যুগে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। অতঃপর রাজনৈতিক বিজয় সংকুচিত হয়ে গেলেও ধর্মীয় বিজয় সর্বদা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। বর্তমানে যা অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। মানুষ নাস্তিক্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে এবং মানুষের মনগড়া ধর্মসমূহে মানসিক শান্তি ও সুখ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে দ্রুত বিশুদ্ধ ইলাহী ধর্ম ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। বস্তুবাদীরা যতই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর যুলুম করবে, মানুষ ততই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এভাবে ইসলাম যখন মানুষের হৃদয় দখল করবে, তখন পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি সবই ইসলামের দখলে চলে আসবে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের কালেমা প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন, তাদেরকে তিনি মুসলিম হওয়ার তাওফীক দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা ইসলামের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করবে। রাবী বলেন, তাহ'লে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপর ইসলাম বিজয়ী হবে)।[২৪] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করলেন। তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। অদূর

---

২৪. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০১; মিশকাত হা/৪২।

Contents

ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে পর্যন্ত যমীন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল'।[২৫]

মানুষ সর্বদা বিজয় তার নিজ জীবনে দেখতে চায়। এটাই তার প্রকৃতি। আল্লাহ বলেন, 'মানুষ বড়ই দ্রুততাপ্রিয়' *(ইসরা ১৭/১১)*। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত বিজয় এলেও স্বাভাবিক নিয়ম হ'ল ধীরগতিতে ধাপে ধাপে আসা। বিশেষ করে আদর্শিক বিজয়ের স্বরূপ হ'ল আদর্শ কবুল করার মাধ্যমেই বিজয় আসা। এজন্য নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও নিরলস প্রচেষ্টা আবশ্যিক হয়। বিরোধীদের হামলা সহ্য করতে হয়। জান ও মাল উৎসর্গ করতে হয়। কিন্তু এটাই বাস্তব যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রত্যেক কর্মী সর্বাবস্থায় বিজয়ী থাকে। নিজেকে সে আল্লাহ্র পথে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। তার হায়াত-মঊত, রুটি-রূযী, আনন্দ ও বিপদ, সম্মান ও অসম্মান সবই থাকে আল্লাহ্র হাতে। ফলে সে মনের দিক দিয়ে সর্বদা সুখী ও বিজয়ী। ইহকালে বা পরকালে তার কোন পরাজয় নেই। তাদের বিরোধীরা সর্বদা পরাজিত এবং অসুখী। তবে এজন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে তাঁরই দেখানো পথে অটুট ধৈর্য্যের সাথে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হয়। পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন। নেতাদের নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন ও নূহকে বিজয়ী করেছেন। নমরূদ চূড়ান্ত নির্যাতন চালিয়েছিল ইবরাহীমের উপর। কিন্তু অবশেষে সেই-ই ধ্বংস হয়েছে এবং ইবরাহীম (আঃ) বিজয়ী হয়েছেন। ফেরাঊন অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল নিরীহ ঈমানদারগণের উপর। কিন্তু অবশেষে সে তার দলবল সহ ডুবে মরেছিল। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বগোত্রীয় শত্রুদের অত্যাচারে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মাত্র ৮ বছরের মাথায় তিনি বিজয়ী বেশে মক্কায় ফিরে এলেন। এভাবে ঈমানী আন্দোলনের বিরোধিতা যারাই করেছে, তারাই অবশেষে পরাজিত হয়েছে এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিজয়কে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলে ইসলামী বিজয় বাধাগ্রস্ত হয়। বরং ইসলামী বিজয়কে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলে রাজনৈতিক বিজয়

---

২৫. মুসলিম হা/২৮৮৯; মিশকাত হা/৫৭৫০।

ত্বরান্বিত হয়। লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হবার কারণে অনেক দেশে ইসলামী বিজয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 'ম্যাসাকার' এমনই একটি ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি মাত্র।[২৬] দৃঢ়চিত্ত, ঈমানদার ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ইসলামী বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। সেই সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং আল্লাহ্‌র নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা যদি কোন আন্দোলনের লক্ষ্য না হয়, তাহ'লে সেখানে আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে না। শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল প্রতিষ্ঠার জন্য কখনোই আল্লাহ্‌র গায়েবী মদদ আসতে পারে না। তাই আপতিত বিপদাপদকে পরীক্ষা হিসাবে মনে করে আল্লাহ্‌র নিকটে এর উত্তম প্রতিদান চাইতে হবে। সাথে সাথে আত্মসমালোচনা করে নিজেদের ভুল শুধরাতে হবে। সর্বদা এ বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে যে, ইসলাম কখনো পরাজিত হয় না। পরাজিত হই আমরা আমাদের দোষে। আমরা যত ত্রুটিমুক্ত হব, আল্লাহ্‌র রহমত তত নিকটবর্তী হবে। সাময়িক বস্তুগত বিজয়ে শত্রুরা হাসবে। ওটাই ওদের দুনিয়াবী সান্ত্বনা। পরকালে ওরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। 'তারা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (ইসলামকে) পূর্ণতায় পৌঁছানো ব্যতীত ক্ষান্ত হবেন না। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে' *(তওবা ৯/৩২; ছফ ৬১/৮)*।

বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশের মানচিত্র নির্ধারিত হয়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। তাই এ রাষ্ট্রটিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেয়ার জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে শত্রুরা কাজ করে যাচ্ছে। ফলে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বলে আত্মতুষ্টি লাভের কোন সুযোগ এখন নেই। বরং মুসলমান নামধারীরাই এদেশে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই ইসলামী বিজয়ের আকাংখীদের প্রতি শত্রুদের পাতানো ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে নবীগণের তরীকায় ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে নেবার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২৭]

---

২৬. এ সময় জামায়াতে ইসলামী নেতাদের উপর দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্রাকডাউন আপতিত হয় এবং যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হ'তে থাকেন।

২৭. ১৬তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১৩।

৭. কল্যাণের অভিযাত্রী

রামাযানের প্রথম রাত্রিতেই আল্লাহ বান্দাদের উদ্দেশ্যে ডেকে বলেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চল! হে অকল্যাণের অভিসারী থেমে যাও'।[২৮] প্রতি রাত্রির শেষ প্রহরে নিম্ন আকাশে নেমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুরূপভাবে সারা বছর দরদভরা আহ্বান জানিয়ে থাকেন।[২৯] সে আহ্বান শুনতে পায় তারাই, যাদের তা শোনার মত কান আছে। বুঝার মত হৃদয় আছে। স্বার্থবাদী এ পৃথিবীতে বস্তুবাদী মানুষ সর্বদা ভোগের নোংরা ডোবায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তার কানে কিভাবে তার সৃষ্টিকর্তার এ স্নেহভরা আহ্বান ধ্বনিত হবে? সে ভেবেছে দুনিয়াই তার সবকিছু। কিন্তু সে জানেনা যে, তার আসল জীবন পড়ে আছে পরপারে। ঐ জীবনটাই তার চিরস্থায়ী জীবন। সেখানে মানুষ আগুনে পুড়ে জীবন্ত দগ্ধীভূত হোক, এটা প্রেমময় আল্লাহ কখনোই চান না। তাই তিনি অহী পাঠিয়ে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে আগেই সাবধান করেছেন যাতে তারা আল্লাহ্র বিধানের অনুসারী হয় এবং পরকালে শান্তিতে থাকে। কিন্তু শয়তান সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্য গ্রহণের প্রেরণা ও যোগ্যতা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যাকে কুরআনে ও হাদীছে 'ফিৎরাত' বলা হয়েছে। সে প্রকৃতিগত ভাবেই আল্লাহ্র অনুগত। এটাই তার স্বভাবধর্ম। কিন্তু শয়তানী ধোঁকার জাল তাকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রধানতঃ চারভাবে শয়তান তাকে সত্যগ্রহণে বাধা দেয়। প্রথমে তার পিতামাতা ও পরিবারের মাধ্যমে। তারা নাস্তিক, অমুসলিম বা বিদ'আতী হ'লে সন্তান সেভাবে গড়ে ওঠে। এমনকি বাপ-দাদার দোহাই দিয়েই সে আমৃত্যু সত্যকে এড়িয়ে চলে। দুই- তার সমাজের মাধ্যমে। যে সমাজে সে বেড়ে ওঠে, সে সমাজের মন্দ রীতিনীতি সে মেনে চলে। তিন- রাষ্ট্রের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের আইন-কানূন আল্লাহবিরোধী হলেও সে তা বাধ্য হয়ে

---

২৮. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০।
২৯. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

মেনে চলে। চার- তার আত্ম অহংকার ও অনীহা। এ রোগ যার মধ্যে প্রবল, শয়তান তাকে খুব সহজে কাবু করতে পারে। এই চার প্রকার বাধা মুকাবিলা করে সত্যিকারের ভাগ্যবানরাই কেবল সত্য গ্রহণে সক্ষম হয়। প্রথম তিনটি কারণ কেউ পেরোতে পারলেও শেষোক্ত বাধা অতিক্রম করা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব হয় না। বংশের গৌরব, ইলমের অহংকার, পদমর্যাদার গর্ব, প্রাচুর্যের স্ফীতি তাকে অন্ধ করে রাখে। সেই সাথে সত্যের ব্যাপারে অনীহা তাকে মিথ্যায় নিক্ষেপ করে অথবা মিথ্যার সহযোগী বানায়। ফলে সত্যের আলো বারবার জ্বললেও সে তা দেখতে পায় না। হুতোম পেঁচা যেমন দিনের আলো দেখতে পায় না। অতএব যারা আল্লাহ্র পথের দাঈ, যারা আলোর পথের দিশারী, যারা সমাজ সংস্কারের অগ্রপথিক, তাদেরকে অবশ্যই উক্ত শয়তানী ধোঁকাসমূহ থেকে সাবধান থাকতে হবে। এগুলো মুকাবিলা করেই তাকে সত্য গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

এ দুনিয়াতে যারা হক চিনে, হক অনুযায়ী আমল করে, হক-এর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় এবং ঝুঁকি এলে হাসিমুখে ছবর করে ও মুকাবিলা করে, জান্নাত কেবল তাদেরই জন্য। কিন্তু যারা ঝুঁকির ভয়ে পিছিয়ে যায় বা অজুহাত দিয়ে সরে পড়ে, তারা জান্নাতের কিনারে এসে ছিটকে পড়ে। আল্লাহ বলেন, 'লোকদের মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ কপট বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীরা) আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তাকে কল্যাণ স্পর্শ করলে শান্ত হয় এবং বিপর্যয় স্পর্শ করলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেটাই হ'ল তার সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(হাজ্জ ২২/১১)*। তিনি বলেন, 'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে'। 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না সুন্দর সেই আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল'! *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

একদল মানুষ আছেন, যারা নিজেদের মনগড়া ফৎওয়া, মাযহাব ও রেওয়াজ ঠিক রাখার জন্য মুহাদ্দেছীন ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের বাইরে গিয়ে অহেতুক যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেন। এরা যুক্তি দিয়ে কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য

অর্থকে এড়িয়ে চলেন এবং যেকোন মূল্যে নিজের বুঝটা ঠিক রাখেন। এদের দিকে ইঙ্গিত করেই ওমর ফারূক (রাঃ) বলে গেছেন, ইসলামকে ধ্বংস করে তিনজন : (১) পথভ্রষ্ট আলেম (২) আল্লাহ্‌র কিতাবে বিতর্ককারী মুনাফিক এবং (৩) পথভ্রষ্ট (সমাজ ও রাষ্ট্র) নেতারা।[৩০] তিনি সাবধান করে বলেন, সত্বর কিছু লোক আসবে, যারা তোমাদের সাথে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে ঝগড়া করবে। তোমরা তাদেরকে হাদীছ দিয়ে পাকড়াও কর। কেননা হাদীছবিদগণ আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে সবার চাইতে বিজ্ঞ' *(দারেমী হা/১১৯)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, সত্বর একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের সবকিছু তাদের রায় অনুযায়ী ক্বিয়াস করবে' *(দারেমী হা/১৮৮)*। শা'বী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা ক্বিয়াসকে ধারণ কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা হালালকে হারাম করবে এবং হারামকে হালাল করবে' *(দারেমী হা/১৯২, সনদ ছহীহ)*। যেমন এ যুগে সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যাভিচার সহ প্রায় সকল প্রকার হারামকে হালাল করা হচ্ছে পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ও কপট যুক্তি দিয়ে। আল্লাহ বলেন, যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জ্বিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তির মত আমরাও তাই বলছি। তাহ'লে কাফেরদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? সূদ-ঘুষের টাকা খেয়ে ইবাদত করছি। আর ভাবছি জান্নাত পাব। সেটা কি সম্ভব?

প্রবৃত্তিপূজারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে আলী (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখে ও ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করে। অতঃপর কা'বাগৃহে হাজারে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইবরাহীমের মাঝখানে নিহত হয়। তাহ'লেও ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে প্রবৃত্তিপূজারীদের সঙ্গে উত্থিত করবেন' *(দারেমী হা/৩১০)*। বিগতযুগে ছাহাবী ও তাবেঈগণ এইসব লোকদের এড়িয়ে চলতেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকটে একজন লোক এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি শুনেছি লোকটি

৩০. দারেমী হা/২১৪; মিশকাত হা/২৬৯।

বিদ‘আতী। যদি সে বিদ‘আতী হয়ে থাকে, তবে তাকে তুমি আমার সালাম দিয়ো না’।[৩১] ইবনু সীরীন ও হাসান বাছরী বলেন, তোমরা কখনোই বিদ‘আতী ও ঝগড়াটে লোকদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে তর্কে জড়াবে না ও তাদের কোন কথা শুনবে না *(দারেমী হা/৪০১)*। ইবনু সীরীন পরিষ্কারভাবে বলেন, নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইলম হল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ’।[৩২] ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা রায়পন্থীদের থেকে দূরে থাক। ওরা সুন্নাতের শত্রু। হাদীছ আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ওরা মনগড়া কথা বলে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করে’ *(দারাকুৎনী হা/৪২৩৬)*। অতএব কোন প্রশ্নে কেবল ছহীহ হাদীছ দিয়ে জবাব দিতে হবে। না জানা থাকলে বলবে ‘আল্লাহ সর্বাধিক অবগত’। ‘কোনরূপ ভান করা যাবে না এবং কোনরূপ বিনিময় কামনা করা যাবে না’।[৩৩] সকালে যে সত্য জানা ছিল না, বিকালে তা জানলে সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সর্বদা যোগ্য ও তাক্বওয়াশীল হাদীছপন্থী আলেমের শরনাপন্ন হতে হবে। অবশ্যই কোন রায়পন্থী আলেমের কাছে নয়।

অতএব হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। বিনয়ী ও সহনশীল হও। সব ছেড়ে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হও এবং জামা‘আতী যিন্দেগী অবলম্বন কর। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে সমাজের পুঞ্জীভূত জাহেলিয়াত দূর কর। সময়ের অপচয় করো না। প্রতি মুহূর্তে আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই যে কাজে নেকী আছে তা কর, যাতে নেই তা ছাড়। যে বসে থাকবে, তর্ক করবে, সে পিছনে পড়ে থাকবে। তুমি নবীদের তরীকায় সমাজ সংস্কারে ব্রতী হও। আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে চল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৩৪]

৩১. তিরমিযী হা/২১৫২; ইবনু মাজাহ হা/৪০৬১; দারেমী হা/৩৯৩; মিশকাত হা/১১৬।
৩২. দারেমী হা/৪২৪; মিশকাত হা/২৭৩।
৩৩. বুখারী হা/৪৭৭৪; মুসলিম হা/২৭৯৮; মিশকাত হা/২৭২; ছোয়াদ ৮৬।
৩৪. ১৬তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

৮. আদর্শ চির অম্লান

আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা **মানুষ**। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী। আমাদের দ্বিতীয় পরিচয় আমরা **মুসলমান**। আমরা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করি। আমাদের তৃতীয় এবং বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় হ'ল আমরা **আহলুল হাদীছ**। আমরা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। এ দু'টি উৎসের প্রতি অবিচল আস্থা ও পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। কেননা মানুষের জ্ঞান কোন বিষয়ে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়ছালা দানের ক্ষমতা রাখে না। বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র 'অহি' অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের ব্যাখ্যাকারী হ'তে পারে। কিন্তু পরিবর্তনকারী বা রহিতকারী হ'তে পারে না। রাজনীতিকের রাজনীতি মিথ্যা হ'তে পারে। অর্থনীতিবিদের অর্থনীতি মিথ্যা হ'তে পারে। দার্শনিকের দর্শন মিথ্যা হ'তে পারে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান মিথ্যা হ'তে পারে। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন বাণী মিথ্যা হবে না। পৃথিবীর সকল যুক্তিবাদী ও শান্তিবাদী মানুষকে এক সময় অহি-র বিধানের কাছে ফিরে আসতেই হবে। এখানে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। নানাবিধ অপযুক্তির আড়ালে দুনিয়ার মানুষ সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহকে এড়াতে চেয়েছে। ইসলামের নিয়ন্ত্রিত জীবনধারা থেকে মুক্ত হবার জন্য শয়তান সর্বদা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলেম-জাহিল, জ্ঞানী-মূর্খ কেউ শয়তানের খোঁচা থেকে মুক্ত নয়।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শন আজ মানুষের শান্তিময় সমাজকে ক্ষমতালোভী অসংখ্য দলে বিভক্ত করে পরস্পরে সদা মারমুখী হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত করেছে। ইহূদী-নাছারাদের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের পারস্পরিক সহমর্মী সমাজকে হৃদয়হীন হাঙর-কুমীরের সমাজে পরিণত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে বস্তুসর্বস্ব ও স্বার্থান্ধ বানিয়েছে। চিরন্তন মানবীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহানুভূতি আজ সমাজ থেকে বিদায় নিতে

চলেছে। মানুষ্যকল্পিত নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের নামে ও রসম-রেওয়াজের নামে বদ্ধ জোয়ালের ন্যায় মানুষের কাঁধে চেপে বসে আছে।

এক্ষণে আহলেহাদীছের দায়িত্ব কী হবে? তারা কি পাশ্চাত্য রাজনীতির ও অর্থনীতির পদলেহী হবে? তারা কি সেক্যুলার, ছূফী ও মডারেট ইসলামিষ্ট সনদ নেবার জন্য গলদঘর্ম হবে? তারা কি ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির পুচ্ছধারী হবে? তারা কি আনুগত্যহীন দলবাজ হবে? কিংবা চরমপন্থী অস্ত্রবাজ হবে? কোনটাই নয়। কেননা সে তো কুরআন ও সুন্নাহ্র ধারক ও বাহক হ'তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ঠ অনুসারী হওয়াই তো তার গতিপথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরাই তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। সে কখনোই পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। বরং সর্বাবস্থায় সে পুঁতি-গন্ধময় পরিস্থিতি পরিবর্তনের সংগ্রাম করবে। কুরআন ও সুন্নাহ্র স্বচ্ছ আলোয় সে পথ দেখবে। মানুষের বানোয়াট তন্ত্র-মন্ত্রের চাকচিক্যে সে পথহারা হবে না। সে যদি কখনো একা হয়ে যায়, তথাপি তাকে কুরআন ও হাদীছের হেফাযতকারী হ'তে হবে। কোন অবস্থাতেই আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকার গলিপথে যাওয়া যাবে না। কারণ **'আহলেহাদীছ'** প্রচলিত অর্থে কোন মাযহাব, মতবাদ, ইযম বা School of thought-এর নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। **এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত**। **'আহলেহাদীছ'** তাই চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি দাওয়াত বা একটি আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আধুনিকতার চমক দেখে বা বিলাসিতার জৌলুসে এ আন্দোলনের সত্যিকারের কর্মীরা কখনো পথ হারায় না। জীবনের উত্তাল পথে কুরআন ও সুন্নাহ্র দু'টি রেলপথে এরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। যুলুম-অত্যাচারের ভয় ও প্রলোভনের ফাঁদ তাদেরকে এ আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। এ আন্দোলন বিশ্বমানবতাকে সকল বিভক্তি ও দলাদলি ভুলে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একক নেতৃত্বে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়।

বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইসলামকে সর্বযুগীয় সমাধান বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের গতিশীল ও Dynamic হওয়ার স্বার্থেই ইজতিহাদকে সকল যুগে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাক্বলীদে শাখছীকে অবশ্য বর্জনীয় বলে মনে করেন। কিন্তু ইজতিহাদের নামে কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য নির্দেশ ও মূলনীতিকে লংঘন করে মধুর বদলে বিষ ভক্ষণে তারা রাযী নন। 'মতপার্থক্যসহ ঐক্যে'র নামে তারা শিরক ও বিদ'আতকে হযম করে কোন ঐক্যজোট করতে পারেন না। তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুন্ন রেখেই তারা মুসলিম উম্মাহকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে চান। আহলেহাদীছের এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য চির অম্লান ও শাশ্বত। যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ **'আহলেহাদীছ'** থাকতে বা হ'তে পারে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াত করুন- আমীন![৩৫]

৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে

'আহলেহাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যারা সার্বিক জীবন পরিচালনা করেন, তাদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। অন্য কথায় দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন ফের্কা বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং সালাফে ছালেহীন সর্বদা এ পথেরই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই মওজুদ রয়েছে। আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা

৩৫. ১২তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০০৯।

আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ‘আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। তারা মানুষ হিসাবে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকলের প্রতি বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল। কিন্তু দুনিয়াবী সফলতা ও পরকালীন মুক্তির পথ হিসাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের প্রতি নিরাপোষভাবে একনিষ্ঠ।

উৎপত্তি : মুসলমানদের মধ্যে যখন থেকে বিদ‘আতের সূচনা হয়েছে, তখন থেকেই তার বিপরীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে। তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের (২৩-৩৫ খৃ.) শেষদিকে জনৈকা নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহূদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-র মাধ্যমে যে রাজনৈতিক বিভক্তির সূচনা হয়, তার সূত্র ধরে পরবর্তী খলীফা আলী (রাঃ)-এর সময়ে ৩৭ হিজরী থেকে শী‘আ ও খারেজী নামে দুই চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিদ‘আতী দল সমূহের উত্থান ঘটে। তারা সবাই স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করতে থাকে। তখন ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম এইসব বিদ‘আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং বিদ‘আতীদের বিপরীতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁরা আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ নামে অভিহিত হন। এভাবে তাঁদের মাধ্যমেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি হয়।

ক্রমবিকাশ : বিদ‘আতীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সাধিত হ’তে থাকে। যা তার সূচনা থেকেই প্রচারমূলক ও প্রতিরোধ মূলক দু’পদ্ধতিতে এগিয়ে চলে। ক্রমবিকাশের এই গতিধারা বা ইতিহাসকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) স্বর্ণযুগ : যা অব্যাহত ছিল ৩৭ হিজরী পর্যন্ত। যে সময়ে মুসলমান জীবন পরিচালনার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছকেই একমাত্র নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। (২) বিদ‘আতীদের উত্থান যুগ : ৩৭ হিজরী থেকে শুরু হয়ে মোটামুটি ১০০ হিজরী পর্যন্ত। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও উছূলী বিতর্ক ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে উঠে। উত্থান ঘটে শী‘আ, খারেজীসহ নানা পথভ্রষ্ট দল ও উপদল সমূহের। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম

এসব ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদ‘আতী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাওয়াতী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই যুগে বিদ‘আতী দলগুলোর বিপরীতে আহলেহাদীছগণের নামীয় ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে। (৩) সংকট ও সংস্কার যুগ (১০০-১৯৮ হি.) : এই যুগে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রধানতঃ চারজন বিদ্বানের মাধ্যমে জাহমিয়া, মু‘তাযিলা, মুশাব্বিহা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটে। যদিও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতী তৎপরতা এবং উমাইয়াদের প্রশাসনিক কঠোরতার ফলে এদের ফিৎনা তেমন বিকাশ লাভ করেনি। (৪) সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২ হি.) : ১৫০ হিজরীর পরে গ্রীক দর্শন সঞ্জাত যুক্তিবাদের প্ররোচনায় একদল কালাম শাস্ত্রবিদের আর্বিভাব ঘটে। এইসব মুতাকাল্লিমীন ও মু‘তাযিলাদের কুটতর্কে মুসলমানদের হাদীছ ভিত্তিক সহজ-সরল জীবন ধারায় ব্যত্যয় ঘটে এবং বহু মানুষ আক্বীদাগত বিভ্রান্তিতে পতিত হন। আব্বাসীয় খলীফাদের কেউ কেউ মু‘তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করায় এবং এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করায় আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপর নেমে আসে মহা পরীক্ষা। যার মর্মান্তিক শিকার হ’তে হয় আহলেহাদীছগণের নেতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে (১৬৪-২৪১ হি.)। তবুও সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করে হাদীছপন্থী বিদ্বানগণ ছাহাবা যুগের আক্বীদা ও আমল অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় ব্রতী থাকেন।

(৫) সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২–৪র্থ শতাব্দী হিজরী) : এই যুগের প্রথমার্ধ্ব ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের রেনেসাঁ যুগ। এ সময় মু‘তাযিলাগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায় এবং হাদীছ সংকলনের স্বর্ণ যুগ শুরু হয়। ৩য় শতাব্দী হিজরী ‘হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগ’ হিসাবে অভিহিত হয়। কুতুবে সিত্তাহ এ যুগেই সংকলিত হয়। অসংখ্য আহলেহাদীছ বিদ্বান এ যুগে হাদীছ সংকলনের কাজে লিপ্ত হন এবং তাদের মূল্যবান লেখনী পরিচালনা করেন। (৬) তাক্বলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরী–পরবর্তী যুগ) : এই সময় মু‘তাযিলাগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও উছূলী বিতর্ক চলতে থাকে। কুরআন ও হাদীছের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণ এবং ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ছেড়ে বিদ্বানগণ স্ব স্ব লৌকিক জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান তালাশ করতে শুরু করেন। ফলে কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্ক, বিভিন্ন মুজতাহিদ

ইমামের ফিক্বহী মতপার্থক্য, ছূফীবাদের সূচনা ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। যা অবধারিতভাবে মানুষকে মাযহাবী তাক্বলীদের অন্ধ গুহায় নিক্ষেপ করে। ফলে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পর থেকে মুসলমানরা নিজেদেরকে বিভিন্ন মাযহাবী নামে পরিচিত করতে শুরু করে। মাযহাবী তাক্বলীদের অন্ধ গোড়ামী ও হঠকারিতা অবশেষে ৬৫৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলামী জগতের সর্বত্র চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ক্বাযী নিযুক্ত হয়। ৮০১ হিজরীতে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চার পার্শ্বে চার মাযহাবের জন্য চারটি পৃথক মুছাল্লা কায়েম করা হয়। অবশেষে ১৩৪৩ হিজরীতে (১৯২৬ খৃ.) সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয উক্ত বিদ'আত উৎখাত করেন ও মুসলিম উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ জামা'আতে ফিরিয়ে আনেন। যা আজও অব্যাহত আছে *(দ্রঃ থিসিস ৪র্থ অধ্যায়)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

বর্তমানে আমরা তাক্বলীদী সংকীর্ণতার ঘন অন্ধকারের যুগে বাস করছি। এর বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন পূর্বের ন্যায় আজও প্রচার ও প্রতিরোধ দু'ভাবে এগিয়ে চলেছে। শত নির্যাতন ও জেল-যুলুম সহ্য করেও কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এ আন্দোলন আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ দেশে যার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে এবং সত্য-সন্ধানী মানুষ ক্রমেই এ আন্দোলনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। *আলহামদুলিল্লাহ*।

অন্যান্যদের সাথে পার্থক্য : আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল দু'ধরনের : (১) আদর্শগত ও (২) কর্মগত। আদর্শগত পার্থক্য বলতে ইত্তেবা ও তাক্বলীদকে বুঝায়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইত্তেবায় বিশ্বাসী এবং অন্যেরা তাক্বলীদে বিশ্বাসী। কর্মগত পার্থক্য বলতে সমাজ পরিবর্তন ও সরকার পরিবর্তন বুঝায়। অন্যেরা সরকার পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সমাজ পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেয়। আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই এ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। এ

আন্দোলনের কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে এবং সর্বদা সরকারকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। তারা সাংগঠনিক মযবুতির মাধ্যমে সরকারের নিকট থেকে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামী পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সরকার কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিলে তারা সকল প্রকার বৈধ পন্থায় তার প্রতিবাদ করে। তারা তাদের কর্মীদের রাজনীতি সচেতন করে গড়ে তোলে এবং দেশ যাতে কোন আগ্রাসী শক্তির পদানত না হয়, সেজন্য জনমত তৈরী করে। কিন্তু 'সরকার হটাও' আন্দোলনের নামে হরতাল, গাড়ী ভাংচুর ও হিংসা-হানাহানির মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং এক অন্যায় হটাতে গিয়ে আরেক অন্যায় করাকে তারা গুরুতর অপরাধ মনে করে। তারা নেতৃত্ব নির্বাচনের বর্তমান প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে সহজ-সরল ইসলামী পদ্ধতির প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায়। সরকার অন্যায় থেকে বিরত না হ'লে তারা আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করে। যেমন ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ দো'আ করেছিলেন। ফলাফল সবারই জানা। অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলির 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' আন্দোলনের তারা বিরোধিতা করে। যা মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে দেয় না। এসবের বিপরীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইসলামের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার ও তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জান বাজি রেখে আন্দোলন করে থাকে। এটাই তাদের আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলব, যতদিন পৃথিবীতে বিদ'আতী আন্দোলন থাকবে, ততদিন তার বিপরীতে আহলেহাদীছ আন্দোলন থাকবে। হকপন্থী মুসলিমগণ সর্বদা এ আন্দোলনের সাথী থাকবেন এবং এভাবেই ক্বিয়ামত এসে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে এ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে কবুল করে নিন এবং এর মাধ্যমে আমাদের পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করুন–আমীন![৩৬]

৩৬. ১৪তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১১।

[১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার একদিন পূর্বে ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টার দিকে তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে সংগঠনের আমীর সহ নেতা-কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়েছিল এবং ইজতেমা পণ্ড করে দিয়েছিল। সেদিনের সেই অন্যায় গ্রেফতারের স্মরণে তার বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের স্বরচিত ২২ লাইনের প্রতিবাদী কবিতা। যা তিনি সম্পাদকীয় রূপে পেশ করেন *(সম্পাদক)*]।

১০. আমি চাই

আমি স্বাধীনতা চাই
আমি আমার কথাগুলি প্রাণ খুলে বলতে চাই
আমি আমার ভাষার স্বকীয়তা চাই
আমি আমার ধর্মীয় স্বাধীনতা চাই
আমি আমার বাঁচার অধিকার চাই
আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই
আমি মিথ্যা মামলাকারীর শাস্তি চাই
আমি আমার জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা চাই
আমি আমার দেশের স্বাধীনতা চাই
আমি মুসলিম ছিলাম, তাই আমি আজ স্বাধীন বাংলাদেশী
আমি তাই প্রথমে মুসলিম, পরে বাঙ্গালী একথা স্পষ্ট করে বলতে চাই
আমি পদ্মা-তিস্তার মালিক ছিলাম, কেন তা আজ মরুভূমি?
আমি সুরমা-বরাকের মালিক ছিলাম, কেন আজ তার গলায় ফাঁস?
আমি কেন আজ মা-বোন নিয়ে নিজ ঘরেও অনিরাপদ?
আমি আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিচার চাই*
আমি কেন মরি প্রতিদিন সীমান্তে গুলি খেয়ে?
আমি কেন প্রতিদিন সূদ-ঘুষের হারাম খাই?
আমি কেন পেটের দায়ে নিজের সন্তান বিক্রি করি?

আমি কেন বেকার হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরি?
আমি কুরআন-হাদীছ মেনে চলতে চাই, তাই আমি আহলেহাদীছ
আমি শিরক ও বিদ'আতমুক্ত জীবন চাই, তাই আমি আহলেহাদীছ
আমি আমার দেশে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব চাই, তাই আমি আহলেহাদীছ
এগিয়ে চলো আত-তাহরীক, আমরা তোমার স্বাধীন কণ্ঠ চাই॥[৩৭]

[২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'১২ বিশেষ সংখ্যার জন্য ২২ লাইনের কবিতা]

১১. ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন

২০শে নভেম্বর'১৩ বুধবার বিকাল ৪-৩০ মিনিট। মোট ১০টি মিথ্যা মামলার সর্বশেষ হত্যা মামলায় বিচারকের মুখ দিয়ে বের হওয়া একটি শব্দ 'খালাস'। সাথে সাথে বের হ'ল একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস। মুখে উচ্চারিত হ'ল *আলহামদুলিল্লাহ*। কেউ খুশীতে বলে উঠলেন *আল্লাহু আকবর*। সত্যের জয় হ'ল। সবাই আদায় করল সিজদায়ে শুক্র। দীর্ঘ প্রায় নয় বছর ধরে চলা একটি নিকৃষ্ট অপবাদের বিচারিক সমাপ্তি। বুক থেকে নেমে গেল নিরুদ্ধ যন্ত্রণার এক দুঃসহ বোঝা। ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টার দিকে মারকাযের বাসা থেকে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আমাদের বিরুদ্ধে সপ্তাহকালব্যাপী চালানো তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের পেটুয়া মিডিয়া ও সেই সাথে সেক্যুলার পত্রিকাগুলির লাগামহীন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আত-তাহরীক মার্চ'০৫ সংখ্যায় 'মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা' শিরোনামে আমরা যে সম্পাদকীয় লিখে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় প্যারায় বলেছিলাম 'তথ্য সন্ত্রাসের এই যুগে একটি মিথ্যাকে শতকণ্ঠে বলিয়ে গোয়েবল্সীয় কায়দায় সত্য বলে প্রমাণিত করার যে কোশেশ চলছে, তার দ্বারা পাঠক সমাজ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হবে, সমাজ বিনষ্ট হবে। কিন্তু দেরীতে হলেও চূড়ান্ত বিচারে সত্যই জয়লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য। সমাজ সংস্কারকগণের জীবনে চিরকাল আমরা এটাই দেখে

৩৭. ১৫তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১২।

এসেছি’। সেদিনের সেই কথাগুলি দেরীতে হ’লেও অবশেষে বাস্তবায়িত হ’ল দেখে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি।

আজ যে প্রশ্নটি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা হয়ে মনের আয়নায় বারবার ভেসে উঠছে, সেটি এই যে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে যা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তা কি সরকার ফেরৎ দিতে পারবেন? একই মামলায় যারা বিগত প্রায় ৯ বছর কারাগারে থেকে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় বেকসুর খালাস হয়ে বের হচ্ছে, তাদের কাছে সরকার ইহকালে ও পরকালে কি জবাবদিহি করবে? দেশে ও বিদেশে আমাদের ব্যাপারে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং অনেকের মধ্যে যে মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, সেগুলি সরকার কি দূর করতে পারবে? এছাড়াও আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতির তো কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের যে চল্লিশ-এর অধিক নেতাকর্মীকে পুলিশী নির্যাতন ও কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, এদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও নীরব কান্না ও তাদের পরিবারবর্গ ও নিকটজনদের বুকফাটা আর্তনাদ এবং ভক্ত অনুসারীদের অশ্রুভেজা দো‘আ সবই আল্লাহ্‌র কাছে জমা আছে। সাময়িক ক্ষমতার অহংকারে স্ফীত যালেমদের যেদিন নতমস্ত কে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হবে, আর তাদের হাতে নির্যাতিত মযলূমদের আবেদন যখন আল্লাহ শুনবেন, তখন কি জবাব দিবেন কথিত গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী এবং তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ও তাদের অন্ধ অনুসারীরা? কি জবাব দিবেন স্বঘোষিত বস্তুনিষ্ঠ (?) সাংবাদিকরা এবং সত্য প্রকাশে আপোষহীন (?) পত্রিকার মালিক ও কলাম লেখকরা? যারা কখনোই আমাদের পক্ষে সাহস করে দু’টো লাইন লেখেননি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের ৭টি কারাগারে থাকবার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। সব জায়গায় কারা কর্মকর্তাদের মন্তব্য অনুযায়ী কারাগারে নিক্ষিপ্ত প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ নিরপরাধ। মিথ্যা মামলায় ও অন্যায় বিচারে তারা জেলে আছে। অধিকাংশই দলীয় সরকার ও তাদের নেতা-পাতিনেতাদের হিংসা ও প্রতিহিংসার শিকার। স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারের উর্বর মস্তিষ্কে হাজতের নামে যে নিবর্তনমূলক আইনটি তৈরী হয়েছিল, সেই কালো আইনের যাঁতাকলে ফেলে আজ স্বাধীন

দেশের নিরপরাধ নাগরিকদের অন্যায়ভাবে কারা নির্যাতন করা হচ্ছে। ফলে বছরের পর বছর হাজতের নামে জেলের ঘানি টানছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ তাদের কথিত জনগণের সরকারের হাতে। তরুণ বয়সে এমনকি শিশুকালে হাজতের নামে জেলে ঢুকে বৃদ্ধ বয়সে বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসছে অনেকে। এমনকি বিনা বিচারে জেলখানায় ধুঁকে ধুঁকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করছে। অথচ সে জানে না তার অপরাধ কি? এমন নযীরও এই সভ্য (?) দেশে আছে। তাহ'লে কিজন্য তৈরী হয়েছে রাষ্ট্র? কিজন্য সরকার? কিজন্য এত আইন-আদালত? এর চাইতে জঙ্গলের জীবন তো অনেক ভাল? সেখানে পশুদেরও একটা মূল্যবোধ আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সেই মূল্যবোধটুকুও নেই। এই সমাজের নেতারা পারে না হেন কোন অপকর্ম নেই। যার সরাসরি শিকার আমরা এবং অন্যেরা।

আমাদের কোন রাজনৈতিক শত্রু থাকার কথা নয়। কেননা আমরা কারু ভোটের বাক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমরা কারু ব্যবসায়ের পার্টনার নই। আমরা কারু পদ ও পদমর্যাদার ভাগিদার নই। তবে কেন নেমে এল রাষ্ট্রীয় নির্যাতন? কারণ খুঁজতে গেলে যেতে হবে অনেক গভীরে। আর সেটি হ'ল এই যে, আমরা গতানুগতিকতার বাইরে মানুষকে আহ্বান করেছি লওহে মাহফূয থেকে আগত অভ্রান্ত সত্যের দিকে। সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে মানুষকে ডেকেছি উদাত্ত কণ্ঠে- আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। আসুন! ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ইসলাম বুঝি। তখন জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে যারা মানুষের উপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিয়েছে, মানুষকে ক্রীতদাসের চাইতে নিকৃষ্টভাবে শোষণ-নির্যাতন করে যাচ্ছে, তাদের কলিজায় আগুন ধরে গেল। অন্য দিকে যারা ইসলামকে নিজেদের মনের মত করে মিকশ্চার বানিয়ে তাকে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের হাতিয়ার বানিয়েছে, এমনকি স্বাধীন মানুষকে আল্লাহ্র পরিবর্তে কবরে সিজদা ও প্রার্থনা করিয়ে তাদের পকেট ছাফ করার ব্যবসায়ে রত আছে, তাদের গাত্রদাহ হ'ল। অতঃপর সত্যের আহ্বান শুনে বাঁধনহারা মানুষ যখন ছুটতে শুরু করল তার পরকালীন জীবনের চিরস্থায়ী শান্তির খোঁজে। বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ ও তরীকার বেড়াজাল ছিন্ন করে যখন

মানুষ ছুটলো ইসলামের আদিরূপের সন্ধানে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুগন্ধি পেয়ে, তখনই কুচক্রীরা তাদের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করল আমাদের উপরে। তারা চেয়েছিল তাদের সাজানো মিথ্যা মামলাগুলিতে ফাঁসিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে বাংলার যমীন থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু আমরা আমাদের সকল অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনা আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করেছিলাম। তাঁর কাছেই নিজেদেরকে সোপর্দ করেছিলাম। আমাদের নিয়তে কোন ত্রুটি ছিল না। আমাদের নির্ভরশীলতায় কোন শরীক ছিল না। আল্লাহ সেটারই পরীক্ষা নিয়েছেন দীর্ঘ নয় বছরে। অবশেষে তিনি আমাদের সাথীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। *আলহামদুলিল্লাহ*। আমাদের একটি বড় সান্ত্বনা এই যে, স্রেফ আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য কোন ব্যাপক ভিত্তিক জাতীয় সংগঠনকে পৃথিবীর কোথাও এরূপ রাষ্ট্রীয় পরীক্ষার সম্মুখীন আল্লাহ করেননি। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির নিদর্শন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। তবে আমরা চাই আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান এবং সেটাই আমাদের একমাত্র কাম্য। সেখানে যেন আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

পরিশেষে মিথ্যা মামলায় কারা নির্যাতিত সকল নেতা-কর্মীর প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্র নিকটে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করছি। সেই সাথে যারা আমাদের জন্য সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন, নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করেছেন ও দো'আ করেছেন, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে সর্বোত্তম পারিতোষিক কামনা করছি। অতঃপর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণভরা দো'আ করছি 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ভাই হাফীযুর রহমানের জন্য। যিনি তাঁর বিরুদ্ধে পত্রিকায় গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠ করে তৎক্ষণাৎ হার্টফেল করে আমাদের ঢাকা অফিসে মৃত্যুবরণ করেন ২০০৫ সালের ২২শে নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাতে। আল্লাহ তুমি তাকে এবং ইতিমধ্যে যেসব নির্যাতিত ও শুভাকাংখী ভাই ও বোন মারা গেছেন তাদের সকলকে ক্ষমা কর এবং তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান কর- আমীন![৩৮]

---

৩৮. ১৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৩।

১২. সত্যের বিজয় অবধারিত

সত্য সেটাই যা আল্লাহ প্রেরিত। আর মিথ্যা সেটাই যা আল্লাহ বিরোধী এবং যাতে প্রবৃত্তির রং মিশ্রিত। সত্য সর্বদা বিজয়ী এবং মিথ্যা সর্বদা পরাজিত। আল্লাহ বলেন, ‘তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে’ *(ছফ ৬১/৯)*।

অত্র আয়াতে ‘হেদায়াত’ ও ‘সত্যদ্বীন’ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে এবং ‘সকল দ্বীন’ বলতে ইসলামের বাইরে যুগে যুগে প্রচলিত সকল দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আর ‘বিজয়’ বলতে আদর্শিক ও রাজনৈতিক উভয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক বিজয় সর্বত্র সর্বদা না থাকাই স্বাভাবিক। তবে আদর্শিক বিজয় সর্বদা রয়েছে এবং থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আদর্শিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী ছিল। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ইমাম মাহদীর আগমনে পুনরায় বিশ্বব্যাপী সে বিজয় আসবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তবে ইমাম মাহদী আসার আগ পর্যন্ত ইসলাম সর্বদা কুফরী শাসনের অধীনে থাকবে এটা নয়। আল্লাহ বলেন, কাফেররা চায় আল্লাহ্র নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ চান তার নূরকে পূর্ণ করতে। আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না’ *(ছফ ৬১/৮)*। এর দ্বারা বুঝা যায় মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য চেষ্টিত থাকতে হবে। নইলে তারা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যার পরিণাম হবে জাহান্নাম। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিজয়ের পথ হবে নবীগণের গৃহীত পথ, অন্য কোন পথ নয়। তাছাড়া আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিজয়কে পৃথক করে দেখার কোন অবকাশ নেই। দু’টিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাত ও পা পৃথক হ’লেও তা যেমন একই দেহের অঙ্গ। তেমনি ধর্ম ও রাজনীতি বাহ্যতঃ পৃথক হ’লেও তা মানুষের জীবনের দু’টি অপরিহার্য দিক। যার একটি দ্বারা অপরটি প্রভাবিত।

মুমিনের সার্বিক জীবন তাওহীদের চেতনায় পরিচালিত হয়। জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগে আল্লাহ ব্যতীত সে অন্য কারু দাসত্ব করে না। আর সেই দাসত্বের বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে। যে

মুমিন উক্ত দুই উৎসের আলোকে জীবন পরিচালনা করেন, তিনি 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এটি তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। তারাই মাত্র ফিরক্বা নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। ক্বিয়ামতের প্রাক্কাল অবধি এই দলের বিজয়ী কাফেলা পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান থাকবে। বিরোধীরা বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩৯]

অতঃপর আদর্শিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল তিনটি। ১. লক্ষ্যের স্বচ্ছতা ২. উপলক্ষ্যের পবিত্রতা এবং ৩. দৃঢ় নৈতিকতা।

আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং তাতে কোন খাদ নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং পরকালে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে। এই লক্ষ্যে ব্যয়িত প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা আখেরাতে মুক্তির অসীলা মনে করি। অতঃপর আমাদের উপলক্ষ্যে এবং উপায়-উপকরণে প্রচলিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নষ্টামির কোন সংশ্রব নেই। সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কোন পন্থা আমরা অবলম্বন করি না। আমরা বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে হক প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্ন দেখিনা। নবীগণ স্ব স্ব যুগে প্রচলিত বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। আমরাও তা করি না। পার্থিব জয়-পরাজয় আমাদের নিকট মুখ্য নয়। পরকালীন মুক্তিই মুখ্য। আর সেটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ বিজয়। তবে বাতিলপন্থীরা সর্বদা হকপন্থীদের শত্রু। সেকারণ তাদের হাতে চিরকাল হকপন্থীরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমরাও হয়েছি। ইতিমধ্যে যারা বাতিল ছেড়ে হক কবুল করে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন, তাদের উপরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাতিলের হামলা হচ্ছে। এগুলি বাতিলপন্থীদের অন্ত র্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ এবং আদর্শিক পরাজয়ের লক্ষণ। একদিন তাদের রাজনৈতিক পরাজয়ও ঘটবে ইনশাআল্লাহ। কারণ আদর্শিক বিজয়ের সাথে সাথে আসে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজয়, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

সবশেষে দৃঢ় নৈতিকতা। *আলহামদুলিল্লাহ*। আমাদের কর্মীদের অধিকাংশ এ ব্যাপারে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আমাদের উপর যখন ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার ও বর্বরতম

---

৩৯. বুখারী হা/৭৩১১; মুসলিম হা/১৯২০।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল, তখনও আমাদের কর্মীরা লক্ষ্য হারায়নি বা নীতিচ্যুত হয়নি। যদিও তৎকালীন সরকারের লেজুড় পার্টি করার জন্য সব ধরনের টোপ ও চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল।[৪০] ভীরু ও দুর্বলচেতা এবং 'আন্দোলন' সম্পর্কে অজ্ঞ বা আধা অজ্ঞ কিছু কর্মী তাতে বিভ্রান্ত হয়েছিল তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থে। এজন্য আমরা দুঃখিত এবং আমরা তাদের হেদায়াত কামনা করি। কিন্তু এতে আমরা বিস্মিত নই। কারণ এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। তাছাড়া হক আন্দোলনের জন্য যোগ্য কর্মী আল্লাহ নিজে থেকেই বাছাই করেন। পবিত্র থেকে অপবিত্রদের পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ হকপন্থী মুমিনদের ছাড়বেন না বলে নিজেই ওয়াদা করেছেন *(আলে ইমরান ৩/১৭৯)*।

উপরে বর্ণিত তিনটি শর্ত যদি আমরা অক্ষুণ্ন রেখে শান্তিপূর্ণ পথে দাওয়াত ও সংগঠন চালিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের ধর্মভীরু অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অর্থে 'আহলেহাদীছ' হবেন অথবা তাদের সমর্থক হবেন এবং ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে *ইনশাআল্লাহ*।

তাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন ইমারতের অধীনে নিঃস্বার্থ কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ দাওয়াত। সমাজ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে শহরে-গ্রামে, দেশে ও প্রবাসে সর্বত্র সচেতন কর্মী বাহিনী গড়ে ওঠা আবশ্যক। যাত্রাপথে বাধা আসবে এবং স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থ উদ্ধারের পর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চলে যাবে, সেটা ভেবে নিয়েই ধৈর্য্যের সাথে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। ভরসা স্রেফ আল্লাহ্র উপরে, ফলাফলও তাঁর হাতে। *নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাৎহুন ক্বারীব*।[৪১]

---

৪০. 'আন্দোলন'-এর আমীরকে পৃথক জেলখানায় ফাঁসির সেলে আটকে রেখে বাকী তিনজনকে বের করে নেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে দিয়ে ঢাকায় 'ইনছাফ পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু আমীরের দৃঢ় অসম্মতির কারণে তা ধোপে টেকেনি। পরে তাদের দিয়ে আহলেহাদীছের নামেই দু'টি প্যাড সর্বস্ব দলের ঘোষণা দেওয়া হয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ মর্মে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ভেঙ্গে তিনভাগ হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা এই যে, 'আন্দোলন' আরও যোরদার ও শক্তিশালী হয়েছে। ভাঙ্গনের নায়করাই ঘরে বসে গেছে।

৪১. ১৭তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১৪।

১৩. আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা

‘ইজতেমা’ অর্থ সম্মেলন। আরবীতে বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটি ইসলামী সম্মেলন। অতঃপর ‘আহলেহাদীছ’ বলার মাধ্যমে এর অর্থ হবে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ সংগঠন কর্তৃক প্রচারিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর আলোকে জীবন গড়ায় বিশ্বাসী ঈমানদার মুসলমানদের সম্মেলন। যা প্রতি বছর একবার তার সাথী ও অনুসারীদের একত্রিত করে। যার মাধ্যমে তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং নতুনভাবে এগিয়ে যাবার প্রেরণা লাভ করে। দেহ-মন ঈমানী জ্যোতিতে আলোকিত হয় ও সেই আলোকে জীবন পথে পদচারণা করে। ‘তাবলীগ’ অর্থ পৌঁছে দেওয়া, প্রচার করা। ইসলামকে তার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গরূপে জাতির সম্মুখে তুলে ধরাই হ’ল ‘আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা’র মৌলিক উদ্দেশ্য।

জাতির নিকটে এ সংগঠনের পরিষ্কার বক্তব্য হ’ল, ‘আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ। থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ’। জাহান্নাম থেকে মুক্তিকামী জনগণের প্রতি এ সংগঠনের আহ্বান ‘মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ’। অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠ দাওয়াত ও শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ এ সংগঠনের মূলমন্ত্র। নেতৃবৃন্দের প্রতি আকুল আবেদন, ‘সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর’। জনগণের প্রতি দরদভরা আহ্বান, ‘আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। এ সংগঠনের তাবলীগী ইজতেমায় মানুষকে ‘তাওহীদে ইবাদাত’-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যাতে মানুষ শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্ব করে। যাতে মানুষ রাজনীতির নামে আল্লাহ্র গোলামী বাদ দিয়ে মানুষের গোলামী না করে। আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে মানুষের মনগড়া বিধানের মাধ্যমে নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত না হয়। যাতে মানুষ ইসলামের শোষণমুক্ত ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থনীতি ছেড়ে রক্তচোষা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট না হয়। যাতে মানুষ ধর্মের নামে

ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা ও অলীক কিচ্ছা-কাহিনীর ফাঁদে ফেলে মৃত মানুষের পূজা না করে এবং আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়া অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কারের গোলামী না করে। এক কথায়, মানুষ যেন তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করে এবং কর্মজগতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়। আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝকে অগ্রাধিকার দেয়।

আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমার উপরোক্ত দাওয়াত প্রকৃত ঈমানদারগণের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানে। হোনায়েন যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত রাসূল (ছাঃ)-এর ডাকে যেমন ভক্ত ছাহাবীগণ এমনকি বাহন ছেড়ে পায়ে হেঁটে দৌড়ে চলে এসেছিলেন, স্বচ্ছ ঈমানের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রে বিপদগ্রস্ত মুমিন নর-নারীগণ তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অমিয়বাণী শুনে পথ পাওয়ার জন্য এই ইজতেমায় ছুটে আসে। বহু মানুষ তাদের লালিত বিশ্বাস ও গোঁড়ামি ছেড়ে তওবা করে ফিরে আসে আল্লাহ্র পথে। এভাবে জান্নাত থেকে নেমে আসা আদম সন্তান যখন জান্নাতী রাস্তার সন্ধান পায়, তখন সবকিছু ছেড়ে সে এপথেই চলে আসে। আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমার সফলতা এখানেই।

এই ইজতেমায় শ্রোতা হিসাবে সকল আদম সন্তানের প্রবেশাধিকার রয়েছে, যদি তিনি আল্লাহ্র পথের হেদায়াত কামনা করেন। এই ইজতেমা মুমিনকে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। যারা জাহান্নামে প্রবেশ করা ছাড়াই শুরুতে জান্নাতী হবে। বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা তাই শিরক ও বিদ'আতমুক্ত স্বচ্ছ জীবনের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর একটি মহতী সুযোগ বটে।

আহলেহাদীছগণ ক্বিয়ামত অবধি হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে এবং মানুষকে হক-এর পথে আহ্বান জানাবে। স্বার্থান্ধ মানুষ সর্বদা বাধা সৃষ্টি করলেও আল্লাহ্র রহমতে এ দলই চির বিজয়ী থাকবে। আর প্রকৃত বিজয় হ'ল আখেরাতের বিজয়। দুনিয়ার বিজয় নয়। সংখ্যা ও শক্তি কখনোই সত্যের মাপকাঠি নয়। সত্য সেটাই যা আমাদের রবের কাছ থেকে আসে। আর তা

হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যার অনুসারী প্রথম দল হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর তাঁদের শিষ্য তাবেঈনে এযাম। অতঃপর তাঁদের শিষ্য তাবে তাবেঈগণ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারী আহলেহাদীছগণ। এ নাম আমাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। যা অন্য মুসলমান থেকে আমাদের স্বতন্ত্র করে দেয়। যেমন সর্বত্র বাতিলপন্থী থেকে হকপন্থীরা স্বতন্ত্র থাকে।

আহলেহাদীছগণ কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হন না। তারা সর্বদা মধ্যপন্থী হন ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন। পরিবর্তিত যেকোন পরিস্থিতিতে তারা দৃঢ়চিত্ত থাকেন। পরিস্থিতি তাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং তারাই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করেন। তারা কখনোই পরাজিত হন না। বরং সর্বদা বিজয়ী থাকেন। হক-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যেকোন নির্যাতনকে তারা হাসিমুখে বরণ করেন এবং তাকে আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন। তারা স্রোতে ভেসে যান না, বরং স্রোতকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তাই তাদেরকে সর্বদা সংগ্রামী জীবন যাপন করতে হয়। আর সেজন্যই তারা আল্লাহ্র হুকুমে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় একই ইমারতের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ দেশে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র সাংগঠনিক রূপ মাত্র। আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা তাদেরই বার্ষিক কেন্দ্রীয় মিলন মেলা। জান্নাত পাগল মানুষকে অত্র ইজতেমায় স্বাগত জানানো হয়।

বর্তমানে রাজশাহী কেন্দ্র থেকেই এ দাওয়াত বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে। দেশে ও প্রবাসে জানা ও অজানা সকল মানুষের নিকট এ ইজতেমার উদাত্ত আহ্বান, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। আসুন! জান্নাতের পথে ফিরে চলি'। আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল কর- আমীন![৪২]

৪২. ১৮তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৫।

১৪. মুসলিম ও আহলেহাদীছ

‘মুসলিম’-এর পারিভাষিক অর্থ ‘আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ’। ‘আহলেহাদীছ’ অর্থ ‘কুরআন ও হাদীছের অনুসারী’। ‘আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ’ হ’তে হ’লে তাকে অবশ্যই কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হ’তে হবে। এর বাইরে গিয়ে ‘মুসলিম’ হওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে কোন শিরক ও বিদ‘আত ছিল না। সকলেই কুরআন ও হাদীছের অনুসারী ছিল। সেকারণ ছাহাবায়ে কেরামের জামা‘আত এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সনিষ্ঠ অনুসারী ত্বায়েফাহ মানছূরাহ বা আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত দলকে সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণ ‘আহলুল হাদীছ’ বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষদিকে প্রধানতঃ ইহূদী চক্রান্তের কারণে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্র ধরে বিশেষ করে নওমুসলিমদের মাধ্যমে নানাবিধ বিদ‘আতী আক্বীদা ও আমলের সূচনা হয়। ফলে সমাজে আহলেহাদীছ ও বিদ‘আতী দু’টি দল চিহ্নিত হয়ে যায়। যা আজও আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় রহমতে ধন্য করবেন, তারা সবকিছু ত্যাগ করে হ’লেও আহলেহাদীছ হবেন ও এর জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। কারণ এটা পরিষ্কার যে, শিরক ও বিদ‘আত করে কেউ জান্নাত পাবে না। হাউয কাওছারের পানি চাইতে গেলে রাসূল (ছাঃ)-কে পানি দিতে নিষেধ করা হবে এবং বলা হবে, তুমি জানো না তোমার মৃত্যুর পরে ওরা কত অসংখ্য বিদ‘আত সৃষ্টি করেছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, দূর হও, দূর হও, যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ’।[৪৩] অতএব একজন বিদ‘আতী কালেমা শাহাদাত পাঠের কারণে মুসলিম হ’লেও সে আহলেহাদীছ নয়। মুখে যত দাবীই সে করুক, বিদ‘আতী কখনোই সুন্নী নয়। সে কখনোই ছাহাবায়ে কেরামের জামা‘আতের অনুসারী নয়। সে কখনোই নাজী ফেরক্বা নয়। অতএব যে আমলটুকুই মাত্র কবরে ও হাশরে আমাদের সাথী হবে, সেটাকে যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে নেওয়াটাই হবে যেকোন বুদ্ধিমান মুমিনের কর্তব্য।

৪৩. বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯৭; মিশকাত হা/৫৫৭১।

যারা বৈষয়িক জীবনে কুফরী আক্বীদা ও আমলের অনুসারী কিংবা চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী, কিন্তু ছালাতে আহলেহাদীছ, তারা সার্বিক জীবনে আহলেহাদীছ নন। অথচ একজন মুমিনকে জান্নাত পেতে গেলে সার্বিক জীবনে আহলেহাদীছ হ'তে হয়। যারা জেনে-শুনে ছহীহ হাদীছ মানেন না বরং কারু অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে বা নিজ খেয়াল-খুশীর মধ্যে জীবন কাটান, তারা হবেন হাউয কাওছার থেকে বিতাড়িত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। যাদের ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে সেদিন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, ওদের আমি চিনি, ওরাও আমাকে চিনে'।[৪৪]

এক্ষণে সামাজিক ঐক্যের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা 'মানুষ'। তাই প্রত্যেক মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ মানবতা প্রদর্শন করাই হ'ল ইসলামের বিধান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন'।[৪৫] অতঃপর ধর্মীয় পরিচয়ে আমরা 'মুসলিম'। কাফির ও মুসলিম একত্রে থাকলে সেখানে অবশ্যই 'মুসলিম' আমাদের ভাই। কারণ আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসের কারণে তারা ও আমরা এক। আল্লাহ বলেন, মুমিনগণ সকলে ভাই ভাই *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অতঃপর শুধু মুসলিমগণ একত্রে থাকলে সেখানে অবশ্যই আমি স্পষ্টভাবে একজন 'আহলেহাদীছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১৫ পৃঃ)*। এটা আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় এবং এটাই আমাদের গর্ব। জীবনের সর্বত্র ভাল ও মন্দের পার্থক্য রয়েছে। পৃথক বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য রয়েছে। এমনকি নিজ সন্তানদের মধ্যে উত্তম সন্তান পিতা-মাতার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। আমরাও আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হ'তে চাই। আমরা প্রথমেই জান্নাতে যেতে চাই। জাহান্নাম ভোগ করার পরে নয়'।[৪৬]

অতঃপর সামাজিক জীবনে একজন প্রকৃত আহলেহাদীছের অন্যতম নিদর্শন হ'ল, তিনি একজন আল্লাহভীরু ও যোগ্য আমীরের অধীনে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত হবেন।[৪৭] এজন্য তিনি আল্লাহ্র নামে আখেরাতে নেকী লাভের আকাঙ্ক্ষায় স্পষ্ট অঙ্গীকার তথা বায়'আতের মাধ্যমে আনুগত্যশীল

---

৪৪. প্রাগুক্ত।
৪৫. তিরমিযী হা/১৯২৪; আবুদাউদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫৬।
৪৬. বুখারী হা/৭৪৫০; মিশকাত হা/৫৫৮৪।
৪৭. মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

হবেন।[৪৮] কোন বিষয়ে মতভেদ হ'লে বা অপসন্দনীয় হ'লে সেক্ষেত্রে আমীরের নির্দেশ মেনে নিতে হবে এবং ছবর করতে হবে।[৪৯] যদি তা শিরক ও কুফরের পর্যায়ে না যায় *(লোকমান ৩১/১৫)*। এভাবে আহলেহাদীছের সমাজ সুশৃংখল সমাজে পরিণত হবে। প্রকৃত আহলেহাদীছের জন্য তাই বিচ্ছিন্ন জীবনের সুযোগ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল।[৫০] বিশেষ করে শিরক ও বিদ'আতপন্থীরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আহলেহাদীছদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা পৃথকভাবে দলাদলি করার কোন সুযোগ নেই। সংগঠনই শক্তি। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তিনি তাদেরকে ভালবাসেন' *(ছফ ৬১/৪)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। যারা এ আন্দোলনে জান-মাল উৎসর্গ করবেন, তারা অবশ্যই 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত হবেন। তারা অবশ্যই বাতিল থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। ঐক্যের নামে তারা কখনোই বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যাবেন না। হকপন্থী ভাই-বোনেরা অবশ্যই আল্লাহ্র রহমতে তাদের সাথী হবেন। এর অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ থাকবে। বরং অন্যদের প্রতি তাদের সর্বাধিক আগ্রহ ও উদারতা থাকবে তাদেরকে হক-এর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ও তাদেরকে হক-এর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। যে দরদ নিয়ে রাসূল (ছাঃ) মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন সেই দরদ নিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ মানুষকে দাওয়াত দিবেন কেবল নেকীর আশায়। কিন্তু নিজে কখনো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করবেন না। একইভাবে আহলেহাদীছগণ পারস্পরিক মতভেদকে লঘু করে দেখেন ও জামা'আতবদ্ধ জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![৫১]

---

৪৮. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।
৪৯. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
৫০. তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৬০০৩।
৫১. ১৮তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৫।

শিক্ষা বিষয়ক

১৫. শিক্ষা দর্শন ও কিছু প্রস্তাবনা

‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’। ‘সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ’তে’। ‘পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু’। ‘যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন’। ‘শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’ *(‘আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। মানব জাতির জন্য শেষনবীর মাধ্যমে পাঠানো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রথম আসমানী তারবার্তা এটি। তাই ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ’ল ‘পড়’। যা অন্য কোন ধর্মে নেই। কার নামে পড়বে? কি পড়বে? কিসের মাধ্যমে শিখবে? শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? চারটি বিষয়ের জওয়াব রয়েছে উক্ত পাঁচটি আয়াতে। এর মধ্যেই রয়েছে ইসলামের ‘শিক্ষা দর্শন’। আর তা হ’ল আত্মিক ও জৈবিক চাহিদার সর্বোত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে মানবতার সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধন। আর এটাই হ’ল বিশ্ব মানবতার শিক্ষা দর্শন। কেননা ইসলাম এসেছে মানব জাতির কল্যাণে। তার সকল নির্দেশনা বিশ্ব সমাজের উদ্দেশ্যে বিধৃত। মনে রাখা উচিত যে, ইসলাম এসেছিল অমুসলিমদের কাছে। তারাই এ শিক্ষাদর্শন কবুল করেছিল ও জগতে বরেণ্য হয়েছিল। তাই ইসলামী শিক্ষা দর্শনই মানব জাতির জন্য প্রকৃত শিক্ষাদর্শন। আয়াত পাঁচটির গুরুত্ব বিবেচনায় এর পর থেকে ‘অহি’ নাযিল হওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যাকে ‘অহি-র বিরতি কাল’ বলা হয়।

উক্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে, মানুষ পড়বে তার প্রভুর নামে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি হ’লেন সবচেয়ে দয়ালু। তাঁর উপরে কেউ নেই। অর্থাৎ **মানব শিশু প্রথমেই জানবে** যে সে আল্লাহ্র সৃষ্টি। সে প্রকৃতির সৃষ্টি নয় বা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, কিংবা বানর-হনুমানের বিবর্তিত কোন লেজখসা দ্বিপদ প্রাণী নয়। **দ্বিতীয় প্রশ্ন :** সে কি পড়বে? **জওয়াব :** সে পড়বে এমন বস্তু যা তাকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দিবে ও যাকে সে উপাসনা করবে। অতঃপর সে তার বিধান সমূহ জানবে, যা তার আত্মা ও দেহ উভয়ের চাহিদা মিটাবে, যে দেহ ‘আলাক্ব থেকে সৃষ্টি। **তৃতীয় প্রশ্ন :** কিসের মাধ্যমে শিখবে? **জওয়াব :** সে কলমের মাধ্যমে শিখবে। এর মধ্যে যবান ও অন্যান্য মাধ্যমসমূহ শামিল রয়েছে। **চতুর্থ প্রশ্ন :** শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? **জওয়াব :** মানুষ যা জানে না

তাই শিখবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ জন্মগত ভাবেই অজ্ঞ। সে তার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ জানে না। তাই আল্লাহ তাকে অহি-র মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্যের জ্ঞান প্রেরণ করেছেন। যা তার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনার জন্য যথেষ্ট হবে। বাকী তার জৈবিক প্রয়োজনে আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টিরাজির অজানা রহস্য জানার জন্য এবং সেখান থেকে কল্যাণ আহরণের জন্য সে সর্বদা জ্ঞান-সাধনায় লিপ্ত থাকবে। আর নতুন নতুন আবিষ্কারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে সে আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত চিত্তে বলে উঠবে- 'রব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বাত্বিলান সুবহা-নাকা ফাক্বিনা আযা-বান্নার' 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোন সৃষ্টিই বৃথা নয়। সবকিছুর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ রয়েছে। বান্দাকে তা আহরণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহ এক। তিনি সকল প্রকার শরীক হ'তে পবিত্র। তৃতীয়তঃ উক্ত বিশ্বাস না থাকলে জ্ঞান-গবেষক জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবেন। এতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ জ্ঞান-গবেষণায় এবং শিক্ষা ও কর্মে যত বড়ই হৌক না কেন তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যেই থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাকে অবশ্যই সেখানে তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। অতএব যেন তাকে সেখানে গিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী না হ'তে হয়, দুনিয়াতে সে লক্ষ্যে তাকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সকল কর্মতৎপরতা নিয়োজিত রাখতে হবে।

এবারে **পঞ্চম একটি মৌলিক প্রশ্ন :** আল্লাহ মানুষকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? **জওয়াব :** 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহ্র দাসত্ব শিখানো হবে, শয়তানের দাসত্ব নয়। আর এটাই হ'ল তাওহীদে ইবাদত, যা না থাকলে কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারে না। এক্ষণে **ষষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রশ্ন :** আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও তাঁর বিধান সমূহ কোথায় পাব, যা জেনে নিয়ে পথ চলতে হবে? **জওয়াব :** তা পাওয়া যাবে পবিত্র কুরআনে। যা তিনি স্বীয়

করুণা বশে মানব জাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত গ্রন্থ হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আর-রহমান'! 'আল্লামাল কুরআন'। 'পরম করুণাময়'। 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন' *(রহমান ৫৫/১-২)*। অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের প্রতি ও বিশেষ করে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্র দয়াগুণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল তাদের জন্য 'কুরআন' প্রেরণ। কুরআন নাযিল করাই হ'ল বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। কেন? কেননা এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। কুরআনের বিধান সমূহের আনুগত্য করার অর্থই হ'ল আল্লাহ্র দাসত্ব করা। আর সেগুলি অমান্য করার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা ও শয়তানের দাসত্ব করা। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র অবাধ্যতায় মানুষ শয়তানের গোলামী করে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহ্ল ১৬/৩৬)*।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতি হ'ল ইহূদীরা এবং পথভ্রষ্ট জাতি হ'ল নাছারারা।[৫২] তাদের বিপরীতে আল্লাহ মুসলমানদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হিসাবে মানব জাতির কল্যাণে। যারা মানুষকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। যতদিন মুসলমানদের 'খেলাফত' ছিল, রাজনৈতিকভাবে জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল, শিক্ষা-দীক্ষা কুরআনী লক্ষ্যে পরিচালিত ছিল, ততদিন তারা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। পরবর্তীতে ইহূদী-নাছারাদের চক্রান্তে এবং তাদের চালান করা শয়তানী মতবাদ সমূহের লোভনীয় ফাঁদে পা দিয়ে মুসলমানরা নিজেদের হাতে নিজেদের 'খেলাফত' ধ্বংস করে। ফলে তাদের বিশ্ব নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিনায়কত্ব তাদের শত্রুদের হাতে চলে যায়। ইসলামী বিশ্ব বর্তমানে ৫৬টি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, তাদের লেখাপড়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই আল্লাহ্র শত্রুদের পাতানো জালে আটকা পড়েছে। আর সেকারণেই সাবেক বৃটিশ রাজত্বভুক্ত বর্তমানে বাহ্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও

৫২. আহমাদ হা/১৯৪০০; তিরমিযী হা/২৯৫৪।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা সবই চলছে বৃটিশ নীতি ও আদর্শের অনুসরণে। তারা এদেশে তাদের বশংবদ একদল শিক্ষিত লোক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৮৩৫ সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল সেখানে তারা বলেছিল, We must at Present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern: a class of persons, Indians in blood and colour, but English in tastes, opinions, in morals and in intellect. 'আমরা বর্তমানে অবশ্যই আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করব এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা আমাদের ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ প্রজাসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যাতা হিসাবে কাজ করবে। যারা রক্তে ও রংয়ে ভারতীয় হবে। কিন্তু রুচিতে, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

এ লক্ষ্যে তারা 'সাধারণ শিক্ষা' ও 'ধর্মীয় শিক্ষা' নামে প্রথমে শিক্ষাকে দু'ভাগ করে। সাধারণ শিক্ষাকে তারা পুরোপুরি সেক্যুলার অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ করে ঢেলে সাজায়। এতে তাদের চিন্তা-চেতনায় এমনকি চেহারা ও পোষাকেও আমূল পরিবর্তন আসে। ইসলামের নাম নেওয়া এমনকি নিজেদের 'মুসলিম' পরিচয়কেও তারা 'সংকীর্ণতা' বলে ভাবতে থাকে। এই অবস্থা আজও অব্যাহত রয়েছে। তারপর ধর্মীয় শিক্ষিতরা যাতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হ'তে না পারে সেজন্য মাদরাসা শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করে।একটা সরকারী সিলেবাসভুক্ত ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত আলিয়া মাদরাসা এবং আরেকটি জনগণের স্বেচ্ছাকৃত দানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কওমী বা খারেজী মাদরাসা। জনগণের সরাসরি অনুদানে প্রতিষ্ঠিত ও তাদের সরাসরি তদারকিতে পরিচালিত হওয়ায় এখানে লেখাপড়া তুলনামূলকভাবে ভাল হ'তে থাকে। যদিও এসব মাদরাসার ডিগ্রীর কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। ফলে তাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয় আলিয়া শিক্ষিতদের। এভাবে একই পিতার তিনটি ছেলে তিনমুখী হয়ে পড়ে, যা মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে ত্রিধাবিভক্ত করে এবং তা ইংরেজদের উদ্দেশ্য হাছিলে সহায়ক হয়। এই বিভক্তিকে হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করে দেওয়ার জন্য তারা মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে কুরআন ও হাদীছকে গৌণ রেখে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের ফিক্বহকে মুখ্য পাঠ্য

করে দেয়। যার এমন কোন পৃষ্ঠা সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে না, যেখানে একই বিষয়ে একই মাযহাবের বিদ্বান গণের মধ্যে রয়েছে মতভেদের ছড়াছড়ি। রয়েছে অন্য মাযহাবের উপর নিজ মাযহাবের প্রাধান্য রক্ষার প্রানান্ত চেষ্টা। ছাত্রদের তরুণ মনে এগুলি দারুন প্রভাব বিস্তার করে এবং ইসলামকে তারা একটি ঝগড়ার ধর্ম বলে ভাবতে থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মহব্বত, ভালোবাসা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা তাদের মধ্যে লোপ পেতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আপোষে বাহাছ-মোনাযারায় তারা লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ বেনিয়ারা ও তাদের দোসররা দূর থেকে এগুলি দেখে মুখ চেপে হাসতে থাকে। এভাবেই মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা অধর্মীয় লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আজ বৃটিশ চলে গেলেও তাদের শিক্ষানীতি পূর্বের ন্যায় বহাল আছে; বরং অতি আধুনিক হ'তে গিয়ে মাদরাসাগুলি থেকে ক্রমেই ইসলামী রূহ চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে অতি সেক্যুলার হ'তে গিয়ে কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষিতরা না ঘরকা না ঘাটকা হিসাবে গড়ে উঠছে।

আদর্শ ও লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুর্দশা ঘুচানোর সরকারী কোন প্রচেষ্টা বিগত ৬২ বছরেও লক্ষ্য করা যায়নি। রাজনীতিকরা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান এবং অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় শিক্ষা সেক্টরেও তারা অন্যের বা তাদের নিজস্ব আনাড়ী চিন্তা চাপিয়ে দিতে চান। যা বাস্তবায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কথায় বলে, পেঁয়াজ খেলে পেঁয়াজের ঢেকুর ওঠে। ফলে সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিতরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে যখন শিক্ষানীতি ঢেলে সাজাতে যায়, তখন পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই তারা দুর্গন্ধময় করে তোলে। বর্তমানের প্রতারণাপূর্ণ ও বিদেশ-নির্ভর রাজনীতি থেকে যতদিন জাতি মুখ না ফিরাবে, ততদিন এ অবস্থার নিরসন হবে বলে মনে হয় না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক বিষয় হ'ল দু'টি : এক- শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ দুই- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব হ'ল : (১) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমন্বিত সিলেবাস রেখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা নামে

বিভিন্ন মৌলিক বিভাগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গিয়ে বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যবহারিক সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা স্তরে কমপক্ষে ২০০ নম্বরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। (২) বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন করতে হবে। সরকার প্রশাসনিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হ'লে এবং অন্যান্য কোন বড় ক্ষতির কারণ দেখা দিলে চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকার অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সকলপ্রকার রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের সময় মেধা ও যোগ্যতা নিরূপনের জন্য সর্বস্তরে উচ্চতর শ্রেণী দেখার সাথে সাথে তাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের আক্বীদা, আখলাক ও দেশপ্রেম যাচাই করতে হবে। (৩) বর্তমানের সহশিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পৃথক ক্যাম্পাস ও ভৌত কাঠামো সম্ভব না হ'লে একই ক্যাম্পাসে পৃথক সময় ভাগ করে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৪) ইসলাম বিরোধী ও আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত রাখতে হবে। (৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও পাঠমুখী পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক। তাতে গাইড বুক, সাজেশন ও নকল প্রবণতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ*।[৫৩]

বর্ষশেষের নিবেদন :

আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে 'আত-তাহরীক' অত্র সংখ্যার মাধ্যমে তার যাত্রাপথে দীর্ঘ এক যুগ পূর্ণ করল। *আলহামদুলিল্লাহ*। মাঝে ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৮-এর আগষ্ট পর্যন্ত ৩ বছর ৭ মাস যে বিপদ সংকুল পরিবেশে 'আত-তাহরীক' পথ চলেছে, তা আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ব্যতীত

---

৫৩. ১২তম বর্ষ, ১১ তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০০৯।
এ বিষয়ে পাঠ করুন : প্রবন্ধ 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ' আত-তাহরীক ৭/৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৪ এবং ঐ, 'ইসলামী শিক্ষা' ১৮/৯ সংখ্যা, জুন ২০১৫।

সম্ভব ছিল না। ভিতরের ষড়যন্ত্র ও বাইরে সরকারী নির্যাতন ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে 'আত-তাহরীক' তার আদর্শ ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে একটি সংখ্যাও বন্ধ না হয়ে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, সেজন্য আমরা প্রথমে আল্লাহ্র প্রতি হৃদয়ভরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অতঃপর 'আত-তাহরীক'-এর সাহসী সম্পাদকীয় বিভাগ, দরদী পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের খুলূছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন![৫৪]

১৬. শিক্ষার মান

একটি বেসরকারী সংস্থার হিসাব মতে এবারে পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৭৫ জন বাংলা লিখতে জানে না'। ইংরেজী ও গণিতের অবস্থা আরও করুণ। বলা হয়েছে, গত বছর ইন্টারমিডিয়েট থেকে উত্তীর্ণ জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ৮০ শতাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি। এগুলো সেই সময়কার টাটকা হিসাব যখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ পাওয়ায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহা উল্লসিত। নিঃসন্দেহে অন্যেরাও উদ্বেলিত। কিন্তু ভুক্তভোগীদের নিকট এগুলি দুঃসংবাদ মাত্র। কারণগুলির কিছু কিছু তুলে ধরা হ'ল।- (১) বোর্ড কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে পরীক্ষকদের অধিক নম্বর দিতে উদ্বুদ্ধ করা (২) অল্প সময়ের মধ্যে অধিক খাতা মূল্যায়নে বাধ্য হওয়া (৩) দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য শিক্ষকদের পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া (৪) হাতের লেখার সৌন্দর্য ও বানান ভুলের জন্য নম্বর কর্তনের বিধান না থাকা (৫) ছাত্র-ছাত্রীদের ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের প্রতি অধিক যোর দেওয়া (৬) মোবাইলের মাধ্যমে এবং এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা ও নকল সরবরাহ করা। এমনকি বই দেখে লেখা (৭) ব্যাকরণ শিক্ষা ও ভাষাগত ভিত মযবুত করার চাইতে কথিত সৃজনশীল পদ্ধতি ও এমসিকিউ পদ্ধতির প্রতি অধিক যোর দেওয়া। (৮) ক্লাসে ও প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের বাড়তি কোন সুযোগ না থাকা (৯) বিশাল সিলেবাসের বোঝা, ঘন ঘন পরীক্ষা

৫৪. ১২তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯।

নেওয়া, বিষয়ভিত্তিক কোচিং করানো ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক মেধা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে শিক্ষার্থী হওয়ার বদলে পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করা। (১০) শিক্ষকদের মধ্যে মানুষ গড়ার কারিগর হবার বদলে স্রেফ চাকুরী ও অর্থোপার্জনের মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া (১০) ঘুষ, ডোনেশন ও দলীয় বিবেচনায় ডিগ্রীসর্বস্ব অযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া (১১) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কের বদলে 'বন্ধু' ও 'ভাই' সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি অতি উৎসাহ প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে অন্যান্যদের চাইতে ডাক্তার ও প্রকৌশলীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। যা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ এরাই সমাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ এবং সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন পেশাজীবী। এজন্য (১) সবচেয়ে বড় দায়ী হ'ল সরকার। কেননা বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রত্যেক পেশার জন্য পৃথক না করে কলেজ-মাদরাসা-ডাক্তার সবার জন্য একই ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরী করা। স্বাভাবিকভাবেই এতে অংশগ্রহণে তারা অনীহাবোধ করে এবং অংশ নিলেও ফেল করে। (২) চাকুরী ক্ষেত্রে উৎকট দলীয়করণ, অন্যায় পোস্টিং ও ট্রান্সফারের খড়গ, প্রয়োজনীয় সুবিধাদি থেকে বঞ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি অন্যদের সমান গণ্য করে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত হওয়ায় তাদেরকে সর্বদা হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। (৩) উচ্চতর ডিগ্রী ব্যতীত এমবিবিএস ডাক্তারদের মূল্যায়ন না করা, উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে সিনিয়র প্রফেসরদের অঘোষিত বাধা সৃষ্টি ও ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করিয়ে দেওয়া। এক বিষয়ে ফেল করলে পুনরায় নতুনভাবে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া এবং দলাদলির অভিশাপ ছাড়াও নানারূপ বাধা তাদেরকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রতি সিনিয়র প্রফেসরদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও নোংরা ব্যবহার ভুক্তভোগীদের নিকট অত্যন্ত অমর্যাদাকর হিসাবে গণ্য হয় (৪) মেডিকেলের অধিকাংশ উচ্চতর প্রশিক্ষণ ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় মফস্বল শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ডিগ্রী হাছিল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে (৫) বিদেশে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চ বেতন ও মর্যাদা তাদেরকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেশত্যাগে বাধ্য করে। ফলে জাতি তাদের মূল্যবান সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। (৬) নকল বা নিম্নমানের ঔষধ কোম্পানীগুলি বিভিন্ন গিফট ও ঘুষ দিয়ে ডাক্তারদের অধিক দামে বাজে কিংবা অপ্রয়োজনীয় ঔষধ

লিখতে প্রলুব্ধ করে। পক্ষান্তরে সরকারী দলের ক্যাডারদের চাপে বা উচ্চতর তদবীরে ডাক্তারদের অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় রিপোর্ট লিখতে এমনকি তাদেরকে পেশা বহির্ভূত কাজে বাধ্য করা হয়। না করলে ট্রান্সফার-ওএসডি, পদাবনতি ইত্যাদির হুমকি প্রভৃতি বিষয়গুলি সৎ ও মেধাবী ডাক্তারদের সর্বদা সরকারী চাকরীতে নিরুৎসাহিত করে। (৭) ট্রান্সফার ও পদোন্নতির জন্য এমনকি পরীক্ষায় পাস করার জন্য সরকার দলীয় ছাত্রনেতা বা শিক্ষক নেতাদের কাছে তদবীর করা অত্যন্ত অমর্যাদাকর হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবতা তাদেরকে অনেক সময় বাধ্য করে। যা তাদেরকে অত্র পেশায় নিরুৎসাহিত করে (৮) পাবলিক মেডিকেলে সুযোগ না পেয়ে বহু টাকার বিনিময়ে বেসরকারী মেডিকেল থেকে ডিগ্রী অর্জনকারীদের মর্যাদা সমান গণ্য করায় মেধাবীরা এ পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে ডাক্তারীর মত সেবামূলক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় ক্রমেই মানহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৯) বহু বছরের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের উচ্চতর ডিগ্রী না থাকায় তাদেরকে আজীবন জুনিয়র করে রাখা অত্যন্ত অমানবিক বিষয়। তাদেরকে সংক্ষিপ্ত কোর্স করে উচ্চতর ডিগ্রী দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করায় তারা হীনমন্যতায় ভোগেন। (১০) হাসপাতালগুলিতে মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা ডাক্তারদের অগ্রাধিকার না দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য সমান গণ্য করায় মেধাবী ভদ্র ও পর্দানশীন মহিলা ডাক্তারগণ এই পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে সেসব স্থান দখল করে অযোগ্য ও মানহীন ডাক্তাররা।

এবারে আসা যাক মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে। এটা সবাই জানেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ কোন সরকারই ইসলামী শিক্ষার প্রতি আন্তরিক নয়। তারা যা কিছু করেন, কেবল ভোটের স্বার্থে করেন। বৃটিশ সরকার যেভাবে ওল্ডস্কীম-নিউস্কীম ও আলিয়া নেছাব সৃষ্টি করে ইসলামী শিক্ষার গলা টিপে ধরেছিল, স্বাধীন দেশের মুসলিম সরকারগুলি তার চেয়ে নিকৃষ্টভাবে এটা করে যাচ্ছে। কোন কোন মন্ত্রী মাদরাসাগুলিকে জঙ্গী প্রজনন ক্ষেত্র বলছেন নির্লজ্জভাবে। আলিয়া মাদরাসা শিক্ষকদের জাতীয় সংগঠন জমিয়তুল মুদাররেছীন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ সরকার মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি করেছেন। তাদের দাবীকৃত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস করেছেন। প্রথমতঃ এর মাধ্যমে সরকার তাদের মুখ

বন্ধ করেছে। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় যে কেমন সোনার পাথরবাটি, তা আজও কেউ জানতে না পারলেও ফাযেল-কামিল ডিগ্রীগুলি অনার্স ও মাস্টার্সের মান পাবে বলা হয়েছে। তাদের জন্য মুফতী, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, প্রধান মুহাদ্দিছ-এর মত অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পদ সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা ঐসব লকবের সাথে অত্যন্ত অমর্যাদাকর। কাউকে ধ্বংস করতে গেলে তাকে প্রথমে মাথায় তুলে পরে ছুঁড়ে ফেলতে হয়। আলিয়ার শিক্ষকদের সাথে সেটাই করা হচ্ছে। সিলেবাসে ২০০ নম্বরের ইংরেজী ও অন্যান্য বস্তুগত বিষয় চাপিয়ে দিয়ে একে অত্যন্ত কঠিন করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ছাত্র ফেল করবে এবং একসময় ছাত্রবিহনে মাদ্রাসাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে বেতনের টোপ গিলিয়ে সরকার এখন কওমী শিক্ষকদের পিছনে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদেরকে দু'ভাগ করা হয়ে গেছে। বাকীটা সত্বর হবে। অবশেষে এরাও টোপ গিলবেন। অতঃপর এদের হাত দিয়েই ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের বাকী কাজটি সারা হবে। ইতিমধ্যেই ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও অনেকটা কেবল ডিগ্রীধারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। মেধা, যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্রের ছোঁয়া সেখানে নেই বললেও চলে। এমনকি বাহ্যিক দাড়ি-টুপী-পোষাক ও চাল-চলনের পার্থক্যটুকুও প্রায় ঘুচে যেতে বসেছে।

দূরীকরণের উপায় : এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা সরকারের নিকট কতগুলি পরামর্শ পেশ করেছি। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান বিষয়টি পুনরায় পেশ করছি। আর তা হ'ল (১) শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে এবং সরকারকে কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে (২) বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে (৩) ডিগ্রীকে সাধারণ মান রেখে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন-ভাতার মান নির্ধারণ করতে হবে (৪) পেশা ভিত্তিক পৃথক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে (৫) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিচার বিভাগে যাবতীয় রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধ করতে হবে। সাথে সাথে এসবের প্রশাসনিক কাঠামোকে সরকারী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৫৫]

---

৫৫. ১৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৪। এই সাথে দ্রঃ প্রবন্ধ 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ' (মোট ১১টি), আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী'০৪ সংখ্যা।

জাতীয় ইস্যু

১৭. আমরা শোকাহত, স্তম্ভিত, শংকিত

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় ২৫শে ফেব্রুয়ারী'০৯-এর শুভ্র সকালে বিডিআর সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের আনন্দঘন পরিবেশে শীর্ষস্থানীয় সেনা ও বিডিআর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হঠাৎ এ কি ঘটল? কই প্রথমদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দরবার হলে বিডিআর সপ্তাহের উদ্বোধন করেন, তখন তো তাদের দাবী-দাওয়ার বিষয়ে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি। তাহ'লে পরের দিন কোনরূপ উস্কানী ছাড়াই হঠাৎ কেন গুলীর শব্দ? বক্তৃতা শেষ হ'তে না হ'তেই কেন লুটিয়ে পড়ল বিডিআর মহাপরিচালকের রক্তাক্ত দেহ? নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গুলী এখানে কিভাবে এল? তা-ও একটা দু'টা নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী, আর পাখির মত পড়তে থাকল একের পর এক নিরস্ত্র সেনা কর্মকর্তাদের লাশ। শুধু মেরেই ক্ষান্ত নয়, লাশ টুকরা টুকরা করা, আগুন দিয়ে পোড়ানো, একাধিক বড় বড় গর্ত খুঁড়ে গণকবর দেওয়া, কর্মকর্তাদের অফিস ও বাড়ীতে গিয়ে লুটপাট ও তছনছ করা, তাদের গাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া, মহাপরিচালকের স্ত্রী নাজনীনকে তার কক্ষে হত্যা করে সিঁড়ি দিয়ে তার রক্তাক্ত লাশ নিষ্ঠুরভাবে টেনে এনে গণকবরে পুঁতে দেওয়া ইত্যাকার লোমহর্ষক ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ৩৩ ঘন্টা ধরে একটানা চলল। অথচ খোদ ঢাকাবাসীই কিছু জানলো না। হ্যাঁ জানলো ঝিকাতলার হাড়-হাড্ডিসার বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা, যে প্রচণ্ড হাঁপানীতে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় নিজ রিকশা নিয়ে যাচ্ছিল দোকানে ঔষধ আনতে। বিডিআর তাকে হত্যা করে রক্তের নেশা মিটালো। জানলো আজিমপুরের কোমলমতি বালক যে স্কুলে যাচ্ছিল বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ আশার আলো হিসাবে। বিডিআরের গুলী তার আলো নিভিয়ে দিল। জানলো গ্রাম থেকে আসা সেনাকর্মকর্তার অতিথি, বিডিআরের গুলী যার আতিথ্যের স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিল। বিডিআরের বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে কিছু লোক মিছিল করল পিলখানার সামনের রাস্তায়। কিছু পত্রিকা ও মিডিয়া চ্যানেলে তাদের দাবী-দাওয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হ'ল। অথচ ভিতরের নারকীয় ঘটনা জানলো না কেউ। কিন্তু কেন? এখানেই জমেছে একরাশ প্রশ্ন..।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়েই[৫৬] বলেছেন এর পিছনে রয়েছে বহিঃশক্তির রাষ্ট্রবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান ও বর্তমানে মহাজোট নেতা জেনারেল এরশাদও একই কথা বলেছেন। যদি তাই হয়, তাহ'লে তারা কেন শুরুতেই হস্তক্ষেপ করলেন না? চেইন অব কম্যাণ্ড ভেঙ্গে যেখানে একবার গুলী চলেছে, খোদ মহাপরিচালক নিহত হয়েছেন, যেখানে বৃষ্টির মত গুলী চলছে, সেখানে দীর্ঘমেয়াদী আলোচনার কোন সুযোগ থাকে কি? পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল নিহত হওয়ার আগে অবস্থা আঁচ করে প্রথমে ফোন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। ফোন করেছিলেন আর্মি হেড কোয়ার্টারে। উদ্ধার পাওয়া সেনা কর্মকর্তা মেজর যায়েদী সেকথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। সকলেই তখন বলেছিলেন, আমরা আসছি। কিন্তু কেউ আসেননি। সেনাবাহিনী ও বিডিআর বাহিনীর ভিতরকার দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ ও গুমোট অবস্থা গোয়েন্দা সংস্থা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারোরই অজানা থাকার কথা নয়। অথচ তারা কেউই তাৎক্ষণিক কোন ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হননি। অতএব তাদের কারুরই এখানে কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ নেই। এখন তো এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, প্রশাসনের ত্বরিৎ পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণেই সেনা কম্যাণ্ডের চৌকস ও ফ্রন্ট লাইন বিশেষজ্ঞ এইসব সেনা কর্মকর্তাদের জীবন দিতে হয়েছে নিতান্ত অসহায় ভাবে। সেনা অ্যাকশনের অনুমতি দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরের দিন বিকালে। এটা যদি তিনি আগের দিন ঘটনার পর পরই দিতেন এবং কেবল সাঁজোয়া গাড়ীর চলাচল ও সেনা হেলিকপ্টার উপরে চক্কর দিত তাহলেই ভয়ে বিডিআর বাহিনী আত্মসমর্পণ করত। সাবেক সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলীর মতে ১৫ মিনিটেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে কারা তখন বাধা দিয়েছিল বন্ধুর বেশে, তাদের চিহ্নিত করা দরকার।

ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার বলেছেন, 'প্রতিবেশীদের সাথে সহযোগিতা না থাকলে কোন রাষ্ট্রই নিরাপদ নয়'। এ কথার ইঙ্গিত কি ভারতের দিকে নয়?

৫৬. শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া।

Contents

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকট মুকাবিলায় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। কে না জানে মার্কিন-ভারত ও ইসরাঈল এখন একই লবীর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রবাদ আছে যে, আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের আর কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না। তারা বাংলাদেশকে তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। ভারত বাংলাদেশে পিস মিশনের নামে তাদের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে চাচ্ছে। তারা প্রতিদিন সীমান্তে আমাদের নিরীহ মানুষগুলিকে আগের মতই হত্যা করে চলেছে। আর ইতিমধ্যেই তারা সীমান্তে ভারী অস্ত্রশস্ত্র জমা করেছে, সেনাশক্তি বাড়িয়েছে এবং ব্ল্যাক ক্যাট অর্থাৎ কালো বিড়ালের মুখোশধারী ভয়ংকর কম্যাণ্ডো বাহিনী মোতায়েন করেছে। এক্ষণে যদি কোন দুর্মুখ একথা বলেন যে, বিগত আওয়ামী সরকারের সময় ২০০১ সালের ১৭-১৮ এপ্রিলে কুড়িগ্রামের রৌমারি সীমান্তে এবং সিলেটের পাদুয়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-দের সংঘবদ্ধ চোরা হামলার মোকাবিলায় বিডিআরের দুঃসাহসিক অভিযানে বহু লাশ ফেলে পালিয়ে যাওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী বর্তমান সরকারের আমলে পিলখানা ট্রাজেডীর মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নিল, তাহ'লে সেকথার জওয়াব কি দেওয়া যাবে? যে কথার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বি-রমনের গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর লেখায় পাওয়া গেছে।

এদেশের সাথে কাদের স্বার্থ বেশী জড়িত? '৪৭-এর স্বাধীনতার সময় নেহেরু বলেছিলেন, অনধিক ২০ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান পুনরায় ভারতভুক্ত হবে। ২৪ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়েছে। এখন দুর্বল দুই টুকরাকে গিলে ফেলার পালা। দুর্বলকে দুর্বলতর করার জন্য তারা বাংলাদেশের উজানে সকল নদীতে বাঁধ দিয়েছে। এ দেশকে তারা মরুভূমি বানিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন করেছে। চোরাচালান ও পাহাড় প্রমাণ অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত সফল হতে চলেছে। বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দক্ষিণ তালপট্টি তারা দখল করে রেখেছে। ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মাধ্যমে নিজেরা বেরুবাড়ী নিলেও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা আজও তারা বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত

করেনি।[৫৭] সীমান্তে দৈনিক তারা গড়ে একজন করে নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করছে। তারা সীমান্তে ফেন্সিডিল কারখানা তৈরী করে এদেশে সাপ্লাই দিয়ে এদেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর অতি সাম্প্রতিক তথ্য মতে ভারত ও আমেরিকা একযোগে কাজ করছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে টুকরো টুকরো করে ২০২০ সালের মধ্যে ইউনাইটেড স্টেট্স অব ইন্ডিয়া (USI) গঠন করার জন্য। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এটা জানা কথা যে, বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিগুলিই এদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ও জানবায অকুতোভয় শক্তি। তাই বাংলাদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র বানাবার জন্য বহিঃশক্তির মদদে এদেশে সৃষ্টি করা হয়েছে তথাকথিত জঙ্গী দলসমূহ। তাদেরই প্রত্যক্ষ মদদে সৃষ্টি হয়েছিল খুলনা-যশোর অঞ্চলে কথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'স্বাধীন জুমল্যাণ্ড' আন্দোলন। যাদের সশস্ত্র শাখা তথাকথিত 'শান্তি বাহিনী'র হাতে প্রায় ৩০ হাযার মানুষ নিহত হয়েছে। বিচার কিছুই হয়নি। এদেরই সরাসরি প্রশিক্ষণে স্বাধীনতার পর দেশে গড়ে তোলা হয় 'রক্ষীবাহিনী'। যাদের হাতে খুন হয় প্রায় ৪২ হাযার মানুষ। কোন বিচার হয়নি। সেনাবাহিনী সদস্যগণের অধিকাংশ ধর্মভীরু ও দেশপ্রেমিক। তাই আমাদের সেনাবাহিনীকে তারা কখনোই পসন্দ করেনি। গত ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার সুভাষ ইনস্টিটিউটে এদের বশংবদ বাংলাদেশের কথিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের একটি অঙ্গ সংস্থার ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম ও সেনাবাহিনীকে উৎখাত করার জন্য ভারত সহ আন্তর্জাতিক শক্তি সমূহের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদেশীদের নগদ স্বার্থ কি? প্রথমে ভারতের স্বার্থ হ'ল বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রেন চালানো ও এদেশকে তাদের ব্যবসায়ের রুট হিসাবে ব্যবহার করা। মার্কিনীদের স্বার্থ হ'ল চট্রগ্রামে সামরিক ঘাঁটি করা ও চীনকে ভয় দেখানো। অথচ দু'টিই বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিকূলে। বাংলাদেশের কোন সরকারই এযাবত ভারত বা মার্কিনের এসব অযৌক্তিক

---

৫৭. গত ৩১শে জুলাই'১৫ থেকে এটি ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

দাবী মেনে নেয়নি। আর তাই বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য ও তাদের দাবীর সামনে মাথা নত করানোর জন্য দেশের প্রধানতম শক্তি সুশৃংখল সেনাবাহিনী ও বিডিআর বাহিনীকে দুর্বল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। দেশের ভিতরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মার্কিন-ভারতের চরেরা কাজ করছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল পিলখানা ট্রাজেডীর মাত্র চার ঘন্টার মাথায় দিল্লী টিভির বেলা ২ টার সংবাদে ঢাকায় বিডিআর বিদ্রোহে মেজর জেনারেল শাকিল সহ ১৫ জন সেনা কর্মকর্তার নিহত হবার খবর নিশ্চিত করে বলা। অথচ বাংলাদেশের কোন মিডিয়া এ সম্পর্কে তখন কোন তথ্য দিতে পারেনি।

এযাবত পাওয়া তথ্য মতে মাত্র ৪০ জন সেনা কর্মকর্তা জীবিত ফিরে এসেছেন। নিহত ও নিখোঁজ হয়েছেন বাকীরা। সকল মহল থেকে হত্যাকারী বিডিআর সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী উঠেছে। আমরাও সে দাবী করছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, উপস্থিত জওয়ানদের মাত্র কিছু সংখ্যক বিপথগামীদের হাতে অথবা মুখোশধারী বহিরাগতদের হাতে এই ট্রাজেডী ঘটেছে। অনেক বিডিআর জওয়ান সেনা কর্মকর্তাদের জীবন বাঁচিয়েছেন। অতএব গুটি কয়েক দুস্কৃতিকারীর জন্য ৭০ হাযারের বিশাল বাহিনীকে সেনাবাহিনীর শত্রু বানানো যাবে না। একজন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে, বিপথগামীদের মধ্যে আগেই কোটি কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। তাছাড়া সেখানে এমন কিছু অস্ত্র ও দূরবীন পাওয়া গেছে, যা বিডিআরের নয়। অতএব ঢালাওভাবে সকল বিডিআর জওয়ানকে দায়ী করা যাবে না। বরং এ বর্বরতার নেপথ্য শক্তি ও মূল ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

দলবাজি রাজনীতির কারণে বিগত ৬১ বছরের ইতিহাসে বড় কোন ট্রাজেডীতে কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। এবারও যেন তা না হয়, সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। সরকার পাঁচ বছরের জন্য। কিন্তু সেনাবাহিনী স্থায়ী। এবারের এই ট্রাজেডীর কারণে ১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের ন্যায় সেনাবাহিনী আবারও অর্জন করেছে জনগণের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। সেনা ও জনতার এই অটুট ভালোবাসা কুচক্রীদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

বিগত দিনে দেশের অন্তত দু'জন জাঁদরেল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন, বাংলাদেশে কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেননা ভারত একটি বিরাট দেশ। তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই'। এরা এখনও প্রকাশ্যে রাজনীতি করেন ও বড় দেশপ্রেমিক বলে দাবী করেন। এদের চিনতে সরকারের ভুল করা উচিত নয়। আমরা সরকারকে বলব, এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হল 'ইসলাম'। অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হবার কারণেই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সাথে যোগ দিয়ে ভারত থেকে স্বাধীন হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রজাদের রক্ত শোষণকারী অত্যাচারী জমিদাররা সেদিন তাদের জমিদারী হারাবার ভয়ে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চাননি। এমনকি তারা বৃটিশের প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও বিরোধিতা করেছিলেন। যাতে পূর্ববঙ্গের লোকেরা শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন না হ'তে পারে। তারা সেদিন বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন করেছিলেন। বাংলা মায়ের অঙ্গ ছেদনের ধুয়া তুলে তারা সেদিন উভয় বাংলাকে এক করার সংগ্রাম করেছিলেন ও গান রচনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য ঠাকুর কবির সেই গানই আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। যা তৈরী হয়েছিল দুই বাংলাকে একবঙ্গে পরিণত করার জন্য। আজও তাদের এদেশী চরেরা এপার বাংলা ওপার বাংলার মিলনের ধুয়া তোলে। আর কথায় কথায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী বাঙালী করে মুখে ফেনা তোলে। এরা দেশে শক্তিশালী সেনাবাহিনী চায়না। দেশের শান্তি ও উন্নতি চায়না। এদের টকশো, সেমিনারবাজি আর সোচ্চার বুলি কপচানোতে যেন সরকার ভুল পথে ধাবিত না হন এবং সর্বদা সঠিক পথে অগ্রসর হন, সেজন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি নিহত ভাইবোনদের ক্ষমা কর ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দাও। যে সকল মেধাবী সেনাকর্মকর্তাকে আমরা হারিয়েছি, হে আল্লাহ তুমি উত্তম কর্মকর্তা দিয়ে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হেফাযত কর- আমীন![৫৮]

৫৮. ১২তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০০৯।

১৮. আইলার আঘাতে লণ্ডভণ্ড খুলনা উপকূল

সাগর কন্যা শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ এলাকার ভাষা অনুযায়ী 'আইলা' অর্থ শুশুক, যা নদী বা সাগরের বুক চিরে হঠাৎ ওঠে আর ডোবে। ২০০৭ সালে ও ২০০৮ সালে রাত্রিতে সিডর ও নার্গিসের আঘাতের পর কয়েকমাস যেতে না যেতেই গত ২৫শে মে'০৯ দুপুর বেলায় এলো আইলার আঘাত। আইলা এসেছে খানিকটা লুকিয়ে অমাবশ্যার সাথে ১০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস নিয়ে। তেমন কোন হৈচৈ না ফেলে ক্ষতি করে গেছে প্রচুর, যা সিডর-নার্গিসকেও হার মানিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সাতক্ষীরার আশাশুনি, শ্যামনগর ও খুলনার কয়রা ও দাকোপ উপযেলা ছিল আইলার প্রধান টার্গেট ভূমি। অথচ এ অঞ্চলের মানুষ সর্বদা এসব থেকে নিরাপদ থাকে প্রধানতঃ সুন্দরবনের কারণে, যা সকল প্রকার সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে এ অঞ্চলকে দেওয়ালের মত হেফাযত করে। কিন্তু লোভী মানুষের অত্যাচারে সুন্দরবন ক্রমেই বৃক্ষশূন্য হ'তে চলেছে। ফলে নিজেরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছি। প্রশ্ন হ'লঃ এসব কি কেবলই প্রাকৃতিক দুর্যোগ? মোটেই নয়। প্রকৃতির স্রষ্টা যিনি, এসব তাঁরই ক্রোধের কষাঘাত। যাতে বান্দা সাবধান হয় এবং সৎকর্মশীল হয়ে জগতসংসারের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম'। ' জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না'? 'অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, দিনের বেলা খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না'?। 'তারা কি তাহ'লে আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় কেবল তারাই যাদের ধ্বংস আসন্ন হয়' *(আ'রাফ ৭/৯৬-৯৯)*। অতএব হে মানুষ আল্লাহভীরু হও![৫৯]

---

৫৯. ১২তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৯।

১৯. বিশ্বজিৎ ও আমরা

২৩ বছরের দর্জি শ্রমিক বিশ্বজিৎ। যাচ্ছিল তার কর্মস্থলে। হঠাৎ পড়ে যায় 'অবরোধ' বিরোধীদের রোষানলে। দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী দোতলায় এক দোকানে। গুণ্ডারা ছুটল সেখানে। ধরে এনে রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে লাঠিয়ে-কুপিয়ে হত্যা করল তাকে। অতঃপর বিজয় উল্লাস করতে করতে চলে গেল। বিশ্বজিৎ বারবার বলেছে 'আমি শিবির নই, আমি হিন্দু'। কারণ সে ভেবেছিল হিন্দুরা সরকারী দলের ভোটব্যাংক হেতু সে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বিশ্বজিৎ চলে গেল। কিন্তু সত্যিই সে বিশ্বকে জিতে নিল। সবার অন্তরে সে স্থায়ী মমতার আসন দখল করে নিল। হত্যাকারীরা সবাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী দলের ছাত্র ক্যাডার। যে পিতারা তাদের সন্তানদের মানুষ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। যারা দিন-রাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানের জন্য ঢাকায় টাকা পাঠাতেন ছেলে মানুষ হবে বলে, পরে পত্রিকায় ও টিভিতে ছেলের হন্তারক ছবি দেখে প্রত্যেকে ঘৃণায় ছি ছি করেছেন ও তাদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে হত্যাকারী শাকিলের পিতা আনছার মিয়াঁ হার্টফেল করে গত ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার সকালে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। বিশ্বজিৎ যদি মুসলমান নামের কেউ হ'ত, তাহলে নির্ঘাৎ তাকে 'শিবির' বানিয়ে ছাড়তো। যেমন চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রলীগ নেতারা বলছে যে, হত্যাকারীরা জামাত-শিবিরের ক্যাডার। তারা ছাত্রলীগের কেউ নয়। ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর লগি-বৈঠাধারীরা ঢাকায় অনুরূপ নিরীহ এক বয়স্ক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করে তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে নেচেছিল জামায়াত-শিবির মারার আনন্দে। সেই দল এখন ক্ষমতায়। অতএব কে এদের ঠেকায়।

তবে এইসব পোষা গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্বনামধন্য লেখক ফারূক ওয়াসিফের একটা সুন্দর পরামর্শ আছে। যেটা অনুসরণ করা যায়। গত ১২ই ডিসেম্বর'১২ 'প্রথম আলো'-তে তিনি লিখেছেন, ভেবেছিলাম বিনা কারণে বা বিনা বিচারে নিশ্চয়ই নিহত হব না। কিন্তু সপ্তাহ দু'য়েক আগে সেই বিশ্বাসও টলে যায়। রাত সাড়ে ১১-টায় মোহাম্মদপুরের আদাবরের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা চারজন। বাড়ির সামনে

এক চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি। হঠাৎ একটি সাদা গাড়ি থেকে চার-পাঁচজন ৪০-৪৫ বছর বয়সী লোক নেমেই লাথি-ঘুষি মারতে থাকল। তারা বলছিল, অ্যারা শিবির, শ্যাষ কইরা ফালা'। আমাদের তিনজন ছিলাম সাংবাদিক। সবাই পরিচয়পত্র দেখালাম, বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা উত্তেজিত। আগের দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম.খা. আলমগীর যুবলীগের প্রতি শিবির প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আদাবর এলাকায় এই গ্রুপটি সম্ভবতঃ সেই জোশেই ... টগবগ করছিল। ক্যাডার, ছিনতাইকারী আর সরকারী বাহিনীর সাথে তর্ক করলে বিপদ বাড়ে, এই হুঁশ থাকায় উচ্চবাচ্য না করে প্রহার সইলাম। ভাবছিলাম ক্যাম্পাসে শিবির প্রতিরোধ করেছি, জীবন নাশের হুমকির মুখেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। এই তার পুরস্কার! বা শিবির হলেই কি কাউকে এভাবে মারা যায়? দেশপ্রেমিক সৈনিকদের (?) ধন্যবাদ, তারা আমাদের প্রাণে মারেনি। সেদিন রাতে আমরাও বিশ্বজিৎ হয়ে যেতে পারতাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বানের এমনই তেজস্ক্রিয়তা! আমাকে প্রহৃত হয়ে আর বিশ্বজিৎকে ছিন্নভিন্ন হয়ে সেই তেজের শিকার হ'তে হয়। তারপরও তিনি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত'।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আব্দুল মান্নান ১৩ই ডিসেম্বর'১২ একই পত্রিকায় 'রাজনৈতিক বর্বরতা' শিরোনামে লিখেছেন, শিবিরের উত্থান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর তারা ছাত্রদলের আব্দুল হামীদের হাতের কব্জিসহ কেটে নিয়ে কিরিচের মাথায় গেঁথে সারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে তাদের হিংস্রতার মাত্রা জানান দেয়। জাতীয়তাবাদী শিক্ষক নেতা ডঃ এনামুল হকের ছেলে ছাত্রদল কর্মী মূসাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ছাত্রদলের চবি সভাপতি হেলালীকে ১০জনে মিলে টেবিলের উপর চেপে ধরে দু'জনে তার চোখ উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। এমন সময় প্রক্টরের হস্তক্ষেপে সে রক্ষা পায়। চট্টগ্রাম পলিটেকনিকের ছাত্রদল কর্মী যমীর ও জসীমকে জবাই ও গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে শিবিরকর্মীরা'।

দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র রাজনীতির নৃশংসতার খতিয়ান যদি এভাবে পেশ করা হয়, তাহলে তা সহজে শেষ হবে না। আসিফ নজরুল ১৫ই ডিসেম্বর'১২ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'পশু বানানোর কারখানা' শিরোনাম দিয়ে লিখেছেন, কি অসাধারণ রাষ্ট্র! কি অসাধারণ রাজনীতি! এই রাজনীতি হলে সীট পেতে ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল করতে শেখায়। সীট অব্যাহত রাখতে জোর করে

মিছিলে গিয়ে দুই নেত্রীর বন্দনা করতে শেখায়। চাকরী-ব্যবসা পেতে হলে বা বড় নেতা হতে হ'লে লুটেরা বা খুনী হতে শেখায়। এই রাজনীতি ক্লাসরুম বাদ দিয়ে রাজপথ শেখায়, বই বাদ দিয়ে দরপত্র পড়া শেখায়, ... মানুষ নয়, পশু বানানোর দীক্ষা দেয়'। ... 'আমাদের কেউ কেউ বোকার মতোই হয়ত ভাবি, এই পোড়া দেশে কখন আসবে সুদিন! এই দেশেই এসেছিল বাহান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর আর নব্বই! আমরা ... বলি। আছে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের ভয় আর শিবিরের তাণ্ডব। আছে জেল-যুলুমের হুমকি, গুম হওয়ার শীতল আতংক! আছে বিশ্বজিতের নির্বোধ আকুতির মুখচ্ছবি। তবু আমরা হারব না'! তাঁর এই মহতী আশা নিয়ে সবাই বেঁচে থাকে। তাইতো তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বজিৎ হত্যাকারীদেরও একদিন সুদিন আসবে। তারা তো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই রাজপথে শিবির প্রতিরোধে নেমেছিলেন। বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুলের নির্দেশে তো সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনাবাহী গাড়ী ভাংচুর করতে যায়নি! মির্জা ফখরুল সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন। ৩৭টি মামলায় আসামী হয়েছেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বিশ্বজিৎ হত্যাকারীদের অন্তত এতটা ভোগান্তি সইতে হবে না। বিরোধী দলের মহাসচিবের চেয়ে নিজ দলের খুনীদের মর্যাদা এখনো বেশী আছে এই রাষ্ট্রে। ভবিষ্যতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে হয়ত একই রকম ঘটনা ঘটবে'।

হ্যাঁ, বিএনপি-জামায়াতের গণতন্ত্রের নমুনা আমরা দেখেছি ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারীতে। নিজেদের কালো চেহারা ঢাকতে গিয়ে আমাদের উপর জঙ্গী অপবাদ চাপিয়ে রাতের অন্ধকারে বাসা থেকে গ্রেফতার করেছিল। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ৬টি যেলায় খুন, বিস্ফোরণ, ব্যাংক ডাকাতির মতো ১০টি মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠায়। যার ঘানি আমরা এখনো টানছি। তাদের কয়েকজন নেতা সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন ও কয়েকজন তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী অবরুদ্ধ আছেন। তাই তারা বলছেন, 'গণতন্ত্র অবরুদ্ধ রেখে সরকার বিজয় দিবসের চেতনাকে ধূলিসাৎ করেছে'।

তাহ'লে প্রশ্ন দাঁড়ায়, গণতন্ত্র অর্থ কী? বিজয় দিবসের চেতনা কী? সেটা তো বিশ্বজিৎ! গত ৯ই ডিসেম্বর'১২ বিজয়ের মাসে যার তরতাযা দেহটাকে মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে রাজপথে ফেলে গেল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী সোনার ছেলেরা। বৃটিশ চলে যাওয়ার পর থেকে বিগত ৬৫ বছর ধরে আমরা গণতন্ত্র

দেখছি। যা কখনোই দেশে স্থিতি আনেনি। যেমন কথিত 'আরব বসন্ত' আরব বিশ্বে স্থিতি আনেনি। অতএব দায়ী ঐসব ক্যাডাররা নয়, বরং দায়ী হ'ল সিস্টেম। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের আগ্রাসী সিস্টেম। এখান থেকে বেরিয়ে আসার সাহস আমাদের আছে কি?

বিশ্বজিৎ হৌক আর জামাত-শিবির হৌক প্রত্যেকে এদেশের নাগরিক। তাদের নাগরিক অধিকার অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। যদি এগুলো সরকারের পেটুয়া বাহিনী দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হয়, তাহলে মিথ্যা এ স্বাধীনতা, মিথ্যা সব চেতনার বুলি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো ছিল একটাই। যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের স্বভাবগত প্রতিরোধের চেতনা। পাকিস্তানী শাসকরা যদি যুলুম না করত, আর ভারত সরকার যদি এই ধূমায়িত ক্ষোভকে কাজে না লাগাতো এবং রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেমে না পড়ত, তাহলে ইতিহাসটা কেমন হ'ত? যখন বর্বর টিক্কা খান হুংকার দিয়েছিল 'আদমী নেহী, মেট্টি চাহিয়ে' (মানুষ নয়, মাটি চাই), আর নিরীহ মানুষের উপর সমানে গুলি চালাচ্ছিল, তখন মানুষ যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। কারু আহ্বানে বা ঘোষণায় তারা যুদ্ধে নামেনি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। অথচ যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের এই পবিত্র চেতনাকে ছিনতাই করে নিয়ে সুবিধা লুটছে দলবাজ নেতারা। তাই তো দেখি বহু প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন, যারা ঘৃণায় মুক্তিযোদ্ধার সনদ পর্যন্ত নেননি। কিন্তু দলীয় অন্ধত্বের চাপে সত্য চেতনা-র আলো বিকশিত হ'তে পারছে কি?

প্রশ্ন হ'ল, মানুষের দীর্ঘশ্বাসের জবাব কি? এক যালেমের বিদায়ে আরেক যালেম? নমরূদের বদলে ফেরাঊন? আদৌ তা নয়। এর জবাব একটাই। মানুষকে মানুষের দাসত্ব ছেড়ে, আল্লাহ্র দাসত্ব বরণ করে নিতে হবে। তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করতে হবে। তাঁর বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাহ'লেই কেবল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে। মেজর জলিলের ন্যায় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা এই চেতনাই লালন করতেন, এখনও করেন। আমরাও সেই চেতনার বিকাশ চাই এবং আল্লাহ্র নিকটে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের হেদায়াত প্রার্থনা করি- আমীন![৬০]

---

৬০. ১৬তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৩।

Contents

২০. নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায়

নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য অনুশাসন ও শাসন দু'টিই সমভাবে প্রযোজ্য। অনুশাসন চারভাবে হ'তে পারে : (১) পিতা-মাতা ও পরিবারের অনুশাসন (২) শিক্ষক ও গুরুজনদের অনুশাসন (৩) সাংগঠনিক অনুশাসন এবং (৪) আল্লাহ ও আখেরাতভীতির অনুশাসন। যে সন্তানের ভাগ্যে এ চারটি নে'মত একসাথে জুটেছে, সে সন্তান ভাগ্যবান। সে জীবনের সর্বত্র সফলতা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত চারটি অনুশাসনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল চতুর্থটি। কেননা অন্যেরা সর্বদা সঙ্গে থাকেন না। কিন্তু আল্লাহ সর্বদা সঙ্গে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে কিছুই করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সর্বোপরি জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকবে ও অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এরপরেও যদি শয়তানী কুহকে পড়ে সে অপকর্ম করে বসে, তাহ'লে পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সে তওবা করবে এবং কড়া দুনিয়াবী শাসন তথা আল্লাহ প্রেরিত দণ্ডবিধি হাসিমুখে বরণ করে নেবে। বরং নিজে এসে ধরা দিয়ে দণ্ড চেয়ে নেবে। মাদানী রাষ্ট্রে মা'এয আসলামী ও গামেদী মহিলার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অম্লান স্মৃতি হয়ে আছে। বস্তুতঃ ইসলাম জাহেলী আরবের ছন্নছাড়া মানুষগুলির মধ্যে মূলতঃ চতুর্থ অনুশাসনটি দিয়েই পরিবর্তন এনেছিল। দণ্ডবিধি নাযিল হয়েছিল অনেক পরে মাদানী জীবনের শেষ দিকে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা জাহেলী আরবকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার কারণ অনুসন্ধান করলে সহজেই বলা যাবে যে, বর্ণিত চারটি অনুশাসনের কোনটিই যথার্থভাবে এদেশে নেই। অথচ সমাজ পরিবর্তনে এগুলির কোন বিকল্প নেই। এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, পিতা-মাতা, শিক্ষক ও গুরুজন যেসব উপদেশ দেন, তা মান্য করা অবশ্যই যরূরী হলেও তাঁরা মানুষ। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উপদেশে ও নির্দেশে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত উপদেশমালায় কোন ভুল বা ত্রুটি থাকার অবকাশ নেই। তাই সর্বদা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হেদায়াতকে সামনে রাখতে হবে ও তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে সংগঠন সেই হেদায়াতকে মেনে চলে, তাদের সাথে থাকতে হবে।

অতঃপর আমরা যদি নিম্নোক্ত উপদেশগুলি মেনে চলি, তাহ'লে নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোতধারা বন্ধ না হলেও কমে যাবে বলে আশা করি। পারিবারিক

জীবনকে নৈতিক শিক্ষার দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলুন। এজন্য নিম্নের হাদীছগুলি পরিবারের সবাইকে মুখস্ত করিয়ে দিন।-

১. ব্যক্তি জীবনে :

(ক) আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।[৬১] (গ) তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে বান্দার সচ্চরিত্রতা এবং আল্লাহ্র সবচেয়ে ক্রোধের শিকার হবে ঐ ব্যক্তি, যে অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র।[৬২]

২. পারিবারিক জীবনে :

(ক) আল্লাহ বলেন, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরে পোষাক সদৃশ' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। (খ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[৬৩] (গ) 'সন্তানের জন্য পিতার দো'আ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন'।[৬৪] (ঘ) 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত'।[৬৫] (ঙ) 'বৃদ্ধকালে পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে পেল, অথচ যে সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করল না, সে হতভাগা' *(মুসলিম হা/২৫৫১)*। (চ) 'যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানকে সুন্দরভাবে মানুষ করবে, ঐ সন্তান তার জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে'।[৬৬] (ছ) সন্তান যাতে সৎসঙ্গ তালাশ করে সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবে ঐ দুই বন্ধু, যারা স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছে'।[৬৭] (জ) 'দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৬৮]

---

৬১. বুখারী হা/৩৫৫৯; মুসলিম হা/২৩২১; মিশকাত হা/৫০৭৫।
৬২. তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৪১।
৬৩. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।
৬৪. আবুদাঊদ হা/১৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬২; তিরমিযী হা/১৯০৫
৬৫. নাসাঈ হা/৩১০৪; আহমাদ হা/১৫৫৭৭; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।
৬৬. বুখারী হা/৫৯৯৫; মুসলিম হা/২৬২৯; মিশকাত হা/৪৯৪৯।
৬৭. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৬৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭২।

৩. সামাজিক জীবনে :

(ক) 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্টকারিতা হ'তে তার প্রতিবেশী মুক্ত নয়'।[৬৯] (খ) 'যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় ও তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে ব্যক্তি মুমিন নয়'।[৭০] (গ) 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না'।[৭১] (ঘ) 'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'। 'যে ব্যক্তি বিধবা ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় ছওয়াব পায়'।[৭২] (ঙ) নিজের বা অন্যের ইয়াতীম প্রতিপালনকারী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হাতের দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকবে'।[৭৩] (চ) তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন'।[৭৪] (ছ) পরস্পরের জন্য তিনটি বস্তু হারাম : তার রক্ত, সম্পদ ও ইযযত'।[৭৫] (জ) যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে মুসলমানের দলভুক্ত নয়'।[৭৬] (ঝ) যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৭৭] (ঞ) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৭৮] (ট) জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[৭৯] (ঠ) দ্বীন হ'ল নছীহত'।[৮০] অতএব পরস্পরকে সর্বদা উপদেশ দিন।

---

৬৯. বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।
৭০. বায়হাক্বী, শু'আব হা/৫৬৬০; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬৩।
৭১. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৪৯৪৭।
৭২. বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
৭৩. বুখারী হা/৫৩০৪; মিশকাত হা/৪৯৫২।
৭৪. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫৬।
৭৫. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।
৭৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৩।
৭৭. বুখারী হা/৬৮৭৪; মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০।
৭৮. মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০।
৭৯. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।
৮০. মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য :

(ক) যে ব্যক্তি তার রূযী ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে।[৮১] (খ) আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে। যে তা যুক্ত রাখে, আল্লাহ তার সাথে যুক্ত থাকেন। আর যে তা ছিন্ন করে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন'।[৮২]

৫. নারী ও পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক :

আল্লাহ বলেন, পুরুষ যেন তার দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও তার লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। .. নারী যেন তার দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও তার লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..। তারা যেন তাদের বুকের উপর চাদর টেনে রাখে..। তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

৬. সরকার ও সমাজনেতাদের জন্য :

(ক) তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে'।[৮৩] (খ) যাকে আল্লাহ জনগণের উপর নেতৃত্ব দান করেন। অতঃপর সে তাদের প্রতি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মুসলিম হা/১৪২)*। বস্তুতঃ দেশকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত না করাই হ'ল সবচেয়ে বড় খেয়ানত। (গ) আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। (ঘ) তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়োনা। আল্লাহকে ভয় কর' *(হুজুরাত ৪৯/১)*। (ঙ) তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

---

৮১. বুখারী হা/২০৬৭; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।

৮২. মুসলিম হা/২৫৫৫; মিশকাত হা/৪৯২১।

৮৩. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

(চ) তিনি বলেন, ‘রাসূলের প্রতি আহ্বানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে’ *(নূর ২৪/৬৩)*। (ছ) পক্ষান্তরে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়াপ্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মুমিনের মধ্যে প্রথম হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক।[৮৪]

অতএব সমাজের নৈতিক ধস থামাতে গেলে প্রথমে নিজ পরিবারে, অতঃপর শিক্ষা ও প্রশাসনের সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে। সাথে সাথে আদালতের মাধ্যমে ইসলামী দণ্ডবিধি সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাগণ যদি অন্ততঃ ছয়মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এটা চালু করেন, তাহ’লে দেশের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং দেশ সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলায় পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৮৫]

২১. হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর!

মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সর্বশেষ আহ্বান ‘তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা সকলে ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকে পাবে তার স্ব স্ব কর্মফল। আর তারা কেউ সেদিন অত্যাচারিত হবে না *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত, যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ বা ২১দিন পূর্বে নাযিল হয়েছিল। দেশে ক্রমেই রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দলাদলির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির এটাই হ’ল তিক্ত পরিণতি। এখানে বিবেক ভোঁতা, হিংসা প্রবল। এখানে মিথ্যা সুন্দর, সত্য অসুন্দর। এখানে বিচার অচল, উচ্ছ্বাস মুখ্য। অথচ সত্য চিরদিন সত্য। তা কখনোই সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। দেড় হাযার বছর পূর্বেই আল্লাহ আমাদেরকে সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন, ‘তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও

---

৮৪. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৮৫. ১৬তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

জানেন’। ‘অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলো, তাহ’লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। কারণ ওরা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং ওরা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে’। ‘তোমার প্রভু ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত’ *(আন‘আম ৬/১১৫-১১৭)*। অতএব রাজপথ যদি সবকিছুর নিয়ামক হয়, তাহ’লে ইলেকশন, সংসদ, আদালত এসব কি দরকার? ফিরে চলুন সেই আদিম যুগে? মাইট ইজ রাইট-এর যুগে?

বিশ্বব্যাপী হিংসা-হানাহানির মূলে রয়েছে শয়তানের তাবেদারী। আল্লাহ বলেন, ‘স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (পাপ ছেড়ে আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে’ *(রূম ৩০/৪১)*। এর মন্দ পরিণতি বাস্তবে জানার জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান করে বলেন, ‘বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক’ *(রূম ৩০/৪২)*। তারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর প্রতি আনুগত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও নফসের প্রতি আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে নিজেরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সীমান্ত অরক্ষিত। সর্বত্র লুটপাট ও দুর্নীতি অবারিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশ আজ মরুভূমি। মানুষের জান-মাল ও ইযযত এখন সবচেয়ে সস্তা সামগ্রী। অথচ সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ কার ইশারায় আমরা ফিরে গেলাম এমন একটি ইস্যুতে যাতে দেশের কোন মঙ্গল নেই। বরং আছে কেবলই অকল্যাণ আর অকল্যাণ। যার নিদর্শন ইতিমধ্যে পরিস্ফুট। ষড়যন্ত্রকারীরা দূরে বসে মুখ টিপে হাসছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও! ফিরে এসো এমন অবস্থায় পৌঁছনোর আগে, যেখানে পৌছে গেলে আর ফিরতে পারবে না। তখন ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর সেটাই সুড়সুড়ি দাতাদের একান্ত কাম্য ও বড়ই আরাধ্য।

বিশ্ব ইতিহাসে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির কথা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তারা হ’ল কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, লূত, মাদিয়ান ও কওমে

ফেরাঊন। এইসব জাতির নেতারা নবীগণের অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের দোষেই পুরা জাতি ধ্বংস হয়েছিল। তাই নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক। যাকে বিমানের পাইলট ও বাসের ড্রাইভারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অতএব নেতাদের কর্তব্য হ'ল জনগণের আক্বীদা ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা যতটুকু করত, এখন সেটুকুও দেখা যাচ্ছে না। দিল্লীতে মাত্র একজন মুসলিম নাগরিক, যিনি অমিত সাহস নিয়ে গরু কুরবানী করেছিলেন। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে সংখ্যাগরিষ্টের প্রবল চাপকে উপেক্ষা করে ইংরেজ সরকার সেদিন ভারতবর্ষে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করেনি। অথচ এখন এই মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে ও কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হচ্ছে। আর নেতারা তাতে সমর্থন দিচ্ছেন। আল্লাহ বলেন, 'তুমি সরল ধর্মের নিকট নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিনকে আল্লাহ্র নিকট থেকে ফেরাবার নয়। যেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করে, তার অবিশ্বাসের পরিণাম তার উপরে বর্তায়। (অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম)। আর যে ব্যক্তি (ঈমান আনে ও) সৎকর্ম করে, তারা তাদের জন্য (জান্নাতের পথ) সুগম করে' *(রূম ৩০/৪৩-৪৪)*।

সমাজে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সবার। তবে প্রধান দায়িত্ব হ'ল সরকারের। জনগণের পক্ষে সরকারই এজন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সরকার, প্রশাসন ও আদালত তাই কোন দলের নয়, বরং জনগণের। জনগণই তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করে থাকে। অতএব তাদেরকে অবশ্যই দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে ও সকলের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীরুতার সর্বাধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন মানুষ কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অথচ তা প্রতিরোধ করে না, আল্লাহ সত্বর তাদের উপর ব্যাপক গযব নামিয়ে দিবেন।[৮৬] নিঃসন্দেহে পাপ-পুণ্য সেটাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)

---

৮৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; তিরমিযী হা/২১৬৮; মিশকাত হা/৫১৪২।

নির্ধারণ করেছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনো ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের মানদণ্ড নয়। আল্লাহ বলেন, ‘তুমি বলে দাও যে, সত্য কেবল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে আসে। অতঃপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা অবিশ্বাস করুক। আমরা যালেমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি’ *(কাহফ ১৮/২৯)*। একদল ধর্মনেতা ও সমাজনেতা নিজেদের কথা ও কাজকে সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত বলে মনে করেন। অথচ আল্লাহ বলেন, ‘বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব’? ‘তারা হ’ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে।’। ‘ওরা হ’ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাড়িপাল্লা খাড়া করব না’ *(কাহফ ১৮/১০৩-০৫)*। অর্থাৎ তাদের প্রতি কোনরূপ দৃকপাত করা হবে না।

উচ্ছ্বাস কোন বাধা মানে না। তা সাধারণতঃ চরমপন্থী হয়ে থাকে। যা একদিন হযরত ওছমান ও হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। সেদিন ইহূদী চক্রান্ত তাদের পিছনে কাজ করেছিল। সম্প্রতি ‘আরব বসন্ত’ নামে যে ঢেউ তোলা হয়েছিল। এখন যা সিরিয়ায় চলছে; তা সেসব দেশের গণমানুষের কোন কাজে আসেনি। বরং যাদের মদদে এটা হয়েছিল, তাদেরই লুণ্ঠনের পথ সুগম হয়েছে। এই উচ্ছ্বাস একদিন শেখ মুজিবের পাহাড়সম জনপ্রিয়তাকে নিমেষে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকেই দেশে প্রথম বিরোধীদল খাড়া হয়েছিল। কারা সেই উচ্ছ্বাসের পিছনে সেদিন ইন্ধন যুগিয়েছিল আশা করি মুজিবকন্যার তা অজানা নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা তরুণদের ও বোকাদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও’।[৮৭] তিনি বলেন, আল্লাহ যাকে জনগণের নেতৃত্ব দান করেন, অথচ সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ

---

৮৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০০।

তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন।[৮৮] তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়াতলে সাত শ্রেণীর মানুষ ছায়া পাবে। তাদের মধ্যে প্রথম হ'ল ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক। দ্বিতীয় হ'ল ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে...।[৮৯]

পরিশেষে বলব, আল্লাহ ও তাঁর বিধানই কেবল সত্য ও সুন্দর। সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য সত্যসেবীদের এগিয়ে আসা কর্তব্য। রাষ্ট্র ও সমাজনেতাগণ সেই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে দেশে আল্লাহ্র গযব অনিবার্য হয়ে পড়বে। অতএব হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর![৯০]

২২. মৌলিক পরিবর্তন কাম্য

মেয়াদী দলতন্ত্রের নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞে দেশ এখন রক্তাক্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। আতংকিত সাধারণ মানুষ শান্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও' *(নিসা ৪/৭৫)*।

কথায় বলে, 'রোম যখন পুড়ছে, নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছে'। দেশ যখন জ্বলছে, সরকার তখন উন্নয়নের বাঁশি বাজাচ্ছে। প্রত্যেক দলীয় সরকারের পতনকালে এরূপই হয়ে থাকে। সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ে জনগণের নামে জনগণের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। মারছে ও মরছে। জ্বালাও-পোড়াও ও লুটপাট চলছে সমানে। দেশে যেন '৭১-এর ন্যায় যুদ্ধাবস্থা ফিরে এসেছে। জেল-যুলুম, মিথ্যা মামলায় কারাগারে ঠাঁই নেই। অথচ ঠেকাবার কেউ নেই। এ দায়িত্ব ছিল তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সরকারের ও আদালতের। কিন্তু সরকার নিজেই এখন আগ্রাসী পক্ষ। দলীয় সরকার যে কখনোই সহনশীল ও নিরপেক্ষ হয় না, এই রূঢ় বাস্তবতা পূর্বের ন্যায় আবারও প্রমাণিত হ'ল।

---

৮৮. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২।
৮৯. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১।
৯০. ১৬তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১৩।

দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, চিহ্নিত মহল ইসলামকেই তাদের টার্গেট বানিয়েছে। ১ম মহাযুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা না থাকলেও নামধারী মিত্রশক্তি তুরস্কের ইসলামী খেলাফতকে টার্গেট করে এবং তাকে ভেঙ্গে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতেও দেশের ইসলামী সংগঠনগুলির তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামকেই আক্রমণের শিকারে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহ, রাসূল, কুরআন সবকিছুর উপর হামলা করা হয়েছে। সবশেষে আল্লাহ ও দেব-দেবীকে সমান গণ্য করে স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর সরকারী পাঠ্যবই ছেপে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বইতেও একইভাবে ইসলাম দুশমনীর অভিযোগ আসছে। দেশে এত প্রেস থাকতে সমস্ত বই কোটি কোটি টাকা খরচ করে ছেপে আনা হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে। যারা এদেশকে মরুভূমি বানিয়েছে। যারা দৈনিক সীমান্তে আমাদের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। কখনো ফেলানীর লাশ কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখছে। সীমান্তে ফেন্সিডিল কারখানা বানিয়ে এদেশে পাচার করে তরুণদের মাতাল ও মাস্তান বানাচ্ছে। সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিসাব মতে প্রতিদিন গড়ে সেদেশে একটি করে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হচ্ছে। আমাদের সীমান্তের ভূমি জবরদখল করছে। অথচ তাদেরকে খুশী করার জন্য আমাদের সরকার সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে। ১৯৭১-এর পূর্বে এদেশ ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ। আর ভারত ছিল এদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও সবশেষে হামলাকারী দেশ। বর্তমান জাতীয় সংসদের (২০০৯-২০১৩ খৃ.) ডেপুটি স্পীকার মুক্তিযুদ্ধের ৫ নং সেক্টর কম্যাণ্ডার লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল মীর শওকত আলীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সঠিক ছিল' -এটুকুই কি যথেষ্ট নয়? অথচ বলা হ'ত যে, এটি মিথ্যা মামলা। অতএব দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কেউ সেদিন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে থাকে, তাহ'লে কি তাদের দোষী বলা যাবে? যুদ্ধ শেষে নিরাপদ পরিবেশে স্বাধীন দেশের হাযার হাযার মানুষকে যারা একতরফাভাবে হত্যা করল, তারা কি যুদ্ধাপরাধী নয়? সত্যি কথা বলতে কি, আজ পাকিস্তান থাকলে মুক্তিযোদ্ধারাই হ'ত যুদ্ধাপরাধী, আর রাযাকাররাই হ'ত মুক্তিযোদ্ধা।

সেদিন ‘জয় বাংলা’ না বলে ‘আল্লাহু আকবার’ বলার অপরাধে কত শত তরুণকে তাদের বাপ-মায়ের সামনে লাইন দিয়ে গুলি করে শহীদ করা হয়েছে, সে দৃশ্য কি তাদের বাপ-ভাইয়েরা ভুলে গেছে? তাদের কোন বিচার আজও হয়নি। প্রয়োজনও নেই। ৯৩ হাযার পাকিস্তানী সেনার ফেলে যাওয়া হাযার হাযার কোটি টাকার অস্ত্র-শস্ত্র ও দেশের কল-কারখানা সব লুট করে নিয়ে গেল বন্ধুরাষ্ট্র। এর প্রতিবাদ করায় মেজর জলিল হ’লেন দেশের প্রথম রাজবন্দী ও মাওলানা ভাসানী হ’লেন কার্যত গৃহবন্দী।

যুদ্ধ শেষে সবাই যখন স্বাধীন দেশকে মেনে নিয়েছে, তখন শুকনো ক্ষত পুনরায় কার স্বার্থে ঘা করা হচ্ছে? এরশাদ পতন আন্দোলনে এবং ১৯৯৬-২০০১-য়ে সরকার গঠনের সময় যাদের সমর্থন নিয়ে বর্তমান সরকারী দল ক্ষমতায় গিয়েছিল, তখন কেন এই ইস্যু তোলা হয়নি? তখন যাদেরকে জাতীয় সংসদে দু’টি মহিলা সীট দিয়ে পুরস্কৃত করা হ’ল, সংসদে যাদের বক্তৃতার সময় টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দেওয়া হ’ল। এখন আবার তাদের নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা কেন? তাদের প্রতি এত ভয় কিসের? সাহস থাকলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করুন। যে যার জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাবে? হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ও নাস্তিকদের যদি এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার থাকে, তাহ’লে তাদের থাকবে না কেন? কে না জানে যে, নিষিদ্ধ ফলের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী। ‘ইখওয়ান’কে মিসরে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন তারাই ক্ষমতায়। নিষিদ্ধকারী হোসনি মোবারক এখন বিচারের কাঠগড়ায়। অতএব এইসব বাহুল্য চিন্তা বাদ দিয়ে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সরকারের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পৃথিবীতে সবকিছুর বিচার মানুষ করতে পারে না। লাখ লাখ মানুষকে হত্যাকারী বিশ্বসেরা যুদ্ধাপরাধী বুশ-ব্লেয়ার ও পাশ্চাত্য অপশক্তির বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া দূরে থাক, তাদের প্রতি টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কোন নেতার হয়েছে কি? অতএব অনেক কিছুর বিচার আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিতে হয়। প্রকৃত অপরাধীরা কখনোই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। দুনিয়াতেও তারা ধিকৃত হয়েছে। অতএব আসুন! পরস্পরকে ক্ষমা করে দেশকে গড়ে তুলি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।

এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী ইসলামী শক্তিকে সরকার তার প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। ইসলামী দলগুলিকে একে একে ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে। এতে সরকার বা তাদের নেপথ্য শক্তি যেটাই ভাবুন না কেন দেশ ক্রমেই এগিয়ে চলেছে একটা মৌলিক পরিবর্তনের দিকে। নিঃসন্দেহে সে পরিবর্তন হবে ইসলামের পক্ষে, বিপক্ষে কখনোই নয়। আর এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যে, পৃথিবীতে এমন একটি মাটির ঘর বা ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না।[৯১] অতএব ইসলামের উপর যতই হামলা হবে, ততই ইসলামের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুষ্টিমেয় শাহবাগীদের কথিত গণজাগরণের চূড়ান্ত ব্যর্থতা তার বাস্তব প্রমাণ। ঐ অপতৎপরতা কেবল মানুষের ঘৃণা কুড়িয়েছে। কখনোই তাদের হৃদয়ে স্থান করতে পারেনি। আদালতের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল, তা এখন পরিষ্কার। ভোলা যাবে না যে, গত টার্মে এই দলের সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকোর্টের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করেছিলেন।

আমরা মনে করি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসকে আক্রমণ করা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হামলা করার শামিল। আর সেই সাথে যখন যুক্ত হয় কয়েকটি চিহ্নিত মিডিয়া ও মিডিয়াম্যানদের এবং প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের সরব সমর্থন ও উসকানি, তখন সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। মনে রাখা ভাল যে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার জন্য এবং ইসলামী স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য হাযার হাযার বাঙ্গালী মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে এদেশ একদিন ‘পাকিস্তান’ নামে স্বাধীন হয়েছিল। হক-ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী-শেখ মুজিব ছিলেন সেই সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সামনের কাতারের সৈনিক। বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্র তাঁদেরই রেখে যাওয়া আমানত। যদিও নেহরু গংদের কুটিল চক্রান্তে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, শিয়ালপাড়া এবং আসামের শিলচর ও করিমগঞ্জ যেলাগুলি সহ বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে আমরা বঞ্চিত

৯১. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০১; মিশকাত হা/৪২।

হয়েছি। আজও ইসলামের স্বার্থেই এ দেশের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাই ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এদেশের ঈমানদার মুসলমানেরা কখনোই আপোষ করবে না। ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ভারতীয় নেতারা কখনোই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চাননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। জানিনা হঠাৎ কোন মতলবে শ্বশুরবাড়ি ঘোরার নামে প্রণব মুখার্জি রবীন্দ্রনাথের জমিদারী এলাকা কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও টাঙ্গাইলের পতিসর কুঠি ঘুরে গেলেন। যদিও নজরুলের নাম তাঁর হয়তবা স্মরণে আসেনি। সময়ই একদিন সব বলে দেবে। যারা '৭৫-এর ২১শে এপ্রিল মাত্র ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ চালু করার ধোঁকা দিয়ে বিগত ৩৮ বছর যাবৎ পানি আটকে রেখে পদ্মাকে হত্যা করেছে, যারা তিস্তা থেকে এক ফোঁটা পানি দিতে চায় না, ঐসব কপট বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রায়ই সীমান্তে মিলনমেলার ভড়ং দেখলে দুঃখ হয় বৈকি!

পরিশেষে নেতাদের বলব, যে ইসলামের নামে আপনারা সর্বদা ভোট চান, সেই ইসলামের একটা বিধান অন্ততঃ মেনে নিন এবং নিজেদের সত্যিকারের জনপ্রিয়তা যাচাই করুন। অবিলম্বে দেশে দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন দিন। জনগণকে ভয় ও চাপমুক্তভাবে তাদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিন। *ইনশাআল্লাহ* রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যালট পেপারে মাত্র দু'টি দফা দিন, (১) ইসলামী খেলাফত চান, না ধর্মনিরপেক্ষ শাসন চান? (২) দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাকে চান? নির্বাচন কমিশন ইসলামী নীতি মেনে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে। সরকার পদত্যাগ করবে এবং পরবর্তী সরকার না আসা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশ চালাবেন। এভাবে দেশে মৌলিক পরিবর্তন আনুন এবং স্থায়ী শান্তির পথে ফিরে আসুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৯২]

[এ বিষয়ে মাননীয় সিইসি সমীপে ইতিপূর্বে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করেছি। উক্ত মর্মে এপ্রিল'১২ সম্পাদকীয়টি পাঠ করুন- সম্পাদক]

---

৯২. ১৬তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৩।

২৩. নাস্তিক্যবাদ

বর্তমানে অনেকে বলছেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই। এর সরলার্থ হ'ল অনৈসলামিক বাংলাদেশ চাই। কেউ বলছেন, নাস্তিক্যবাদও একটি ধর্ম। অতএব তাকে রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। কেউ বলছেন, রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিলেও সে মুসলমান। কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, এরা কোনটাই বুঝেন না। এক্ষণে আমরা কুরআন ও হাদীছের আলোকে তুলে ধরব নাস্তিক্যবাদ বা কুফর কাকে বলে? 'কুফর' অর্থ ঢেকে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত ইসলামী শরী'আতকে অস্বীকার করা। যার বিপরীত হ'ল ঈমান। কুফরী দুই প্রকার : (১) ঐ কুফরী যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। (২) যা খারিজ করে দেয় না। তবে কবীরা গোনাহগার বানায়। যেমন 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও পরস্পরে যুদ্ধ করা কুফরী'।[৯৩] এই কুফরী অর্থ মহাপাপ। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

প্রথম প্রকার কুফরী যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, তা হ'ল ছয় প্রকার : (ক) ইসলামে মিথ্যারোপ করা *(নমল ২৭/৮৩-৮৪)* (খ) অস্বীকার করা *(নমল ২৭/১৪; বাক্বারাহ ২/৮৯)* (গ) হঠকারিতা করা *(বাক্বারাহ ২/৩৪)* (ঘ) অন্তরে বিশ্বাস রাখা ও মুখে অস্বীকার করা *(নিসা ৪/৬১)* (ঙ) এড়িয়ে চলা *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩-৫)* (চ) সন্দেহ করা *(ইবরাহীম ১৪/৯)*। এগুলি তিনভাবে হয়ে থাকে : (১) বিশ্বাসগতভাবে। যেমন কাউকে আল্লাহ বা তাঁর গুণাবলীতে শরীক সাব্যস্ত করা বা অসীলা নির্ধারণ করা। আল্লাহ্র ইবাদতের ন্যায় অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করা। যেমন কোন কিছুর সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, আল্লাহ্র ন্যায় অন্যকে মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী মনে করা ইত্যাদি। আল্লাহ্র স্ত্রী-পুত্র নির্ধারণ করা, তাঁর কৃত হারামকে হালাল করা। যেমন সূদ-ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদিকে হালাল ধারণা করা। (২) কথার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ বা তাঁর রাসূলকে বা ইসলামকে গালি দেওয়া, হেয় করা, উপহাস ও ব্যঙ্গ করা। কুরআন বা তার কোন আয়াতকে অস্বীকার বা তাচ্ছিল্য করা *(তওবাহ ৯/৬৫)*। (৩) কাজের মাধ্যমে। যেমন মূর্তি বা কবরে সিজদা করা। পবিত্র কুরআনকে তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে ফেলা বা পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এগুলি করবে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। কোন মুসলিম এটা করলে সে

৯৩. বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।

মুরতাদ হবে। তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা আদালতের মাধ্যমে সরকার কার্যকর করবে। না করলে ঐ সরকার কবীরা গোনাহগার হবে এবং তাকে আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে। যারা আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, হাদীছ, ছালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসা-কটূক্তিতে লিপ্ত হয়, তারা এবং তাদের প্রকাশ্য সমর্থনকারী মহল পরিষ্কারভাবে কাফির। যদিও তাদের নাম বাহ্যতঃ ইসলামী হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের ৬টি স্তম্ভের কোন একটিকে অস্বীকার করে সে কাফের। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীকার করে, কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), কুরআন, ফেরেশতা, বিগত ইলাহী কিতাব সমূহ ও নবী-রাসূলগণ, আখেরাতে জবাবদিহিতা এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দে অবিশ্বাস করে সে কাফের।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীকার করে। কিন্তু তাঁর বিধান সমূহকে অস্বীকার করে, সে কাফির। পক্ষান্তরে যদি বিধান সমূহকে স্বীকার করে, কিন্তু সে অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, সে ব্যক্তি যালেম ও ফাসেক *(মায়েদাহ ৫/৪৪, ৪৫, ৪৭)*। কোন সরকার এটা করলে সেও একই পর্যায়ভুক্ত হবে। তওবা না করা পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা পাবে না। তাদের মাধ্যমে যত লোক আল্লাহ্র বিধান অমান্য করবে বা মান্য করতে অপারগ হবে, সকলের পাপভার ঐ লোকদের উপরে চাপবে, যাদের কারণে লোকেরা উক্ত পাপে লিপ্ত হয় *(নাহল ১৬/২৫)*।

যারা কাফের-মুশরিকদের কাফের মনে করে না। বরং তাদের মনগড়া ধর্মকে সঠিক মনে করে, তারাও কাফের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি নিজেদের মনগড়া বিধানকে ইসলামী বিধানের চাইতে উত্তম মনে করে, ইসলামের কোন কোন বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, আল্লাহ-রাসূল ও কুরআন বা হাদীছের প্রতি কটূক্তি করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে, সে ব্যক্তি কাফের। আল্লাহ বলেন, 'আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এরা হ'ল সৃষ্টির অধম'। 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা'। 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য,

যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৬-৮)*। আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিক্যবাদ থেকে রক্ষা করুন- আমীন![৯৪]

২৪. নমরূদী হুংকার!

'তুই জঙ্গী। এখন তোর আল্লাহ কোথায়? তোকে বাঁচালে আমরা বাঁচাবো। তাছাড়া কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না'। দূর অতীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাওহীদী দাওয়াতের মুকাবিলায় ইরাকের অহংকারী সম্রাট নমরূদ বলেছিল 'আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। আজ সেকথাগুলিই শুনছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার দলীয় ছাত্রী ক্যাডারদের মুখে। যেদেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পাইনা। সেদেশে তাঁর দলীয় ছাত্রীরা আল্লাহকেও ভয় পায় না। যারা একটি মেয়েকে তার রূম থেকে ধরে এনে পিটিয়েছে। কারণ তার কাছে 'নারী-পুরুষের পর্দা' নামে একটা বই পাওয়া গেছে। হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঐ নির্যাতিত ছাত্রীর কোন কথাই শোনেনি। বরং সরকার দলীয় ক্যাডারদের কথা মেনে নিয়েছে। শারীরিক ও মানসিক সব ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছে ঐ দ্বীনদার ছাত্রীটির উপর এবং তার মত আরও বহু ছাত্রীর উপর। অবশেষে অনেককে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে তারা। আর পুলিশ যথারীতি মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে কারাগারে এ ধরনের বহু নিরপরাধ ছাত্রীকে। 'আসুন সঠিকভাবে রোজা পালন করি' 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা' প্রভৃতি বইগুলোও এখন জঙ্গী বা জিহাদী বইয়ের তালিকায় চলে এসেছে।

এভাবে কোন ছাত্র বা ছাত্রী নিয়মিত ছালাত-ছিয়াম পালন করলে, কুরআন-হাদীছ, তাফসীর বা ইসলামী বই-পত্রিকা রাখলেই তাকে বলা হচ্ছে জঙ্গী। বোরক্বা পরা মেয়ে বা শিক্ষিকা, দাড়ি-টুপী পরা ছাত্র বা শিক্ষকরাও এখন জঙ্গী সন্দেহযুক্ত। হলের মসজিদগুলির সামনে সরকার দলীয় ছাত্র-ক্যাডারদের মাধ্যমে পাহারা বসানো হচ্ছে, কে নিয়মিত ছালাত আদায় করে তার রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য। তারা রুমে রুমে তল্লাশি চালাচ্ছে কার রুমে ইসলামী বই বা পত্রিকা আছে। অতঃপর ধরে এনে মারপিট, গালি-গালাজ ও নানাভাবে

---

৯৪. ১৬তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৩।

লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। অতঃপর সরকার যাদের পসন্দ করে না, এমন কোন একটি ইসলামী দলের তকমা লাগিয়ে দিয়ে তাকে পুলিশে দেওয়া হচ্ছে বা হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী মিডিয়াগুলি এ ধরনের খবরগুলি লুফে নিয়ে প্রচার করে দিচ্ছে কোনরূপ বাছ-বিচার ছাড়াই। সরকারী দলের ছাত্র বা ছাত্রী ক্যাডারদের অত্যাচার থেকে সরকারী দলের ছেলে-মেয়েরাও নিরাপদ নয় যদি তারা দ্বীনদার হয়। যেমন পত্রিকার রিপোর্ট মতে ঢাবির শামসুন্নাহার হলের এক লাঞ্ছিত ছাত্রীর অভিভাবক নেত্রকোনা যেলার একটি অঞ্চলের যুবলীগ সভাপতি তার মেয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে 'দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা সবাই নিয়মিত ছালাত আদায় করি। আমাদের পুরো পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। অথচ আমার মেয়ের নামে হিযবুত তাহরীর বা ইসলামী ছাত্রীসংস্থার রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, কেবল ছালাত আদায়ের কারণেই আমার মেয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তার ও তার মেয়ের মর্যাদা সামাজিকভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে'।

কেবল ইসলামী বই, ইসলামী পোষাক ও শরী'আত পালনের কারণে নয়, বরং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির কারণেও সরকার দলীয়রা এটা করে যাচ্ছে এবং ফ্রি স্টাইলে যাকে-তাকে জঙ্গী ও জঙ্গীদলের সদস্য বানাচ্ছে। আর তাদের লাই দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অথচ এর ফলে তাঁরা তাদের অবাঞ্ছিত দলগুলির জনপ্রিয়তা বরং আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও কমবেশী একই রূপ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় সবার। এখানে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সবার। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে যেকোন বই বা পত্রিকা পড়বে, সকল ধর্মের ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে, এতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারু নেই। দেশের সংবিধানেও সেকথা লেখা আছে। এইসব বিদ্বানরা ভুলে গেছেন যে, যুক্তিকে যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়, শক্তি দিয়ে নয়। আদর্শকে আদর্শ দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়, অন্য কিছু দিয়ে নয়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা ও অশান্তিই কেবল বৃদ্ধি পাবে। এটি আদৌ কোন প্রশাসনিক বিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচায়ক নয়।

ভাবতেও অবাক লাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কত বড় অদূরদর্শী হ'লে তারা একটি মুসলিম দেশে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন! রাজনৈতিক দলবাজি তাদেরকে কত নীচে নিয়ে গেছে ও তাদেরকে কিরূপ অন্ধ বানিয়েছে, এগুলিই তার প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট করে দিচ্ছে এইসব নোংরা দলবাজি। অতএব সর্বাগ্রে শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক দলবাজি বন্ধ করতে হবে। সেইসাথে ইসলাম বিদ্বেষী সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটা না করে পরিবেশ শান্ত ও সুন্দর করার আশা করা পচা বিড়াল রেখে কূয়ার পানি সেচার মত হবে। আর সেটা করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের। অতএব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের দায়ী করলে চলবে না, সরকারকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। নইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা ধ্বংস হবে এবং সেই সাথে ধ্বংস হবে সমাজ ও রাষ্ট্র। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন![৯৫]

২৫. তবে কি বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র?

জান-মাল-ইযযতের নিরাপত্তা, খাদ্য-পানীয়-চিকিৎসা-বাসস্থান ও স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি অধিকতর উন্নত জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এর কোনটাই কি খুঁজে পাওয়া যাবে? রাস্তায় বের হ'লে বোমাবাজ ও চাঁদাবাজদের আতংক, ঋণ নিতে গেলে সূদখোর ও অফিসে গেলে ঘুষখোরদের আতংক, বাজারে গেলে বিষ ও ভেজালের আতংক, আদালতে গেলে রিম্যাণ্ড ও কারাগারের আতংক, নেতাদের কাছে গেলে মিথ্যা আশ্বাস অথবা ক্যাডার লাগিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের আতংক, র‍্যাব-পুলিশের কাছে গেলে আযরাঈলের আতংক, এভাবে সার্বিক জীবনে আতংক নিয়ে যে দেশের মানুষ সদা সন্ত্রস্ত, সে দেশ কি সফল রাষ্ট্র? ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির, চাকুরী থেকে কর্মী ছাটাই, শ্রমিক-মজুরদের কর্মহীন জীবন, নারীর ইযযত ও মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সর্বত্র দুর্বৃত্তায়ণ

---

৯৫. ১৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৪। একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় 'নমরূদী হুংকার' যা জাতীয় ইস্যু শিরোনামে যুক্ত হয়েছে।

যে দেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে গ্রাস করেছে, সে দেশকে আমরা কি বলব? 'একটি ফুলকে বাঁচাতে মোরা যুদ্ধ করি'- মুক্তিযুদ্ধের সেই গান এখন বেসুরো মনে হয়। পত্রিকা খুললেই বন্দুক যুদ্ধে র‍্যাব ও পুলিশের মানুষ হত্যা আর দুর্বৃত্তদের ককটেল ও পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ পোড়ানোর খবর। ক্ষমতালোভী দু'টি দলের নেতা ও ক্যাডারদের হানাহানিতে দেশ এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। উভয় দলই গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য লড়ছে। অথচ উভয় দলেরই সস্তা শিকার হ'ল এদেশের নিরীহ জনগণ। কথিত ক্রসফায়ারে মরছে সাধারণ মানুষ, পেট্রোল বোমায় পুড়ছে সাধারণ মানুষ, মিথ্যা মামলায় কারাগারে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। গত ৩রা জানুয়ারী'১৫ থেকে এযাবত যে ১২/১৪ হাযার মানুষকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে, তাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত দোষী? দোষীরা তো দোষ করে পালিয়ে যায় বা তারা শেল্টার পায়। পরে পুলিশ গিয়ে নিরীহ মানুষ ধরে এনে পিটায় ও ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। গত ১৫ই জানুয়ারী'১৫ চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার মহদীপুর, রসূলপুর ও চণ্ডিপুরে র‍্যাব-পুলিশ যৌথবাহিনী যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, '৭১-এর ধ্বংসযজ্ঞের পরে তার কোন তুলনা আছে কি? রাস্তায় কারা ককটেল ফাটিয়েছে তার জন্য কি গ্রামবাসী দায়ী? দিনে-দুপুরে বাড়ী-ঘরে ঢুকে নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে বেধড়ক পিটানো, ঘরের আসবাব-পত্র, টিভি, ফ্রিজ, শোকেস ইত্যাদি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া, ধানের গোলায় আগুন দেওয়া, হোন্ডা পুড়িয়ে দেওয়া, এগুলি স্রেফ সন্ত্রাস ও গুণ্ডামি ছাড়া আর কি? কয়েকটি গ্রামের আতংকিত মানুষের কাঁথা-বালিশ নিয়ে এক কাপড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে রাস্তায় হাঁটার দৃশ্য পত্রিকায় দেখে কে বলবে যে, এরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন মানুষ? নিরীহ নিরপরাধ ছেলেটিকে ধরে নিয়ে রাতের বেলায় ঠাণ্ডা মাথায় নিজেরা গুলি করে হত্যা করে হাসপাতালে রেখে আসা। অতঃপর বন্দুক যুদ্ধের (!) মিথ্যা বিবৃতি সাজিয়ে পত্রিকায় দেওয়াই হ'ল এখন বিচার সম্মত শাস্তি ব্যবস্থা। অথচ 'দেখামাত্র গুলি' 'জিরো টলারেন্স' ইত্যাদি ভাষা তো কোন দায়িত্বশীল সরকার বা আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হ'তে পারে না। তাহ'লে ৭১-এর খান সেনাদের সাথে এদের পার্থক্য কোথায়? তাই জিজ্ঞেস করতে মন চায়- হে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা! আর কত মানুষ খুন করলে, আগুনে পোড়ালে আর জেলে ভরলে তোমাদের গণতন্ত্র উদ্ধার হবে?

হাযারো মানুষের আবেদন উপেক্ষা করে বলা হচ্ছে, 'সংলাপে লাথি মারো'। সরকারী দলের মন্ত্রী-এমপিদের এ ধরনের হুমকি ও ফালতু কথন যে দেশটাকেই ফালতু বানিয়ে দেয়, সে হুঁশ কি নেতাদের আছে? দেশটা কি কেবল সরকারী দলের? নাকি কেবল বিরোধী দলের? যারা দু'দলের কোনটাতে নেই, তারা কি এদেশের নাগরিক নয়? তারা কি সরকারকে ট্যাক্স দেয় না? দু'দলের কামড়া-কামড়িতে দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এরপরেও নেতাদের হুঁশ ফিরছে না। সরকার যেখানে শতভাগ জনপ্রিয় (?), সেখানে দেশে শান্তির স্বার্থে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে এখুনি নির্বাচন দিতে সমস্যা কোথায়? বিরোধী দলের স্বাভাবিকভাবে সভা-সমিতি করায় বাধা কেন? মনগড়া সংবিধানের একটি পৃষ্ঠার চাইতে একটি মানুষের জীবনের মূল্য কি বেশী নয়? সরকার ও সরকারী দল যখন একাকার হয়ে গেছে এবং দু'টি দলের নেতারা যেখানে চরমপন্থায় চলে গেছেন, তখন প্রেসিডেন্টের 'ভূমিকা' রাখাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। নইলে ইহকালে ও পরকালে তাঁর জওয়াবদিহী করার কোন পথ থাকবে না। প্রধান বিচারপতিরও এক্ষেত্রে করণীয় আছে। দয়া করে তা প্রয়োগ করুন সর্বোচ্চ মানবিক তাকীদে। নইলে অন্ধকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সকলের জন্য। সবাই দেখতে পাচ্ছেন দু'দলই এখন তাদের বিদেশী প্রভুদের দিকে তাকিয়ে আছে। কে না জানে যে, বিদেশীরা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় আছে। আর তাদের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হওয়া অর্থ দেশের স্বার্থ তাদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া। তাদেরই ষড়যন্ত্রে ইতিমধ্যে সূদান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং ইয়ামেন হবার পথে।

দল এবং সরকার আলাদা বস্তু। সরকারকে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকতে হয়। তাদেরকে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের স্বার্থ দেখতে হয়। এর ফলে শেষ বিচারে সরকারী দলেরই লাভ হয়। কিন্তু এ দূরদর্শিতা এদেশে বিরল। তবুও উভয় দলকে বলব, মানুষ হত্যার ও লুটপাটের রাজনীতি বাদ দিন। মানুষকে ভালবাসুন। মানুষ আপনাদের ভালবাসবে। আল্লাহ খুশী হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন।[৯৬] অথচ বন্দুকের গুলির আগুনে আর ককটেল ও পেট্রোল বোমার আগুনে আপনারা

৯৬. বুখারী হা/৩০১৭; মিশকাত হা/৩৫৩৩।

হর-হামেশা মানুষ পুড়িয়ে মারছেন। এর ফলে আপনারা ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাচ্ছেন। সারা জীবন রাজনীতি করে তাহ'লে কি নিয়ে আপনারা কবরে যাবেন?

এ বিষয়ে আমাদের একটা ছোট্ট প্রস্তাব আছে : সরকার ও বিরোধী দল যদি নিশ্চিত হন যে, তারাই এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল, তাহ'লে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিন, তারা দল ও প্রার্থীবিহীন ভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন দিন। কোন এমপি নয়, কেবল সর্বোচ্চ নেতার নির্বাচন হবে। নির্বাচনের দিন ছুটি ঘোষণা করবেন না। কেউ কোনরূপ ক্যানভাস করবেন না। শূন্য ব্যালটে বা ই-মেইল যোগে জনগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করুক। দেখা যাক কোন নেতা কত জনপ্রিয়। সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন প্রেসিডেন্ট। অতঃপর যোগ্য লোক বাছাই করে তিনি তাদের পরামর্শক্রমে দেশ চালাবেন। সরকারী বা বিরোধী দল বলে কোন কিছুর নাম-গন্ধ থাকবে না। উভয় দলের নেতাদের মধ্যে কারু এ সৎসাহস আছে কি?

আমরা একটি কার্যকর ও সফল রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে দেখতে চাই। আমরা আমাদের জান-মাল ও ইযযত নিয়ে এদেশে নিরাপদে বসবাস করতে চাই। নেতাদের মারামারির দায় আমরা গ্রহণ করতে চাই না। পেট্রোল বোমায় দগ্ধীভূতদের কান্না আর কথিত বন্দুকযুদ্ধে সন্তান হারানো মায়েদের কান্না কি নেতা-নেত্রীরা শুনতে পান? আল্লাহ তুমি দেশকে হেফাযত কর- আমীন![৯৭]

২৬. আর কেন? এবার জনগণের কাছে আসুন!

গণতন্ত্রের পরিভাষায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। অথচ জনপ্রতিনিধিরাই এখন জনগণকে হত্যা করছে নির্বিচারে। প্রত্যেকে একে অপরকে দোষ দিচ্ছে। তাতে লাভ কি? নিহত ভোটারটি কি আর বেঁচে উঠবে? বা আগুনে পোড়া মানুষটি কি কখনও নেতাদের ক্ষমা করবে? ৭দিন চলে গেছে অনেক আগে। আর কেন? এবার ফিরে আসুন জনগণের আদালতে। সফলতা ও ব্যর্থতার বিচারভার তাদের উপর ছেড়ে দিন। মনে রাখতে হবে দায়িত্বহীন আর দায়িত্বশীল কখনও এক নয়। দায়িত্বহীনরা যা খুশী করতে

৯৭. ১৮তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৫।

পারে। কিন্তু দায়িত্বশীলরা স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে না। তারা অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে ট্রেনে একবার বোমা হামলা হ'ল। তাতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দায়-দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করলেন। আমাদের দেশে গত ৫৪ দিনে ১৪ বার ট্রেনে নাশকতা হ'ল। কিন্তু কেউ তো দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করলেন না। তাহ'লে দু'দেশের দুই গণতন্ত্রে নিশ্চয় কোন পার্থক্য আছে। সেটা কি, তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা মুসলমান। এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হ'ল ইসলাম। আল্লাহ্র বিধানকে স্বাধীনভাবে মেনে চলে সুখ-শান্তির সাথে জীবন-যাপন করার জন্যই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা ১৯৪৭ সালে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ হয়েছিল। অতঃপর ১৯৭১ সালে একই মানচিত্রে স্রেফ রং পরিবর্তন করে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আজ যদি সেই ইসলামী চেতনা হারিয়ে যায়, তাহ'লে এদেশের স্বাধীন সত্তা একদিন হারিয়ে যাবে। এপার বাংলা-ওপার বাংলার মাঝে বিভক্তির কোন নৈতিক যুক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামী চেতনা হ'ল মানুষের স্বভাবধর্ম এবং মানবতার সর্বোচ্চ চেতনা। যা সকল মানুষকে এক আল্লাহ্র দাস হিসাবে গণ্য করে। আর আল্লাহ্র বিধান সকল মানুষের জন্য সমভাবে কল্যাণকর। যেমন আল্লাহ্র সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্য, আলো-বাতাস সবার জন্য কল্যাণকর। অজ্ঞরাই কেবল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নাম নিয়ে ইসলামকে সাম্প্রদায়িক বলতে চায়। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে চায় এবং নিজেদের মনগড়া আইনে জনগণকে আল্লাহ্র গোলাম হওয়ার বদলে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়।

এদেশের ১৬ কোটি মানুষের ইসলামী চেতনার সর্বোচ্চ বাস্তবায়নকারী হ'ল এদেশের সরকার ও আদালত। কিন্তু তারা কি সেটা করছেন? নিঃসন্দেহে নয়। ফলে রাজনীতির নামে স্রেফ ক্ষমতার জন্য হিংসা-প্রতিহিংসার মাধ্যমে যারা দেশকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, তাদেরকেও মরতে হবে এবং আল্লাহ্র আদালতে দাঁড়াতে হবে? কি নিয়ে দাঁড়াবেন সেদিন তাঁর সামনে? আল্লাহ মানুষকে ক্ষমতা দেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সেই পরীক্ষায় বিগত বা বর্তমান ক্ষমতাসীনরা কি উত্তীর্ণ

Contents

হ'তে পেরেছেন? তারা কি আবুবকর ও ওমরের মত নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী হয়ে গণমানুষের সেবক হ'তে পেরেছেন? পেরেছেন কি দ্বীনদার মানুষের হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করতে? অথচ হাযারো ফাসেকের গগণবিদারী শ্লোগানের চাইতে একজন মুমিনের নীরব ও প্রাণখোলা দো'আ আল্লাহ সাগ্রহে কবুল করে থাকেন এবং একজন তাওহীদবাদী প্রকৃত মুমিনের জন্য তিনি ক্বিয়ামত পিছিয়ে দিবেন'।[৯৮] সন্তানহারা মায়ের কান্না, স্বামীহারা বিধবার বুকফাটা আর্তনাদ, বুলেটবিদ্ধ তরুণের বাপ-মায়ের বোবা চাহনি, পেট্রোল বোমায় ঝলসানো মানুষের তীব্র অন্তর্বেদনা, কারাগারে ধুঁকে মরা হাযারো নিরপরাধ মানুষের আকুল ফরিয়াদ আর মযলূমের হৃদয় উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস যিনি শুনেন, তিনি সবকিছুর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিবেনই। কিছুটা দেরীতে অথবা এখনই *(আন'আম ৬/১৬৫)*। তাই সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ, আল্লাহ্র প্রতিশোধ নেমে আসার আগেই বিরত হৌন! দায়িত্বশীলরাই সেটা করবেন সর্বাগ্রে।

নমরূদ, ফেরাঊন, তৈমুর, হালাকু, চেঙ্গীয, হিটলার, মুসোলিনী, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওসেতুং প্রমুখ বিশ্বনিন্দিত অত্যাচারী শাসকদের সবাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের নাম নিতেও ভয়ে আঁৎকে ওঠে। তৈমুর লং-এর এক পা ল্যাংড়া ছিল। কুরআনের হাফেয ছিলেন। ফিক্বহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু মানুষ মেরে আনন্দ পেতেন। হাযার হাযার নিরপরাধ মানুষের মাথার খুলি দিয়ে সুউচ্চ মিনার বানিয়ে তিনি অন্যদের ভয় দেখাতেন। এ যুগের অত্যাচারীরা এটমবোমা মেরে নিমেষে লাখো বনু আদমকে হত্যা করে বিশ্বকে ভয় দেখিয়েছে। আজও তারা পৃথিবীর দিকে দিকে সেটা করে চলেছে। অন্যদিকে ইরাকের জনৈক স্বঘোষিত খলীফার (?) হুকুমে তার লোকেরা মানুষকে গাজর-মূলার মত শিরশ্ছেদ করে বা কলিজা চিবিয়ে বিশ্বব্যাপী ভিডিও দেখাচ্ছে। উদ্দেশ্য মানুষকে ভয় দেখানো। এরা ইসলামের সাচ্চা মুজাহিদ সেজে ইসলামের শিক্ষাকে বিদ্রুপ করছে। লাভ কি হচ্ছে তাতে? মানুষ কি তাদের ভয়ে পরিশুদ্ধ হচ্ছে? নাকি সবাই তাদের গোলাম হচ্ছে? চূড়ান্ত বিচারে এদের সবারই ফলাফল শূন্য। বাংলাদেশের

---

৯৮. মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬।

হিংসান্ধ নেতৃবৃন্দ কি এদেরই মত ইতিহাসের পাতায় কালো তালিকাভুক্ত হ'তে চান?

বিগত দিনে আল্লাহ্‌র গযবে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি সমৃদ্ধ জাতির কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তারা হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊন। তাদের সকলের ধ্বংসের কারণ ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও চরিত্রগত কারণ ছিল একটাই– দাম্ভিকতা। যার ফলে তারা সুন্দর পৃথিবীটাকে ফাসাদ ও বিশৃংখলায় তছনছ করে ফেলেছিল। ফলে নেমে এসেছিল চূড়ান্ত গযব। নূহের কওমকে সর্বব্যাপী প্লাবণে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল *(নূহ ৭১/২৫)*। পরবর্তী সমৃদ্ধ জাতি 'আদ-এর নেতারা বলেছিল, আমাদের চাইতে শক্তিধর জাতি আর কে আছে? *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। তারা অযথা সুউচ্চ টাওয়ার ও মযবুত প্রাসাদরাজি নির্মাণ করত। তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো *(শু'আরা ২৬/১২৮-৩০)*। অবশেষে নেমে এল ইলাহী প্রতিশোধ। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী প্রবল ঘূর্ণিবায়ু ও বজ্রাঘাতে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল *(হা-ক্কাহ ৬৯/৬-৮)*। 'আদ-এর পরবর্তী সমৃদ্ধ ছিল ছামূদ জাতি। তারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের ন'জন নেতার কারণে। সমাজে অনর্থ সৃষ্টি করাই ছিল তাদের কাজ *(নমল ২৭/৪৮)*। তারা তাদের নবী ছালেহকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, আল্লাহ্‌র গযব আনো দেখি, যার ভয় তুমি দেখাচ্ছ? *(আ'রাফ ৭/৭৭)*। তাদের তিন দিন তওবা করার অবকাশ দেওয়া হ'ল। কিন্তু তারা মানেনি। অবশেষে ৪র্থ দিন সকালে নেমে এল ভয়াবহ এক নিনাদ ও প্রবল ভূমিকম্প। যাতে নিমেষে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল *(হূদ ১১/৬৭-৬৮)*। লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊনের গযবের ইতিহাস আরও মর্মান্তিক। অতএব মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বড় কথা নয়, বরং সুখ-শান্তি বৃদ্ধিই বড় কথা। সুতরাং হে মানুষ! তওবা করে ফিরে এস আল্লাহ্‌র পথে। তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ২৪/৩১)*। আল্লাহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা কর-আমীন![৯৯]

---

৯৯. ১৮তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১৫।

অপসংস্কৃতি

২৭. নষ্ট সংস্কৃতি

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের আলোকে শারঈ নির্দেশনায় গড়ে ওঠা মানুষের সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচারকেই প্রকৃত অর্থে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। এর বাইরে সবকিছুই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার। এই অপসংস্কৃতি সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমনকি বলা চলে যে, জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশী দানা বেঁধে আছে। যার অনেকগুলি আমদানিকৃত, অনেকগুলি চাপানো এবং বাকীটা আমাদের কপোলকল্পিত। অথচ এগুলির কোনটাই সত্যিকারের সংস্কৃতি নয় বরং জাহেলিয়াত ও নষ্টামি। এগুলির সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। তবে কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। যেমন-

(১) ধর্মীয় সংস্কৃতি :

কোন শুভ কাজের শুরুতে মীলাদ। কেউ মারা গেলে মীলাদ, কুলখানি, চেহলাম। তাছাড়া বার্ষিক ভাগ্য রজনী হিসাবে শবেবরাত পালন, সুন্নাতে খাৎনা অনুষ্ঠান, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস ও ওফাত দিবসে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর আগের বুধবারে কিছুটা সুস্থতা লাভের তারিখে আখেরী চাহারশাম্বা পালন, বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানীর ওফাত দিবস ১১ রবীউল আখেরে ফাতেহায়ে ইয়াযদহম বা ১১ শরীফ পালন এবং এই সাথে বিভিন্ন পীর ও ধর্মীয় নেতার জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী বা ওরস পালন ইত্যাদি। ধর্মের নামে এগুলি চালু হ'লেও এগুলির পিছনে ধর্মের কোন সমর্থন নেই। যদিও অনেকে ভাবেন যে, এসব হ'ল ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। একইভাবে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানাদি, যা তাদের সংস্কৃতির অংশ বলে অভিহিত হয়।

(২) অর্থনৈতিক সংস্কৃতি :

নবান্ন উৎসব, পলান্ন উৎসব, বৃষ্টি আনার জন্য ব্যাঙের বিবাহ দান, কাদা মাখা অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

(৩) রাজনৈতিক সংস্কৃতি :

বিভিন্ন দিবস পালন, ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি, কবর, মিনার, বেদী, সৌধ নির্মাণ ও সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন, অফিসে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি টাঙানো, সঙ্গীত গেয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

(৪) আমদানীকৃত সংস্কৃতি :

যেমন আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন্স ডে, ৩১শে ডিসেম্বর 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' পালন, রাত্রি ১২-০১ মিনিটে দিনের সূচনা, নারীর ক্ষমতায়ন নীতি, নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ নীতি, আধুনিকতার নামে নানাবিধ ফ্যাশন ও নগ্ন সংস্কৃতির নীল দংশন এবং আকাশ সংস্কৃতির অবাধ ও হিংস্র আগ্রাসন।

(৫) চাপানো সংস্কৃতি :

জন্মদিনে কেক কাটা, মঙ্গলঘট বা মোমবাতি জ্বালিয়ে বা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, খেলা-ধূলার বাণিজ্যিক সংস্কৃতি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও নাচ-গানের সংস্কৃতি। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, পুলিশ ও সেনাবাহিনী, এমনকি নারীর স্বভাবধর্ম এবং তার স্বাস্থ্য ও মর্যাদার বরখেলাফ সকল কাজে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কর্মে ও পেশায় নিয়োগ দানের অমানবিক সংস্কৃতি। জাতিসংঘ ঘোষিত নানাবিধ সনদ বাস্তবায়ন ও দিবস পালনের সংস্কৃতি ইত্যাদি।

(৬) সামাজিক সংস্কৃতি :

বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ, বসন্তবরণ, জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ইত্যাদি। এগুলি সবই অপসংস্কৃতি।

নববর্ষ :

বাংলাদেশে ইংরেজী, বাংলা ও হিজরী তিনটি নববর্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজী বর্ষপঞ্জী হিসাবেই এদেশে সব কাজকর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু ১লা বৈশাখ উদযাপন করা হয় 'বাঙ্গালীর আবহমানকালের সার্বজনীন সংস্কৃতি' হিসাবে। যা একেবারেই অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী মহলের ও বস্তুবাদী নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের দূরদর্শী নীল নকশার অংশ মাত্র। স্বাধীনতা বিরোধী এজন্য যে, এরা এদিন বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে নানাবিধ মূর্তি ও মুখোশ বানিয়ে রাস্তায় মিছিলে নামে। যার মাধ্যমে তারা ভারতের মূর্তিপূজারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে এবং এপার বাংলা ওপার বাংলার মেল বন্ধনের জন্য গদগদ চিত্ত হয়ে বাগাড়ম্বর করে। ওরা কথিত বাঙ্গালী চেতনার বুলি কপচিয়ে ১৯৪৭ সালে বঙ্গমাতার ব্যবচ্ছেদকৃত দু'টি অঙ্গকে পুনরায় জোড়া লাগাতে চায়। নাস্তিক বস্তুবাদীদের কারসাজি এজন্য যে, এরা আদম (আঃ)-কে মানুষের আদি পিতা ও প্রথম নবী হিসাবে বিশ্বাস করে না। এরা মানুষকে পৃথক সৃষ্টি নয়, বরং বানরের বংশধর ও হনুমানের উদ্বর্তিত রূপ বলতে চায়। আর এগুলিকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোটি বছর পূর্বেকার কথিত নানা জীবজন্তুর ফসিল আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলতে চায়, এরাই ছিল মানুষের আদি পুরুষ। এরা মানবসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের বাণীকে অস্বীকার করে। এরা অতি চতুরতার সাথে বিভিন্ন শহরে 'গুহা মানব'-এর কৃত্রিম প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তরুণদের বুঝাতে চায় যে, তোমরা গুহাবাসী অসভ্য অমানুষ ছিলে। এখন শহরবাসী সভ্য মানুষ হয়েছ। ১লা বৈশাখে বানর, হনুমান, সাপ-পেঁচা ইত্যাদির মূর্তি ও মুখোশ বানিয়ে রাস্তা প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে ওরা এদেশের মানুষের ঈমানী চেতনা ভুলিয়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চেতনার অনুসারী বানাতে চায়।

আমরা এদেশেই গ্রামে জন্মেছি, এদেশেই বড় হয়েছি। হিন্দু-মুসলমান মিলিত যে গ্রাম ছোট বেলায় দেখেছি, সেই গ্রাম আজও দেখছি। নববর্ষ উদযাপন বা বৈশাখী মেলার নাম কখনো শুনিনি, দেখিনি বা আজও হয় না। আমরা জানতাম পূজা উপলক্ষ্যে 'মেলা' হিন্দুরা করে। সেখানে মুসলমানদের যেতে নেই। যদিও আমরা কখনো হিন্দুদের বৈশাখী মেলা করতে দেখিনি। ভাদ্রের

শেষ দিনে সাতক্ষীরার গুড়পুকুরের মেলায় বয়স্করা কেউ কিছু খরিদ করার জন্য গেলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে যেত। বাড়ী এসে ভয়ে মুখ খুলতো না। অথচ আমরা জন্ম থেকেই বাঙ্গলাভাষী, আজও বাংলাভাষী। কিন্তু সংস্কৃতিতে ছিলাম তখনও মুসলমান, এখনও মুসলমান। হিন্দুরা 'নমস্কার' দিত। আমরা 'আদাব' বলতাম। কিন্তু পাল্টা নমস্কার বলতাম না। তারা 'জল' খেত। আমরা 'পানি' খেতাম। ওরা শুকর পালন করত ও তার মাংস খেত, আমরা ছাগল-গরু পালতাম ও তার গোশত খেতাম। ওরা ধুতি পরত, আমরা লুঙ্গি-পায়জামা পরতাম। ওরা পৈতা গলায় দিত, মাথায় টিকি রাখত। আমরা টুপী পরতাম। ওরা বাবু, শ্রী বা শ্রীযুক্ত বলত। আমরা জনাব বা হযরত বলতাম। ওদের মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দিত ও হাতে শাখা পরত। ওদের বিয়েতে কত যে গান-বাজনা। আমাদের মধ্যে এসব ছিল না। তারা মাসী-পিসী, কাকা-কাকী, বাবা-মামা বলত। আমরা খালা-ফুফু, চাচা-চাচী, আব্বা-মামু বলতাম। তারা ভগবানকে ডাকত ও মূর্তিকে পূজা দিত। আমরা আল্লাহকে ডাকতাম ও মসজিদে সিজদা করতাম। তারা তাদের পূজার সময় ঢোল-বাদ্য বাজাত ও উলুধ্বনি করত। আমরা আমাদের ছালাতের সময় আযান দিতাম ও মসজিদে জামা'আতে যেতাম। তাদের সাথে আমাদের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। আজও আছে। আমরা উভয় সম্প্রদায় একই গ্রামে শত শত বছর ধরে বসবাস করছি পরস্পরে আত্মীয়ের মত। উভয় সম্প্রদায় বাংলা ভাষায় কথা বলি। কিন্তু আমাদের উভয়ের সংস্কৃতি পৃথক। এ পার্থক্যের ভিত্তি হ'ল আক্বীদা। আমাদের আক্বীদায় রয়েছে তাওহীদ। তাদের আক্বীদায় রয়েছে শিরক। দুই আক্বীদার ভিত্তিতে দুই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ফলে এই পার্থক্য ভাষায়, পোষাকে, সামাজিকতায় সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তাইতো দেখি মুশরিক কবি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গেয়েছেন, 'এসো হে বৈশাখ! দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো'। অথচ মুসলমানের আক্বীদামতে বৈশাখের কোন ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হাতে। অতএব বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলে পৃথক কোন সংস্কৃতির অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না। আজও নেই।

এরপরেও ১লা বৈশাখে নববর্ষ সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয়, তবে সংক্ষেপে সেটা এই যে, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ফসলী সনের ১ম দিন হিসাবে ১লা বৈশাখ থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা হয় সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.)

নির্দেশে তাঁর সিংহাসনারোহণের বছর ৯৬৩ হিজরীর ২রা রবীউল আখের মোতাবেক ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ শুক্রবার হ'তে। ফসলী সনের ১ম দিন হওয়ায় এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর হালখাতার দিন হওয়ায় শহরে-গ্রামে এ সময় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হ'ত। এ দিনটিতে দা, বটি, খোন্তা, কোদাল, লাঙ্গল, জোয়াল, গরুর গাড়ীর চাকা, কাঠের পিড়ে, চৌকি, মাটির হাড়ি-পাতিল, কাঁসার থালা-বাটি-জগ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মেলা বসত। ফলে এ দিনটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তারিখ হিসাবে উৎসবের চরিত্র ধারণ করত। এদিন কেউ অনৈতিক কাজ করত না। কাউকে কেউ কষ্ট দিত না। এর পিছনে কোন আক্বীদা বা সংস্কৃতি চেতনা কাজ করত না। বরং অর্থনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য। মোগলদের সাম্রাজ্য চলে যাবার পর বর্তমানে সে কারণ আর অবশিষ্ট নেই।

উল্লেখ্য যে, সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা নববর্ষ চালু হবার সময় বাংলাদেশে ছিল শকাব্দের ২য় মাস হিসাবে বৈশাখ মাস। কেননা শকাব্দের ১ম মাস হ'ল চৈত্র মাস। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি মাস গণনার সুবিধার্থে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস ৩০ দিনে বর্ষসূচী নির্ধারিত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা মেনে নেন। যা আজও চালু আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ মুসলিম সম্রাট দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় '৭১-এর স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছে। ফলে শকাব্দের চৈত্র মাস ৩১ দিনে হওয়ার কারণে তাদের পহেলা বৈশাখ আমাদের ১ দিন পরে হয়ে থাকে। অভিন্ন বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রবক্তারা এখন কী বলবেন?

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, বৈশাখী সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়েছে এখন আমাদের জাতীয় মাছ 'ইলিশ'। কথিত সংস্কৃতিসেবীরা এদিন 'ইলিশ-পান্তা' খেয়ে থাকেন। অথচ ইলিশের জাটকা বৃদ্ধির মওসুম হ'ল নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত। ইলিশ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। বাংলাদেশের জিডিপিতে অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ে এককভাবে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ। এ মাছ মানুষের রক্তের ক্ষতিকর কোলেষ্টেরল-এর মাত্রা কমায়। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এ ধরনের একটি মহামূল্যবান মাছকে নির্মূল করার মিশনে নামেন উভয় বাংলার

কথিত বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারক সুশীল সমাজভুক্ত একদল বর্ণচোরা লোক। এরা হাযার হাযার টাকা খরচ করে এদিন 'ইলিশ-পান্তা' খাওয়ার বিলাসিতায় নামেন। যা পহেলা বৈশাখ উদযাপনের নামে 'নূন আনতে পান্তা ফুরায়' যাদের, তাদের সাথে নিষ্ঠুর রসিকতার শামিল। ওদিকে আরেকদল তরুণকে সারা গায়ে কালি মাখিয়ে ও কালি মাখান চট মুড়ি দিয়ে ভূত সাজিয়ে রাস্তায় চাঁদাবাজিতে নামিয়ে দেওয়া হয় এটা বুঝানোর জন্য যে, হে সভ্য পথিকেরা! তোমরা তোমাদের বুনো ও নগ্ন আদি পিতাদের কথা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ সেই বিবর্তনবাদী নাস্তিক্যবাদী দর্শনের প্রতি আহ্বান। অতএব এইসব নষ্ট সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে জাতি যত দ্রুত মুক্তি পাবে, ততই মঙ্গল।

আল্লাহ বলেন, 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন হ'ল রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা করো না। বরং সেই আল্লাহকে সিজদা করো, যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি..' *(তওবা ৯/৩৬)*। অর্থাৎ বর্ষ পরিক্রমা ও ঋতুবৈচিত্র্য আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে। সবকিছু তাঁর সৃষ্টি ও পালনের মহাপরিকল্পনারই অংশ। প্রতিটি সূর্যোদয়ের সাথে নতুন দিনের আগমন ঘটে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মাধ্যমে মৃত্যু থেকে নবজীবন পেয়ে আমরা আল্লাহ্র নামে নতুন দিনের কর্মসূচী শুরু করি। তাই প্রতিটি দিন আমাদের কাছে নতুন দিন এবং প্রতিটি রাত্রি আমাদের কাছে বিদায়ের ঘণ্টা ধ্বনি। আল্লাহ নির্ধারিত দিবস বা রাত্রি ব্যতীত অন্য কোন দিবস বা রাত্রি আমাদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার দাবী রাখে না। শুভ ও অশুভ বলে কোন দিন বা রাত্রি নেই। আল্লাহ বলেন, তোমরা কাল-কে গালি দিয়ো না, আমিই কালের স্রষ্টা। আমিই দিন ও রাতের আবর্তন-বিবর্তন ঘটিয়ে থাকি'।[১০০] অতএব কোন দিবসকে নয়, বরং দিবসের মালিক আল্লাহকে মেনে চলা ও তাঁর প্রেরিত বিধানকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র বাস্তবায়িত করার কামনাই হৌক আমাদের প্রতিদিনের সর্বোত্তম কামনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১০১]

---

১০০. বুখারী হা/৪৮২৬; মুসলিম হা/২২৪৬; মিশকাত হা/২২।
১০১. ১৪তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০১১।

২৮. বড় দিন

‘শুভ বড় দিন মানে ঈসা মসীহের শুভ জন্মদিন। ঈসা মসীহের জন্ম এইভাবে হয়েছিল। ইউসুফের সঙ্গে ঈসার মা মারিয়ামের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তারা একসঙ্গে বসবাস করবার আগেই পাক রূহের শক্তিতে মারিয়াম গর্ভবতী হয়েছিলেন। মারিয়ামের স্বামী সৎ লোক ছিলেন... *(মথি ১/১৮-২৫)*। আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন। যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে, সে বিনষ্ট না হয়। কিন্তু অনন্ত জীবন পায়’ *(ইউহান্না ৩/১৬)*।

উপরের বক্তব্যগুলি খ্রিষ্টানদের ঢাকা কেন্দ্র (বিবিএস) থেকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির অংশ বিশেষ। পুরা বিজ্ঞপ্তিটি বিভিন্ন অসঙ্গতি ও কল্পকথায় ভরা। লক্ষ্যণীয় যে, তারা এখন ‘যীশুখ্রিষ্ট’ বলছে না। বরং মুসলমানদের কাছাকাছি হবার জন্য ‘ঈসা মসীহ’ বলছে। তাদের ব্যাপক প্রচারের ফলে বাংলাদেশে বহু হিন্দু-মুসলমান ও উপজাতীয়রা খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এখন সারা দেশকে তারা ৭টি ধর্মপ্রদেশে ভাগ করে প্রতি প্রদেশে একজন বিশপ হিসাবে মোট ৮জন বিশপ নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কাজ চালাচ্ছে। প্রদেশগুলি হল : ঢাকা (১৮৮৬), দিনাজপুর (১৯২৭), খুলনা (১৯৫২), চট্টগ্রাম (১৯৭২), ময়মনসিংহ (১৯৮৭), রাজশাহী (১৯৯০), সিলেট (২০১১)। আগে যেখানে আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড থেকে বিশপ আনা হ’ত, এখন সেখানে সব বিশপই বাংলাদেশী। তারা দেশে বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে এবং বিশেষ করে মানুষের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ও পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করছে ও এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে। পরাশক্তির সমর্থন আছে বিধায় সরকারও সর্বদা এদের ব্যাপারে দুর্বল। এদের উৎসবগুলিতে সরকারের মন্ত্রীদের অতি উৎসাহ দেখলে বিস্মিত হ’তে হয়। এবারের বড়দিনে একজন সদ্যনিযুক্ত মুসলমান মন্ত্রী বলেই ফেলেছেন, ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’। কি চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষতা! অথচ সকলে ভালভাবেই জানেন যে, ইহূদী-খ্রিষ্টানরা

যেদেশেই প্রভাব বিস্তার করেছে, সে দেশই পরাশক্তির করতলগত হয়েছে। যার বাস্তব উদাহরণ বৃটিশ-ভারত উপমহাদেশ এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব তিমূর ও সূদান থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ সূদান। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'খ্রিষ্টরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পায়তারা চলছে বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ। এরা এক সময় বণিকের বেশে এসে সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করে বাংলার রাজদণ্ড হাতে নিয়েছিল। আজ তারা ধর্মের মুখোশ পরে এসেছে। তাই সরকার যদি সাবধান না হয়, তাহ'লে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা হবে। অতএব এদের থেকে সাবধান!

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের বিজ্ঞপ্তিতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেটাই কি সত্য, না কুরআনের বাণী সত্য? যদি কুরআনের বাণী সত্য হয়, তাহ'লে যেসব মুসলিম মালিকানাধীন পত্রিকা ও মিডিয়া টাকার লোভে এদের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি সমূহ প্রচার করছে, তারা কি আল্লাহ্র কাছে দায়ী হবে না? যেসব নেতা এদের অনুষ্ঠানে যোগদানে উৎসাহবোধ করেন এবং সকল ধর্মকে সমান গণ্য করেন, তারা সম্ভবতঃ ইসলাম ও অন্যধর্ম কোন সম্পর্কেই সঠিক জ্ঞান রাখেন না। আমরা এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সকলের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিতে চাই যে, কুরআন আগমনের পর পৃথিবীতে বিগত সকল ইলাহী গ্রন্থের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তওরাত, যবূর, ইনজীল বলে যা কিছু চালানো হচ্ছে, সবকিছুই বাতিল ও বিকৃত। 'ইহূদী-নাছারা ধর্মনেতারা নিজেরা এগুলো মনমত লিখে আল্লাহ্র কেতাব বলে চালিয়ে দিয়েছে দু'পয়সা রোজগারের আশায়' *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*। পক্ষান্তরে কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*। তাই তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এখন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ইলাহী কিতাব হ'ল আল-কুরআন। 'যা মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক, সুপথের ব্যাখ্যাতা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। আর একমাত্র নবী হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার আগমন বার্তা বিগত সকল নবীসহ হযরত ঈসা (আঃ) নিজেই দিয়ে গেছেন *(ছফ ৬১/৬)*। সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন বিশ্বনবী। তিনি সৃষ্টিজগতের নবী, জিন ও ইনসানের নবী এবং তাঁর পরে আর

কোন নবী আসবেন না'।[১০২] এখন যদি মূসা (আঃ) বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁকেও ইসলামের অনুসরণ ব্যতীত উপায় থাকতো না।[১০৩] ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, তখন তিনি ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসন কায়েম করবেন।[১০৪] ইহূদী শত্রুদের ও শাসকদের হত্যা চক্রান্ত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*। 'তার অনুসারীদের পাপের বোঝার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন' বলে খ্রিষ্টানরা যে অপপ্রচার করে থাকে, তা স্রেফ ধোঁকা ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এজন্যেই কি তাহ'লে খ্রিষ্টান পরাশক্তিগুলো সারা বিশ্বে সশস্ত্র সন্ত্রাস চালিয়ে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা করছে ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে বিশ্বকে ভ্যামপায়ারের মত শোষণ করে চলেছে? নিজেরা পাপ করে তার বোঝা নির্দোষ ঈসা (আঃ)-এর উপরে চাপিয়ে দেবার এই ধর্মীয় দাবী কি স্রেফ অপবাদ ও ভণ্ডামি নয়? আল্লাহ বলেন, 'তারা তাকে হত্যা করেনি, শূলেও দেয়নি, বরং তাদের জন্য (অন্যকে) সদৃশ বানানো হয়েছিল। যারা এতে মতভেদ করেছিল, তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত ছিল। এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই কেবল ধারণা ব্যতীত। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি'। 'বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে (আসমানে) উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৫৭-৫৮)*।

খ্রিষ্টানদের প্রচারপত্রে মারিয়ামের যে স্বামীর কথা বলা হয়েছে, তা ডাহা মিথ্যা। কেননা কুরআনে ও হাদীছে সর্বত্র ঈসাকে 'মারিয়ামপুত্র' বলা হয়েছে। স্বামী থাকলে ঈসাকে তাঁর পিতার দিকেই সম্বন্ধ করা হ'ত। আল্লাহ বলেন, ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত'... *(আলে ইমরান ৩/৫৯)*। আদমকে যেমন আল্লাহ পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই কেবল মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।[১০৫]

---

১০২. সাবা ২৮; বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫, ৪৭, ৪৮, ৭৩।
১০৩. বায়হাক্বী, শু'আব হা/১৭৬; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯।
১০৪. মুসলিম হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫, ৫৫০৬-০৭।
১০৫. ঈসার জন্ম ইতিহাস জানার জন্য সূরা মারিয়াম ১৬-৩৬ আয়াতগুলি পাঠ করুন।

প্রচারপত্রে ঈসা (আঃ)-কে ‘ইবনুল্লাহ’ (আল্লাহ্র বেটা) বলা হয়েছে। একথা তারা আগেও বলত *(তওবাহ ৯/৩০)*। এমনকি ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানরা তাঁকে সরাসরি আল্লাহ সাব্যস্ত করে বলেছে, ‘তিনি তিন আল্লাহ্র একজন’ *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*। তারা এটাকে ‘বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলেছে। অথচ এরূপ ধারণা পোষণ কারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ‘কাফের’ বলেছেন এবং এদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন’ *(মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)*। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ্র জন্য এটি শোভনীয় নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। (এসব থেকে) তিনি পবিত্র। (বরং) তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়’ *(মারিয়াম ১৯/৩৫)*।

বর্তমান পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ’ল ইসলাম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। ‘আর যে ব্যক্তি ‘ইসলাম’ ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। এই দ্বীন ‘স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন’।[১০৬] ‘এই দ্বীন সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। এর বিধানসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই’ *(আন‘আম ৬/১১৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত তার কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক পৃথিবীর যে কেউ আমার আবির্ভাবের খবর শুনেছে, অথচ আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার উপর ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে’।[১০৭] ছালাতের প্রতি রাক‘আতে সূরা ফাতিহার শেষে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট বলতে ইহূদী ও নাছারাদের বুঝানো হয়েছে, যাদের পথে না চলার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা হয় *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*। অথচ আমরা তাদের পথেই চলছি। তাদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না...’ *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

---

১০৬. আহমাদ হা/১৫১৯৫; বায়হাক্বী, শু‘আব হা/১৭৬; মিশকাত হা/১৭৭।
১০৭. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

Contents

২৫শে ডিসেম্বরকে ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিবস হিসাবে পালন করার পিছনে কোন প্রমাণ নেই, কেবল ধারণা ব্যতীত। কেননা কুরআনের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, ওটা ছিল খেজুর পাকার মৌসুম। সেখানে মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয় *(মারিয়াম ১৯/২৫)*। আর খেজুর পাকে গ্রীষ্মকালে, ডিসেম্বরের কঠিন শীতকালে নয়।

পরিশেষে বলব, ইহূদীরা হ'ল ঈসা (আঃ)-এর জাতশত্রু এবং খ্রিষ্টানরা তাঁর কপট অনুসারী। ঈমানদার ঈসায়ীগণ শুরুতেই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং আজও ঈমানদার ইহূদী ও নাছারাগণ ইসলাম কবুল করে ধন্য হবেন। এর মাধ্যমে তারা দ্বিগুণ নেকীর অধিকারী হবেন' *(ক্বাছাছ ২৮/৫২-৫৪)*। খাঁটি মুসলমানেরাই ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত তাওহীদের প্রকৃত অনুসারী। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র নবী এবং ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম। তাই সকল অমুসলিমকে আমরা ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে দ্রুত 'মুসলিম' হওয়ার আহ্বান জানাই। ইসলাম ও কুফর কখনোই এক নয়। তাই কোন মুসলিম 'মুরতাদ' হ'লে অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করলে এবং তওবা করে ফিরে না এলে তার একমাত্র শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড।[১০৮] পক্ষান্তরে কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করলে তার নেকী হ'ল দ্বিগুণ। অতএব সরকারের উচিৎ কুফরকে উৎসাহিত না করা এবং অমুসলিমরা যাতে ইসলাম কবুল করে পরকালে মুক্তি লাভের পথ খুঁজে পায়, সেজন্য সর্বতোভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ও সহযোগিতা করা। দ্বীনদার ধনিক শ্রেণীর প্রতিও আমরা একই আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![১০৯]

১০৮. বুখারী হা/৩০১৭; মিশকাত হা/৩৫৩৩।
১০৯. ১৫তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১২।

সামাজিক

২৯. সমঝোতা ও শান্তি

সমঝোতা ও শান্তি ব্যতীত সমাজ এগোতে পারে না। কিন্তু সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় দেশ এখন অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। এরপরেও সমঝোতা থাকতেই হবে। প্রধানতঃ সমাজনেতা ও ধর্মনেতাদের পদস্খলনেই সমাজে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে। আর এই দুই শ্রেণী যদি প্রকৃত আল্লাহভীরু হয়, তাহ'লে সমাজে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়। তাই দেশের রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমঝোতা কায়েম হওয়া সর্বাগ্রে যরূরী। আমরা এ দু'টি ক্ষেত্রে সমঝোতা বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা রাখতে চাই।-

(১) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে :

(ক) সকলের মূল লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ। অতএব হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, গাড়ী ভাংচুর ইত্যাদি বন্ধের ব্যাপারে একমত হ'তে হবে। কেননা এতে কোন জনকল্যাণ নেই। আছে কেবলি ক্ষতি ও জনদুর্ভোগ। তাই যেকোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকেই সবচেয়ে বেশী নমনীয় হ'তে হবে। প্রয়োজনে সকল দল ও মতের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ নিতে হবে। যেন সরকারী সিদ্ধান্তের পক্ষে সর্বাধিক জনমত ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে। সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, তারা কোন দলের মুখপাত্র নন, বরং দেশের আপামর জনগণের মুখপাত্র। তাদেরকে অবশ্যই নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। কোনপ্রকার যিদ ও হঠকারিতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। হিংসা ও প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা ও মহত্ত্ব দিয়ে অন্যকে জয় করতে হবে। পারস্পরিক আলোচনা ব্যর্থ হ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে এবং শারঈ সিদ্ধান্তের সম্মুখে সকলকে মাথা নত করতে হবে। কেননা আল্লাহ্র বিধান দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণময়। অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় রীতিনীতি এর বাইরে থাকবে। কিন্তু ইসলামের বৈষয়িক বিধান সমূহ সবাইকে মেনে নিতে হবে। তাতে সকলের সমভাবে কল্যাণ হবে। যেমন সূদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি

বাতিল করে ইনছাফ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে। এতে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হবে এবং ধনী-গরীবের বৈষম্য কমে যাবে। ইসলামের ফৌজদারী আইন সমূহ চালু করতে হবে। তাতে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, মদ, জুয়া, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বন্ধ হবে। ইসলামের বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাতে অমানবিক ৫৪ ধারা ও মেয়াদহীন হাজতী প্রথার অপপ্রয়োগ বন্ধ হবে এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা থাকবে না।

(খ) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এ প্রশ্নে সকলকে আপোষহীন ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ বলে জনগণকে বিভক্ত করা যাবে না। দেশ বাঁচলে সবাই বাঁচবে। দেশের শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। যারা আমাদের দেশকে মরুভূমি বানিয়েছে, পাহাড় সম বাণিজ্য বৈষম্য ও চোরাচালানীর মাধ্যমে যারা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে, যারা আমাদের ভূমি ও পানি সীমায় নিয়মিত আগ্রাসন চালাচ্ছে ও দেশকে মরুভূমি বানাচ্ছে, যারা ধর্ম প্রচারের মুখোশে এদেশের মানুষকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছে ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যারা দেশের কয়লা ও তৈল-গ্যাস লুট করতে আসছে, যারা এদেশকে তাদের হুকুম-বরদার বানাতে চায়, ঐসব বিদেশী শক্তির ব্যাপারে সকল দলকে একমত থাকতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে সমতা ভিত্তিক বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কাউকে প্রভু মেনে নেওয়া যাবে না এবং তাদের ইন্ধনে ও তাদের স্বার্থে গণতন্ত্রের নামে দলাদলি ও হানাহানি করে সমাজ ধ্বংস করা চলবে না। মোটকথা বাঁচার পথ কেবল একটাই খোলা আছে। আর তাহ'ল, মানুষ নয়, আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিতে হবে। তাঁর বিধান ও হুকুমের সামনে সবাইকে মাথা নত করতে হবে। আল্লাহ প্রেরিত রজ্জু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরতে হবে। আব্দুল্লাহদের উপরে হাবলুল্লাহকে স্থান দিতে হবে। দূর অতীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরবদের মধ্যে ৬০, ৮০, ১২০ বছর যুদ্ধ চলেছে। মরেছে মানুষ শত শত। অবশেষে তা বন্ধ হয়েছে ইসলাম আসার পরে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করার ফলে। আজও তা সম্ভব একই পথে, একই নিয়মে।

(২) ধর্মীয় ক্ষেত্রে :

(১) যেসব বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, সেসব বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ চলবে না। যেমন (ক) আল্লাহ্র নিজস্ব আকার আছে যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী। 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই' *(শূরা ৪২/১১, ইখলাছ ১১২/৪)*। 'তিনি আরশে সমুন্নীত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। অতএব যত কল্লা তত আল্লাহ, সকল সৃষ্টিই স্রষ্টার অংশ, তিনি নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান ইত্যাদি শিরকী আক্বীদা পোষণ করা যাবে না। (খ) রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন *(কাহফ ১৮/১১০)*। তিনি নূরের নবী, তিনি মীলাদের মজলিস সমূহে হাযির হন ইত্যাদি শিরকী আক্বীদা ছাড়তে হবে। (গ) মৃত মানুষকে কিছু শুনানো যায় না *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। তিনি জীবিত মানুষের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন না *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*। কুরআনের এইসব স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরেও কবরপূজার পিছনে বা শহীদ মিনারের পিছনে দৌড়ানো যাবে না।

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় যেটা দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল না বা ছহীহ হাদীছে যার কোন ভিত্তি নেই, এমন কোন বস্তু দ্বীনের নামে চালু করা যাবে না। যেমন কথিত ঈদে মীলাদুন্নবী, শবেবরাত, কুলখানি, চেহলাম, আশূরার তা'যিয়া মিছিল, ওরস, ঈছালে ছওয়াব, এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করা ও তার প্রতিক্রিয়ায় হিল্লা প্রথা জায়েয করা ইত্যাদি।

(৩) কোন ব্যাপারে শরী'আতে হুকুম না থাকলে তা ছেড়ে দেওয়া। যেমন প্রচলিত চার মাযহাব মান্য করাকে ফরয মনে করা, ছালাতের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা, ঈদের ছালাতে ছয় তাকবীর দেওয়া, এক গরুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিই করা, খাজনার জমিতে ওশর না দেওয়া, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা, ছালাত শেষে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা ইত্যাদি।

(৪) কোন ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ পেলে তা গ্রহণ করা এবং যঈফ হাদীছের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া। যেমন ছালাতে নাভির নীচে হাত বাঁধা, রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা, জেহরী ছালাতে সশব্দে আমীন না বলা, ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া ইত্যাদি। কেননা মুজতাহিদ ইমামগণ সকলেই বলে গেছেন, 'যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব' *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩)*।

(৫) শরী'আতের কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত যিদ বা মাযহাবী সংকীর্ণতা না রাখা এবং আত্ম অহংকারে লিপ্ত না হওয়া। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, শেষোক্তটাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর'।[১১০]

(৬) সমাজে ভুল কিছু চালু থাকলে তা সংস্কারের জন্য চরমপন্থী না হওয়া। বরং মানুষকে সহানুভূতির সাথে বুঝিয়ে উত্তম পন্থায় সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করা *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

(৭) কোন বিষয়ে ব্যাখ্যাগত মতভেদ দেখা দিলে ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। এ ব্যাপারে রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তুমি ওটা চুপে চুপে পড়'।[১১১] অমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় এক গরুতে সাত ভাগা কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না।

(৮) এর পরেও যদি কোন মতভেদ থাকে এবং সেখানে ঈমান ও কুফরের মত বিষয় না থাকে, তাহ'লে সেজন্য পরস্পরে সহনশীল থেকে মিলেমিশে কাজ করবে। ইনশাআল্লাহ এ পথেই ধর্মীয় বিভক্তি দূর হবে এবং সমাজে শান্তি ও সংহতি কায়েম হবে।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দৌড়ে এসো তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যপ্ত। যা কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে'। 'যারা (১) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় (২) যারা ক্রোধ দমন করে (৩) মানুষকে ক্ষমা করে...' (৪) 'যারা অশ্লীল কাজ করলে বা নিজের উপর যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং (৫) জেনেশুনে নিজের অন্যায় কাজের উপর যিদ করে না। তাদের জন্যই রয়েছে পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও জান্নাত...' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-৩৬)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১১২]

---

১১০. বায়হাক্বী, শু'আব হা/৭২৫২; মিশকাত হা/৫১২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬০৭।

১১১. মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩।

১১২. ১৪তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০।

৩০. প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত নারী নীতি সমূহে জোরালো সমর্থন ও ভূমিকা রাখতে শুরু করে। অতঃপর ডিসেম্বর ১৯৭৯-তে জাতিসংঘে ‘নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ‘সিডো’ (CEDAW- Convention on elemination of all forms of discrimination against women) গৃহীত হয়। এ সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের অন্যতম হ’ল বাংলাদেশ। এই সিডো-কে বলা হয় কুরআন ও ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি ‘নীরব টাইম বোমা’। ফলে বিগত কোন সরকারই এ সনদ বাস্তবায়নে সাহস করেনি। অথচ গত ৭ই মার্চ ’১১ মন্ত্রীসভা এটি হুবহু অনুমোদন করে। পরদিন সরকারী সংবাদ সংস্থা (বাসস) পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, ভূমি সহ সম্পদ, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারে নারীর সমানাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। এতে আলেম সমাজ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তিনদিন ধরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বসে ঘষামাজা করে অবশেষে ২৫(২) ধারায় বলা হয়, ‘উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা’। ২৩(৫) ধারায় বলা হয়, সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেওয়া। ১৭(৫) ধারায় বলা হয়, স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা। ১৭(৩) ধারায় বলা হয়, নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা’। অতঃপর ১৭(২) ধারায় গিয়ে আসল কথা ফাঁস করে দিয়ে বলা হয়, ‘নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো)-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা’। ফলে জাতিসংঘ ঘোষিত এই ‘সিডো’ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে দেশের সংবিধান, আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি সবই বদল হ’তে পারে।

একই সময় ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেম্স মারিয়ার্টি সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার তাকীদ দিয়ে বক্তব্য দেন।[১১৩] অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বললেন, আওয়ামী লীগ কখনোই কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, যাদের পুত্র সন্তান নেই তাদের মেয়েরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারে না। ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা সেসব সম্পত্তি দখল করে নেয়' (তাঁর এ বক্তব্য একেবারেই অজ্ঞতা প্রসূত)। তিনি বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ভালোভাবে পড়ে আপনারা বলুন কোথায় কোরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী কথা আছে'। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী পিতা-মাতার সম্পত্তি যাতে তাদের স্ত্রী-কন্যারা পেতে পারেন, সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।[১১৪] উক্ত আহ্বানের জওয়াবে সরকার সমর্থিত ৬ দলীয় ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে আইনমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে একচোট নিয়ে বলেন, আসলে সরকারের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা মহল বিশেষ সরকারকে বিতর্কিত করার হীন মানসিকতা নিয়ে রাজপথ উত্তপ্ত করার সুযোগ করে দিচ্ছে'।[১১৫]

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও মহাজোট ঘোষিত কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন না করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি একদিকে এবং সরকারের পিছনে অদৃশ্য থিংকট্যাংক-এর কর্মনীতি ঠিক তার বিপরীত দিকে ধাবিত হয়েছে। পিছনের সেই অপশক্তি কারা, সেটা বুঝতে কারু বাকী থাকার কথা নয়। যারা হত-দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত অগণিত নারীর দুঃখ-বেদনা দূর করার চেষ্টা বাদ দিয়ে সরকারকে ঈমানদার জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার চক্রান্ত করছে।

প্রায় দেড় শতাধিক উপধারা সহ ৪৯টি ধারা সম্বলিত প্রস্তাবিত বিশালদেহী নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে এক লাইনে ব্যক্ত করা যায়। যেটি বাংলাদেশ

---

১১৩. ১৫ই মার্চ'১১, ইনকিলাব ১/৪ কলাম।
১১৪. ২৩শে মার্চ'১১, ইনকিলাব ১/৭ কলাম।
১১৫. ১৫ই মার্চ'১১, ইনকিলাব ২/৫ কলাম।

সংবিধানের ২৮ (২) ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'। সাথে সাথে সংবিধানের ৪১ (১-ক) ধারায় বলা হয়েছে 'প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার ভোগ করার দিক দিয়ে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার সমান। সাথে সাথে যে নারী যে ধর্মের অনুসারী, সেই ধর্ম অনুযায়ী সে তার জীবন পরিচালনা করবে। সংবিধানে এরূপ স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরেও নতুন করে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই একটা আছে। যেটা কোন সাধু উদ্দেশ্য নয়। বরং জাতিসংঘে গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষ সনদ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা এবং এ দেশের অধিকাংশ নাগরিকের অনুসৃত ইসলামী সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে তছনছ করা। অতঃপর এ দেশে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা পূর্ণ করা। চাতুর্যপূর্ণ কথামালার ফাঁদে আটকিয়ে তারা জনগণকে বোকা বানাতে চান। সেই সাথে তারা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীদের ন্যায় এদেশের ধর্মপ্রাণ নারী সমাজকে স্রেফ ভোগ্যপণ্যে পরিণত করতে চান।

জাতিসংঘে গৃহীত 'নারীর প্রতি যাবতীয় বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডো) অমুসলিমদের জন্য এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যের নগ্নতাবাদীদের জন্য প্রযোজ্য হ'তে পারে। কেননা ঐসব দেশের অধিকাংশ নারী যত্রতত্র নির্যাতিত হয় এবং তার ফলে সেদেশের অধিকাংশ নাগরিক পিতৃ পরিচয়হীন। এজন্য নারী যেহেতু দুর্বল এবং সন্তান যেহেতু তারাই গর্ভে ধারণ করেন, তাই পরিবারের বন্ধন, সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শহীন এইসব অসহায় নারীদের প্রতি 'বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডো) প্রয়োজন। মুসলিম সমাজে এরূপ সনদের কোন প্রয়োজন নেই। যেসব দেশে এ সনদ বাস্তবায়িত হয়েছে, সেসব দেশের নারীরা এর দ্বারা কতটুকু কল্যাণ লাভ করেছে? খোদ জাতিসংঘেরই নারী কর্মকর্তারা তাদের সহকর্মী পুরুষ কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়মিত ধর্ষিতা হন বলে পত্র-পত্রিকায় সম্প্রতি রিপোর্ট বের হয়েছে। ইরাকে দখলদার আমেরিকান নারী সৈন্যদের শতকরা ৯০ জন (বরং সকলেই) তাদের পুরুষ সৈন্যদের দ্বারা নিয়মিত ধর্ষিতা হন। এমনকি তারা আত্মরক্ষার জন্য গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে টয়লেটে যান। সম্ভবতঃ ঐসব দেশে ব্যভিচার ও নারী নির্যাতন

কোন অপরাধই নয়। কিন্তু আমাদের দেশে পরনারীর দিকে কপট উদ্দেশ্যে চোখ তুলে তাকানো অমার্জনীয় অপরাধ। তাই ইসলামী সমাজে পর্দানশীন নারীরা যত বেশী নিরাপদ, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে তার কল্পনাও করা যায় না। আর সে কারণেই তারা 'সিডো' রচনা করেছে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। যদিও তাতে তারা বাঁচতে পারেনি। বরং দিন দিন তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষিতা মহিলারা এখন দলে দলে ইসলাম কবুল করছেন। এমনকি সদ্য সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা খ্যাতনাম্নী মহিলা সাংবাদিক 'লোরেন বুথ' সম্প্রতি মুসলমান হয়েছেন ও সাথে সাথে হিজাব পরিধান করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে শান্তিময় জীবন শুরু করেছেন। জাতিসংঘের গৃহীত 'নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ' তাদের জীবনে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি।

আল্লাহ প্রেরিত এলাহী ধর্মগুলি ব্যতীত বিগত যুগে পৃথিবীর কোন সমাজে নারীর কোন সম্মানজনক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই সেদিনও ভারতে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং যুবতী বিধবাকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হাত-পা বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে উলুধ্বনি দিয়ে বলা হ'ত, ঐ যে সতী নারী স্বর্গে চলে গেল। আজও সেদেশে পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। আর তাই বিয়ের সময় কন্যাকে যত সম্ভব যৌতুক দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়। বিকৃত ইহূদী ও খ্রিষ্টধর্মে নারীকে 'সকল পাপের উৎস' গণ্য করা হয় এবং তারা নারীকে Necessary evil অর্থাৎ 'আবশ্যকীয় পাপ' বলে তাদের বিবাহের অনুমতি দেয়। তারা নারীকে 'দোযখের দরজা' বলে এবং তাদেরকে 'পৃথিবীর সকল অশান্তির কারণ' বলে মনে করে। সেজন্যে তারা বলে 'যে ব্যক্তি কন্যাকে বিয়ে দেয় না, সেই-ই উত্তম কাজ করে'। খ্রিষ্টান সমাজে 'নারীকে পুরুষের সম্পত্তি' মনে করা হয়। তাই সেখানে 'নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকার এককভাবে পুরুষের হাতে'। তাই বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) তার Subjection of Woman নামক প্রবন্ধে বলেছেন, আমাদেরকে বারবার বলা হয় যে, সভ্যতা ও খ্রিষ্টবাদ নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ আমরা দেখি, তারা স্বামীর সেবাদাসী ছাড়া কিছুই নয়। অন্তত আইনের চোখে

তারা ক্রীতদাসীই বটে'। এখন পাশ্চাত্যে বিবাহ-পূর্ব মিলন, বিবাহ-পরবর্তী মিলন, বিবাহ ছাড়াই লিভ টুগেদার, কুমারী মাতা, সমকামিতা ইত্যাদি নোংরা প্রথা সমূহ চালু হয়েছে। এমনকি ঐসব দেশে প্রতি মিনিটে কয়জন নারী ধর্ষিতা হয়, তারও রিপোর্ট বের হচ্ছে। জাহেলী আরবেও কমবেশী অনুরূপ অবস্থা কিছু কিছু লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। নারীরা পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ত না। ইসলাম আসার পরে সবকিছুর অবসান ঘটে এবং নারীরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাদের মানবিক অধিকার ফিরে পায়। যা বিগত ও আধুনিক কোন সভ্যতাই তাদেরকে দেয়নি।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন :

ইসলামী পারিবারিক বিধানে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পোষাক সদৃশ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। তারা একে অপরের পরিপূরক এবং কেউ কারু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইসলামী পরিবারে 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত'।[১১৬] 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি'।[১১৭] 'রক্তের সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত'। যে তা দৃঢ় রাখে, আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যে তা ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেন' এবং 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১১৮] 'স্ত্রীর নিকটে স্বামী সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র[১১৯] এবং 'ঐ স্বামীই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম'।[১২০] 'কন্যা সন্তানের প্রতি উত্তম আচরণ তার পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ'।[১২১] ইসলামী পরিবারে নারী এবং তার সন্তানাদি ও পরিবারের ভরণপোষণ সহ যাবতীয় বাইরের দায়-দায়িত্ব পুরুষের। পক্ষান্তরে নারী হ'ল গৃহকর্ত্রী। সন্তান পালন ও সংসার গোছানো তার প্রধান দায়িত্ব। সংসারে একজন নারী তার পিতার স্নেহ, ভাইয়ের ভালোবাসা, স্বামীর প্রেম ও সন্তানের শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ। কমপক্ষে উপরোক্ত চারজন পুরুষের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে একজন নারী সর্বদা নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে।

---

১১৬. আহমাদ হা/১৫৫৭৭; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।
১১৭. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭।
১১৮. বুখারী হা/৫৯৮৮, ৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৫-৫৬ ; মিশকাত হা/৪৯২১-২২।
১১৯. তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫।
১২০. তিরমিযী হা/১১৬২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৭৬; মিশকাত হা/৩২৬৪।
১২১. বুখারী হা/১৪১৮; মুসলিম হা/২৬২৯; মিশকাত হা/৪৯৪৯।

কেবল হৃদয়ের বন্ধনে নয়, বরং অর্থনৈতিক বন্ধনেও তারা আবদ্ধ। এজন্য ইসলাম নারীকে তার পিতা, ভাই, স্বামী ও সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রদান করেছে। এভাবে একটি মুসলিম পরিবার পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন একটি দেহের রূপ ধারণ করে। তাই উত্তরাধিকার বণ্টনে ইসলাম অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে এবং নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ বলেন, 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ রয়েছে... এবং নারীদের অংশ রয়েছে, কম হৌক বা বেশী হৌক একটি নির্ধারিত অংশ' *(নিসা ৪/৭)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ এই বিধান দিচ্ছেন যে, একজন পুত্রের অংশ দু'জন কন্যার সমান হবে। যদি কন্যার সংখ্যা দু'য়ের অধিক হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মাত্র একটি কন্যা সন্তান থাকে, তাহ'লে সে অর্ধেক পাবে... মৃতের ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণ করার পরে' *(নিসা ৪/১১)*। মৃতের স্ত্রী-কন্যারা তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ ব্যতীত উদ্বৃত্ত সব সম্পত্তির মালিক কখনোই হবেন না, যতক্ষণ মৃতের অন্য কোন নিকটাত্মীয় বা 'আছাবাহ থাকেন। যদি কেউ না থাকেন, তখনই কেবল উদ্বৃত্ত সম্পত্তির সবটা কন্যা পাবেন 'রদ'-এর বিধান অনুযায়ী। কিন্তু স্ত্রী বা স্বামী পাবেন না। এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা হবে। অথবা জনকল্যাণে দান করে দিবে। ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিতে মীরাছ লাভের ভিত্তি হ'ল রক্ত সম্পর্কীয় হওয়া *(আনফাল ৮/৭৫)*। কিন্তু যদি কেউ হত্যাকারী হয় অথবা 'মুরতাদ' হয়, তাহ'লে সে নিহত ব্যক্তির এবং মুসলিম আত্মীয়ের মীরাছ পাবে না। অনুরূপভাবে কোন জারজ সন্তান তার পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না। ইসলামের এই উত্তরাধিকার নীতি চিরন্তন বিধান হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিন্তু 'এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান' এই বিষয়টিকে কথিত নারীবাদীরা টার্গেট বানিয়েছে এবং সরকারের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কুরআনী বিধানকে পরিবর্তন করে সেখানে জাতিসংঘের রচিত মনগড়া বিধান 'সিডো' চাপিয়ে দেওয়ার ও তা বাস্তবায়নের দুঃস্বপ্ন দেখা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১১৫)*।

এক্ষণে ইসলামের উক্ত মীরাছ বণ্টন নীতি কত নিখুঁত ও দূরদর্শী, তা আমরা ভেবে দেখব। যেমন (১) স্বাস্থ্য ও স্বভাবগত কারণে ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছে এবং উভয়ের জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। সেকারণ নারীকে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন এবং সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অর্থোপার্জন সহ অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনের বোঝা বহন করা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং একাজ পুরুষের উপর চাপিয়েছে। উভয়ের বুদ্ধিমত্তা, শরীর ও স্বভাবকে আল্লাহ ভিতর ও বাইরের দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে স্বভাবগতভাবে দায়িত্ব বেশী থাকার কারণে পুরুষকে মীরাছের অংশ বেশী দেওয়া হয়েছে।

(২) নারীকে তার মৌলিক প্রয়োজন তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এসব দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। সেকারণ পুরুষের অংশ দ্বিগুণ করা হয়েছে। (৩) মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে তার মর্যাদার প্রতি সম্মান হিসাবে মোহরানা লাভ করে থাকে। যা তার জন্য একটি উদ্বৃত্ত পাওনা স্বরূপ। যা তাকে সংসারে খরচ করতে হয় না। অথচ পুরুষ কোন মোহরানা পায় না। বরং স্ত্রী প্রদান করে থাকে। যা তার জন্য একটি বিরাট ব্যয় স্বরূপ। এরপরেও তাকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সহ সংসারের সব খরচ বহন করতে হয়। দেখা যায় যে, মেয়ে যা পায়, তা থেকে যায়। কিন্তু ছেলে নিঃস্ব হয়ে যায়। যেমন ধরুন, পিতা ৩ লক্ষ টাকা রেখে মারা গেলেন। মীরাছ বণ্টনে ছেলে ২ লাখ ও মেয়ে ১ লাখ টাকা পেল। অতঃপর বিয়ের সময় মেয়ে ১ লাখ টাকা মোহরানা পেয়ে ২ লাখ টাকার মালিক হ'ল। অন্যদিকে ছেলে তার বিয়ের সময় মোহরানা ও অন্যান্য বাবদ ২ লাখ টাকা খরচ করায় সে নিঃস্ব হয়ে গেল। এরপরেও তার উপরে রইল সংসার পালনের গুরুদায়িত্ব। (৪) বোন তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক পেলেও সে তার মা, দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই এমনকি অবস্থা ভেদে অন্যান্য আত্মীয় থেকেও মীরাছ লাভ করে থাকে। যা একত্রে যোগ করলে ভাইয়ের তুলনায় বরং বেশী পায়। (৫) কন্যা তার মীরাছ নিয়ে স্বামীগৃহে চলে

যায়। স্বামীগৃহ তার নিজগৃহ বলে গণ্য হয়। স্বামী ও সন্তানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তখন তার জীবনে মুখ্য বিষয় হয়। পক্ষান্তরে পুত্র তার পিতার সংসার, সম্মান, ঐতিহ্য ও পিতার আত্মীয়-পরিজন সবকিছুর দায়-দায়িত্ব বহন করে। সেকারণ তাকে কন্যার দ্বিগুণ অংশ দেওয়াটাই ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞানসম্মত। (৬) ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির বিপরীত। তাই ইসলামী সমাজে পুঁজি সর্বদা আবর্তনশীল। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার জন্য কন্যাকে বঞ্চিত করে কেবল পুত্রকে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়। এমনকি এজন্য দত্তক পুত্র গ্রহণ করে তাকেই উত্তরাধিকারী করা হয় এবং পুত্র একাধিক থাকলে পুঁজি ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অংশীদার করা হয়। এমনকি ‘এজমালি পারিবারিক সম্পত্তি নীতি’ গ্রহণ করা হয়। সেখানে ইসলামী সমাজে পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়কে অংশীদার ও মালিক করে সমাজে পুঁজি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে মাত্র কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের হাতে এবং সমাজবাদী সমাজে কেবল সরকারের হাতে সকল পুঁজি সঞ্চিত হয়, সেখানে ইসলামী সমাজে পুঁজির প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং সর্বত্র রক্ত সঞ্চালনের কারণে সমাজদেহ সুস্থ ও গতিশীল থাকে। কেবল তাই নয়, বরং উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় ওয়ারিছগণ ছাড়াও যদি কোন অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীন এসে হাযির হয়, তাহ’লে তাদেরকেও কিছু দান করা ও তাদের সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে *(নিসা ৪/৮)*। এর পরেও রয়েছে ফরয যাকাত-ওশর-ফিৎরা ও নফল ছাদাক্বা সমূহের এবং গরীব প্রতিবেশীদের ও অন্যদের প্রতি উদার হস্তে দান করার অবারিত প্রবাহ।

ইসলামী পরিবারে উত্তরাধিকার বণ্টন ইসলামী অর্থনীতির উপরোক্ত কল্যাণময় নীতিমালার আলোকেই গৃহীত হয়েছে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি অবতীর্ণ। আল্লাহ বলেন, ‘এগুলি হ’ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’। ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৪)*।

পরিশেষে আমরা বলব, পবিত্র কুরআনে 'পুরুষ জাতি' নামে কোন সূরা না থাকলেও সূরা নিসা বা 'নারীজাতি' নামে ১৭৬ আয়াত বিশিষ্ট বিরাট একটি সূরা রয়েছে। অতএব এই সূরা না পড়ে অথবা এর অন্তত ৭-৮, ১১-১৪ এবং শেষ ১৭৬ আয়াতটি না পড়ে কোন নারী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করা কোন মুসলমানের নিকট কাম্য নয়। বরং আমাদের কাম্য হবে যেন ইসলামের দেওয়া উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং কোন নারী যেন তার আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে ব্যাপারে সরকার কঠোরভাবে তদারকি করবে এবং ইসলামী বিধান সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন![১২২]

৩১. বুটের তলায় পিষ্ট মানবতা

২২শে সেপ্টেম্বর'১১ বৃহস্পতিবার বিরোধী দলের[১২৩] ডাকা নিরুত্তাপ হরতালের দিন ঢাকায় নিরীহ দরিদ্র পথচারী হাসপাতাল কর্মী ইউসুফকে লাঠিপেটা করে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশের পেট্রোল ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ হোসেনের বুট জুতায় দাবানো এবং নির্যাতিত যুবকটির পা ধরে আর্তনাদ ও কাতরানোর মর্মান্তিক দৃশ্য প্রায় সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছাড়াও বিশ্বের ৮২টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একই দৃশ্য দেখা গেল এ ঘটনার মাত্র তিন দিনের মাথায় ২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার ঢাকার রাজপথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল দমনকারী পুলিশের সহযোগী হিসাবে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন (ছাত্রলীগ)-এর ক্যাডারদের দ্বারা সহপাঠি আরেক ছাত্রকে একইভাবে মাটিতে চিৎ করে ফেলে গলায় ও মুখে জুতা দিয়ে মাড়িয়ে নির্যাতনে মৃতপ্রায় করে ফেলার মর্মন্তুদ দৃশ্য। হ্যাঁ, ঐ পুলিশ ইন্সপেক্টরটির

---

১২২. ১৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১১।

১২৩. এ সময় বিরোধী দল ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কোন শাস্তি হয়নি। বরং ভ্রাম্যমান আদালত নামক নতুন সৃষ্ট এক আজব ক্যাঙ্গারু কোর্ট 'পুলিশের কাজে বাধা দানের অপরাধে'(?) ঐ পথচারীকে এক বছরের দণ্ড দিয়ে তখনই কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে চিকিৎসায় ছেলেটি হয়তবা সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু তার উপরে নির্ভরশীল সংসারের অসহায় মানুষগুলির অবস্থা কেমন হবে বিজ্ঞ বিচারক তা কি একবার ভেবে দেখেছিলেন? ম্যাজিস্ট্রেট নামধারী ঐ ব্যক্তিটি, যিনি বিচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি বিচার করলেন, না অবিচার করলেন? তিনি ঐ অত্যাচারী পুলিশটাকে তো কোন দণ্ড দিলেন না। তাহ'লে কি তিনি বলতে চাচ্ছেন পুলিশকে সমানে নির্যাতন করার সুযোগ দেওয়াটাই হ'ল বিচার? আর তার নির্যাতনে আর্তনাদ করাটাই কি পুলিশের কাজে বাধা দান হিসাবে গণ্য? ধিক ঐ বিচারকের। তোমার বিচার যিনি করবেন, তিনি সবই দেখেছেন আরশ থেকে। তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ কখনোই যালেমকে বরদাশত করেন না। তবে তিনি বান্দাকে তওবা করার জন্য কিছুটা অবকাশ দেন মাত্র।

হে পুলিশ! তোমার দেহে যে পোশাক, তোমার হাতে যে অস্ত্র, তোমার পায়ে যে বুট জুতা, ওটার মালিক কে? হে উচ্চশিক্ষিত ছাত্র নামধারী ক্যাডার! যাকে তুমি পায়ের তলায় মাড়িয়ে উল্লাস করছ, ওটা কে? সে কি জনগণের অংশ নয়? যে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যাদের 'ভোট ও ভাতের অধিকার' কায়েমের জন্য তোমরা রাতদিন মিছিল-মিটিং-হরতাল করে দেশ অচল করে থাক, সেই জনগণের সার্বভৌমত্ব আজ জনগণের বেতনভুক্ত পুলিশের বুটের তলায় ও সরকারী ছত্রছায়ায় লালিত সন্ত্রাসীদের জুতার তলায় পিষ্ট হচ্ছে। দলীয় ক্যাডার ও পুলিশী নির্যাতন থেকে কেবল নিরীহ পথচারী নয়, সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ, সংসদ সদস্য, সংবাদকর্মী, জ্ঞানী-গুণী, আলেম-ওলামা ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। পুলিশ ও র‍্যাবের নির্যাতনে পঙ্গু ও মৃত্যু, ক্রসফায়ারে হত্যা, ঘুষ-দুর্নীতি, মিথ্যা মামলা, দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগেই হাজতের নামে মেয়াদবিহীনভাবে কারা নির্যাতন, রিম্যাণ্ড, ডাণ্ডাবেড়ী এগুলিই এখন গণতন্ত্রের নমুনা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য ইতিপূর্বের কথিত গণতান্ত্রিক সরকারও দেখিয়েছে। পার্থক্য কেবল উনিশ

ও বিশের। দলীয় শাসনের যুপকাষ্ঠে সমাজের সর্বত্র এভাবেই আজ মানবতা পিষ্ট হচ্ছে। কেবল দেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে কমবেশী একই অবস্থা বিরাজ করছে।

দেশের ও বিশ্বের সামগ্রিক চিত্র সামনে রাখলে ফলাফল একটাতেই এসে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এখন মানবতা পিষ্ট হচ্ছে মানুষ নামক কিছু অমানুষের হাতে। এরা সেযুগের নমরূদ-ফেরাঊনকেও হার মানিয়েছে। প্রশ্ন হ'ল : এই পতিত দশা থেকে মানবতাকে বাঁচানোর উপায় কি?

প্রথমে পতনের কারণ সন্ধান করতে হবে। অতঃপর উত্তরণের পথ বের করা সহজ হবে। আমাদের মতে মানবতার এই পতনদশার মূল কারণ হ'ল 'বস্তুবাদ'। যা দুনিয়াকেই মানুষের সর্বশেষ ঠিকানা মনে করে। এই মতবাদীরা যেকোন মূল্যে দুনিয়াকে ভোগ করার জন্য তাদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আর তারা এখন তাই-ই করছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এরা মানুষের সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। মানুষকে এরা সাধারণ পশুর ন্যায় মনে করে। তাই মানুষকে অপমান করতে ও অত্যাচার করতে এদের তৈরী করা আইনে ও বিবেকে বাঁধে না। ফলে মানুষকে পায়ের তলে পিষ্ট করতে ও যুলুম করতে এদের হৃদয় কাঁপে না।

উপরোক্ত কারণ দু'টি সামনে রেখে এর প্রতিষেধক হ'ল দু'টি। **এক**- মানুষের বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন আনতে হবে যে, ক্ষণিকের এ জীবনই শেষ নয়, চিরস্থায়ী পরকালীন জীবন সামনে অপেক্ষা করছে। মৃত্যুর পরেই যার সূচনা হবে। যেখানে এ জীবনের সকল কাজের হিসাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে। এ বিশ্বাস মযবুত না হওয়া পর্যন্ত বস্তুবাদী হিংস্রতা থেকে বিশ্ব কখনোই মুক্তি পাবে না। **দুই**- মানুষ হ'ল সৃষ্টির সেরা। সকল সৃষ্টিজগত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। ধনী-গরীব সবাই এক আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। অতএব মানুষের উপর মানুষের কোন প্রাধান্য নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত। অর্থাৎ যিনি যত বেশী আল্লাহভীরু ও আখেরাতমুখী হবেন, তিনি তত বেশী শয়তান থেকে দূরে থাকবেন। আর তার হাতেই মানবতা নিরাপদ থাকবে। একারণেই তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর একারণেই সবার উপরে তার প্রাধান্য।

আল্লাহ্র এ বিধান মেনে নিতে হবে যে, মানুষ মানুষের ভাই। তারা একে অপরকে যুলুম করবে না, লাঞ্ছিত করবে না, অপমান করবে না। তাদের পরস্পরের জন্য তিনটি বস্তু হারাম। তার রক্ত, তার মাল ও তার সম্মান। সে তার অপর ভাইয়ের জন্য সেটাই ভালবাসবে, যেটা সে নিজের জন্য ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ কখনো ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না'।[১২৪] তিনি বলেন, দয়াশীলদের প্রতি অসীম দয়ালু আল্লাহ রহম করে থাকেন। অতএব হে যমীনবাসীগণ! তোমরা পরস্পরের প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[১২৫] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না ও বড়দের অধিকার বা মর্যাদা বুঝে না, সে ব্যক্তি মুসলমান নয়'।[১২৬] আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি'। '(স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা (অর্থাৎ নবী) অথবা আমলনামা সহ আহ্বান করব। অতঃপর যাদেরকে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না'। 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ (অর্থাৎ ইসলামের সত্য থেকে অন্ধ), সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট' *(ইসরা ১৭/৭০-৭২)*।

অতএব সমাজনেতা, ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা যিনি যেখানেই থাকুন না কেন হিংসা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ঘৃণ্য মানসিকতা পরিহার করে সর্বত্র মানবতাকে সমুন্নত করার প্রত্যয় গ্রহণ করুন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিঃস্বার্থ মানব সেবার মাধ্যমে সমাজকে শান্তিময় করে গড়ে তোলার শপথ নিন! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১২৭]

---

১২৪. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৪৯৪৭।

১২৫. তিরমিযী হা/১৯২৪; আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯।

১২৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০।

১২৭. ১৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১১।

৩২. নৈতিকতা ও উন্নয়ন

মানুষের জৈববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বিত ও উন্নীত রূপকে বলা হয় নৈতিকতা। নৈতিকতা ও উন্নয়ন দু'টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে যদি বস্তুগত উন্নয়ন হয়, তাহ'লে ঐ উন্নয়ন হবে ক্ষণস্থায়ী এবং তাতে ধস নামতে বাধ্য। বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় যেভাবে শুরু হয়েছে, তাতে পুরা বিশ্ব সভ্যতা এখন হুমকির সম্মুখীন। পরিবার, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র সর্বত্র নেতৃ পর্যায়ে অধঃপতন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সাথে তৃণমূল পর্যায়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। প্রবাদ আছে যে, 'আলেমের পতন জগতের পতন'। একইভাবে রাষ্ট্রনেতার পতন রাষ্ট্রের পতন। উপরোক্ত কারণে বিগত যুগে পৃথিবীর ৬টি জাতি আল্লাহ্র গযবে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সে জাতিগুলি হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। এছাড়া কওমে ইবরাহীম ও অন্যান্য জাতি একত্রে সবাই ধ্বংস না হ'লেও অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক কওমের ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল মূলতঃ নেতাদের নৈতিক অধঃপতন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আর বরকতে মুসলিম উম্মাহ একত্রে ধ্বংস হবে না। তবে দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিক গযব আমরাই ডেকে নিয়ে আসছি। আমরা যদি ভেবে থাকি যে, আমাদের পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি ও খেস্তি-খেউড় আল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন না বা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, তাহ'লে মারাত্মক ভুল হবে। এই ভুল করেই বিগত জাতিগুলি ধ্বংস হয়েছিল। আমরা যেন সে ভুল না করি। নোনা ধরা ইট দিয়ে গড়া কোন সৌধ যেমন টিকে থাকতে পারে না, নৈতিকতাহীন মানুষ দিয়ে তেমনি কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। প্রশ্ন হ'ল নৈতিকতা গড়বে কি দিয়ে?

জবাবে বলব, মানুষকে আগে নিজের সম্পর্কে জানতে হবে। সে কি আর পাঁচটি প্রাণীর মত? না তার কোন পৃথক নৈতিক বৈশিষ্ট্য আছে? জানা আবশ্যক যে, মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তার সাথে অন্য কোন প্রাণীর তুলনা হয় না। মানুষ পশু নয়, ফেরেশতাও নয়। বরং সে হাইওয়ানিয়াত ও মালাকিয়াতের সমন্বিত এক অনন্য প্রাণীসত্তা। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে তাকে সৃষ্টি করেছেন ও

পৃথিবীকে আবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কাছে। সেখানে তাকে সারা জীবনের হিসাব দিতে হবে। সেমতে তার জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। আর এখানেই অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য।

দুনিয়ার হিসাবকে শক্তিশালী মানুষ তোয়াক্কা করে না। আর তাই কয়েকটি পরাশক্তি মিলে সারা বিশ্বে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তাদের সংজ্ঞায়িত নীতি ও নৈতিকতার আলোকে। যদিও তা আদৌ কোন নৈতিকতা নয়। একদল মানুষ জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নীরব কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে আত্মার উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে। আর একদল মানুষ দু'হাতে লুটে-পুটে সবকিছু ভোগ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে ফিরছে। অথচ জীবনহীন কৃচ্ছ্রতায় মানুষ শান্তি পায় না। তাইতো দেখা যায়, সংসারবিরাগী পোপ-পাদ্রী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজেদের দুষ্কর্ম দিয়েই নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। কারণ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন অবকাশ মানুষের নেই। এটা মহান স্রষ্টারই সৃষ্টি কৌশল। অন্যদিকে দেখা যায়, বিগত যুগে জনৈক খুনী ৯৯ জনকে খুন করার পর অনুতাপের আগুনে পুড়ে পরিশুদ্ধ হবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।[১২৮] তাই কৃচ্ছ্রতাবাদ ও ভোগবাদ দু'টিই চরমপন্থী মতবাদ এবং দু'টিই মানব স্বভাবের বহির্ভূত। মানুষের প্রকৃতিতে ভোগ ও ত্যাগ দু'টিই আছে। কিন্তু তা যখন হবে নিয়ন্ত্রিত, তখনই তা হবে কল্যাণময় ও সুষম। আর এই নিয়ন্ত্রণ মানবরচিত কোন আইন দ্বারা হবে না। কেননা তাতে আসবে ত্রুটি এবং আসবে পুনরায় অমানবীয় বর্বরতা। যেমন বিগত দিনে এসেছিল সমাজ নেতাদের মাধ্যমে নবীগণের উপরে এবং এযুগে আসছে রাষ্ট্রনেতা, বিচারপতি ও বিশ্বসভার মাধ্যমে অগণিত নিরপরাধ বনু আদমের উপরে। ৫৫৭ জন জুরীর অধিকাংশ সক্রেটীসের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছিলেন। জাতিসংঘের অনুমোদন নিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা করা হয়েছে। আজও হচ্ছে লিবিয়া ও পাকিস্তানে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সমকামিতা বৈধ করেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই

১২৮. বুখারী হা/৩৪৭০; মুসলিম হা/২৭৬৬; মিশকাত হা/২৩২৭।

দিয়ে। একইরূপ একটি বিলে সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। উজানের নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে আস্ত একটি নদীমাতৃক ভাটির দেশকে মরুভূমি বানিয়ে ফেলল পার্শ্ববর্তী উজানের দেশটি। সিডর দুর্গত বনু আদমকে ৫ লাখ টন চাউল সাহায্য দেবেন বলে ওয়াদা করে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশের বাঙ্গালী মন্ত্রী।[১২৯] কিন্তু দিলেন না কিছুই। এটা কোন নৈতিকতা? অথচ ঐ অসহায় মানুষগুলির জন্য পরাশক্তিগুলি সহ বিশ্বের ৩৩টি রাষ্ট্রের প্রদত্ত অনুদানের চাইতে অনেক বেশী দান করলেন একাই জনৈক সঊদী মুসলিম ভাই, একান্ত গোপনে। আজও বিশ্ব তার নাম জানে না। এটা কোন নৈতিকতা? বলা হচ্ছে, শিক্ষিত জাতি গড়তে পারলেই দেশের উন্নতি হবে। যদি বলি শিক্ষিত পাশ্চাত্য বিশ্বই আজকের পৃথিবীর নব্বই ভাগ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী। যদি বলি, দেশের যত অন্যায়-অনাচার, তার সিংহভাগ সাধিত হয় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বের শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত মেধাকে ব্যয় করছেন মানব সভ্যতা ধ্বংসের পিছনে। শোনা যাচ্ছে, এটম বোমার চাইতে ছয় থেকে দশগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন নিউট্রন বোমা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। যা কেবল প্রাণীর মৃত্যু ঘটাবে। অথচ বস্তুগত অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করবে না। প্রশ্ন হ'ল : এই শিক্ষিত লোকগুলির প্রধান টার্গেট এখন মানুষ হত্যা। তাই বলা যায় যে, নৈতিক মূল্যবোধহীন শিক্ষা পশুত্ব বৈ কিছুই নয়। যা মানুষের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো এটাই যে, মানুষের রচিত কোন বিধানের অনুসরণ নয়, বরং নৈতিকতা অর্জনের জন্য মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধানের অনুসরণ করতে হবে। তাঁর প্রেরিত অভ্রান্ত হেদায়াতকে নিজের বিশ্বাসে ও কর্মে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের Intrinsic ও Extrinsic Value তথা মনোজাগতিক ও বহির্জাগতিক মূল্যবোধকে আল্লাহ্র বিধানের অনুগত করতে হবে। তাঁর সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তিই মূল লক্ষ্য হ'তে হবে এবং উক্ত

---

১২৯. বর্তমান মেয়াদে (২০১২-২০১৭) ভারতের প্রেসিডেন্ট হ'লেন প্রণব মুখার্জী। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম যেলার মীরাটি গ্রামে এবং শ্বশুড়বাড়ী বাংলাদেশের নড়াইল যেলার ভদ্রবিলা গ্রামে। এজন্য তাঁকে 'বাংলাদেশের জামাই' বলা হয়।

উদ্দেশ্যেই মানুষের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হ'তে হবে। তবেই উপ্ত হবে প্রকৃত নৈতিকতা। পরিবারে ও সমাজে আসবে স্বস্তি ও স্থিতি। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রত্যাশী প্রত্যেক মানুষের জন্য এই একটা পথই মাত্র খোলা রয়েছে। আর এ পথই হ'ল ইসলামের পথ। এ পথে ফিরে আসার কারণেই বর্বর আরবরা হয়েছিল বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত। একজন নির্যাতিত মুসলিম নারীর ইয্যত বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছিল তারা অজানা অচেনা সিন্ধু ভূমিতে। তাদের উদার ব্যবহারে মুগ্ধ সিন্ধুবাসীরা সেই থেকে আজও মুসলমান। ভারত বিজেতা সম্রাট বাবর রাস্তায় খেলারত এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে একাই মুকাবিলা করলেন এক মত্ত হস্তীকে। ইয়ারমূকের ময়দানে মৃত্যুকাতর মুসলিম সৈনিক মুখে পানি তুলে নিয়ে ফেরত দিলেন আরেক আহত সৈনিকের জন্য। তাই বলব, মানবসেবা ও মনুষ্যত্বের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে, পশুত্বের মধ্যে নয়। আর মনুষ্যত্ব টিকে থাকে আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসের কারণে। উক্ত বিশ্বাস ও কর্মের আলোকে গড়ে ওঠে উন্নত নৈতিকতা। নৈতিকতার উন্নয়নের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন- আমীন![১৩০]

৩৩. বাঁচার পথ

আধুনিক জাহেলিয়াত তার সর্বগ্রাসী প্রতারণার জাল ফেলে মানবতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থা সবই আল্লাহ বিরোধী। এমনকি ধর্মনীতিতেও জমাট বেঁধেছে ধর্মনেতাদের বানোয়াট রীতিনীতি ও অগণিত শিরক ও বিদ‘আতের জঞ্জাল। আজ সত্যের হাত-পা বাঁধা। মিথ্যার রয়েছে বল্গাহীন স্বাধীনতা। এমতাবস্থায় মানুষের বাঁচার পথ কি? আমরা মনে করি, সামনে মাত্র তিনটি পথ খোলা রয়েছে। (১) পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলকে আঁকড়ে ধরা। (২) হক-এর উপর দৃঢ় থেকে বাতিলপন্থীদের হামলায় ছবর করা। (৩) বাতিলকে সাহসের সাথে মুকাবিলা করে হক-এর বিজয় লাভের পথ সুগম করা।

১৩০. ১৫তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১১।

উপরোক্ত তিনটি পথের মধ্যে প্রথমটি কোন বাঁচার পথ নয়, বরং ওটা মরণের পথ। দ্বিতীয়টি সাময়িকভাবে গ্রহণ করা গেলেও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করলে তার পরিণতি এটাই হবে যে, তিলে তিলে মরতে হবে। যার কোন ভবিষ্যত নেই। এখন কেবলমাত্র তৃতীয় পথটাই খোলা রয়েছে। আর তা হ'ল বাতিলের সাথে আপোষ করে নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলা করে হক-এর বিজয়ের পথ সুগম করা। এখানে বিষয় হ'ল দু'টি। (ক) বাতিলের মুকাবিলা করা এবং (খ) বিজয়ের পথ সুগম করা। মুকাবিলার ক্ষেত্রে হক ও বাতিল দু'টিরই নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। বাতিলের প্রতিটি গলিপথে পাহারা বসানো নিয়ম হলেও হক কখনোই বাতিলের পথে যায় না। কেননা ওটাও বাতিলের পাতানো ফাঁদ মাত্র। যেমন বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা ও নানাবিধ নোংরামির আশ্রয় নিলেও হকপন্থীরা তা পারে না। হকপন্থীকে হক পথে থেকে বাতিলের মুকাবিলা করতে হবে এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে। আল্লাহ চাইলে সাহায্য করবেন ও দুনিয়াবী বিজয় দান করবেন। আর পরাজিত হ'লে সেটা আগামী দিনে বিজয়ের সোপান হবে। তবে উভয় অবস্থায় হকপন্থীর জন্য আখেরাতের বিজয় সুনিশ্চিত। মক্কার নেতাদের দাবী অনুযায়ী কেবল কালেমা ত্যাগ করলেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) সারা আরবের নেতৃত্ব পেয়ে যেতেন। অবশেষে কেবল তাদের মূর্তিগুলোকে মেনে নিয়ে যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার আপোষ প্রস্তাবেও তিনি রাযী হননি। ফলে তিনি বাহ্যতঃ পরাজিত হলেন ও মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মক্কার নেতাদের বিজয়ের হাসি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র আট বছরের মাথায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন বিজয়ীর বেশে। পুরা মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সেদিন বিনাযুদ্ধে তাঁর করতলগত হয় এবং সবাই তাঁর দ্বীন কবুল করে নেয়। এ বিজয় ছিল আদর্শের বিজয়। সত্যের বিজয়। যা স্রেফ আল্লাহ্র গায়েবী মদদেই সম্ভব হয়েছিল। অতএব হক-এর উপর দৃঢ় থেকেই বাতিলের মুকাবিলা করতে হবে। বাতিলের সাথে আপোষ করে বাতিলের দেখানো পথে গিয়ে কখনোই বাতিল হটানো যায় না। আর এটাই বাস্তব যে, হক ও বাতিল আপোষ করলে বাতিল লাভবান হয় এবং হক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতিলের যুক্তিসমূহ বড়ই মনোহর ও লোভনীয়। তাই হকপন্থীরা অনেক সময় পদস্খলিত হয়। ব্যক্তি ও সাংগঠনিক জীবনে যার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের

সামনে রয়েছে এবং হরহামেশা ঘটছে। এমনকি বিভিন্ন দেশের ইসলামী নেতারা যারা সারা জীবন ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য কাজ করেছেন, অবশেষে বাতিলের পথ ধরে এগোতে গিয়ে বাতিলের হামলায় পরাভূত হয়েছেন। নিয়ত শুদ্ধ হলেও রাস্তা পরিবর্তন করায় শেষ মুহূর্তে তিনি পথভ্রষ্ট হলেন। আবার এমনও কিছু মানুষ এই উপমহাদেশেই ছিলেন, যারা স্রেফ আল্লাহ্‌র স্বার্থে লড়াই করেছেন নিজস্ব ঈমানী তেজে সর্বাধুনিক অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে। এমনকি বাঁশের কেল্লা দিয়ে কামানের গোলার মোকাবিলা করেছেন। তারা শহীদ হয়েছেন কিন্তু বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। ফলে তারাই হলেন জাতির প্রেরণা। তাদের সেই শহীদী রক্তের পথ বেয়েই জাতি পরে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে।

‘মুমিনকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব’ *(রূম ৩০/৪৭)*। তাই বাহ্যিকভাবে পরাজিত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি *(নাঊযুবিল্লাহ)*। বরং এর অর্থ এই যে, বাহ্যিক এই পরাজয় তার ভবিষ্যত বিজয়ের সোপান। যা আল্লাহ্‌র ইলমে রয়েছে। কিন্তু বান্দার ইলমে নেই। মক্কায় যখন বেলালকে মেরে-পিটিয়ে হাত-পা বেঁধে নগ্নপৃষ্ঠে অগ্নিঝরা রোদে স্ফুলিঙ্গ সদৃশ মরুবালুকার উপর পাথর চাপা দিয়ে নির্যাতন করা হ’ত, তখন নেতারা ভাবত, বেলালরা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন বেলাল কা‘বা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে দরায কণ্ঠে আযান দিলেন, তখন মক্কার নেতাদের হৃদয় জ্বলে গেল। তারা বলে উঠল কি সৌভাগ্যবান আমাদের পিতারা যে এই দৃশ্য দেখার আগেই তারা মারা গেছেন। ইয়াসির ও তার স্ত্রী সুমাইয়া মক্কায় যখন শহীদ হলেন, সাইয়িদুশ শোহাদা হামযা যখন ওহোদ প্রান্তরে শহীদ হলেন, তখন তারা জানতেন না যে, কিছুদিন পরেই তারা বিজয়ী হবেন ও মক্কা তাদের করতলগত হবে। আল্লাহ কিন্তু তাদের এই ত্যাগ ও কুরবানীর সাময়িক পরাজয়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে স্থায়ী বিজয়ের পুরস্কার দান করেছেন। দুনিয়াতে বিজয়ের খবর না পেলেও জান্নাতে গিয়ে সকলে বিজয়ীদের মিলনমেলায় সমবেত হবেন। তাই মুমিন যদি লক্ষ্যচ্যুত না হয় এবং তার কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিতে দৃঢ় থাকে, তাহ’লে জীবদ্দশায় হৌক বা মৃত্যুর পরে হৌক, তার জন্য বিজয় অবধারিত।

হক-এর বিজয়ে যিনি যতটুকু অবদান রাখবেন, তিনি ততটুকু প্রতিদান পাবেন। তিনি আল্লাহকে খুশী করার জন্য কাজ করবেন, অন্যের জন্য নয়। শয়তান নানা অজুহাত দেখিয়ে তাকে প্রতি পদে পদে বাধা দিবে এবং তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র পথের দাঈ শয়তানকে চিহ্নিত করবে এবং তাকে পদদলিত করে নিজ কর্তব্য সাধনে এগিয়ে যাবে। ৪র্থ হিজরীতে নাজদের নেতারা এসে তাদের এলাকায় দাওয়াতের জন্য লোক চাইল। তারা তাদের নিরাপত্তার ওয়াদা দিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের নিকটে ৭০ জন সেরা দাঈকে পাঠালেন। অতঃপর তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে সবাইকে হত্যা করল। কিন্তু বি'রে মাঊনার এই মর্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে কেউ কথা তুলল না। নেতার ভুল ধরল না। দ্বীন পরিত্যাগ করে চলে গেল না। কারণ সবাই কাজ করেছেন আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে তারা হাসিমুখে জীবন দিয়েছেন। নবীর বিরুদ্ধে তাদের বা তাদের পরিবারের কারু কোন অভিযোগ ছিল না। বরং আল্লাহ্র পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে পেরে তারা ও তাদের পরিবারগুলি ছিল মহা খুশী। হারাম বিন মিলহানকে যখন পিছন থেকে বর্শা বিদ্ধ করা হয়, তখন রক্ত দেখে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আল্লাহু আকবর। কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি' *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৯১ পৃ.)*।

অর্থ ও অস্ত্রধারী কপট শক্তিবলয়ের বিরুদ্ধে এখন প্রতিরোধের একটাই পথ খোলা আছে। আর তা হ'ল, আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ঈমান রেখে বাতিলের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয় ঘোষণা করা এবং ঈমানদারগণের মধ্যে সীসাঢালা সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে একটি 'কুন' শব্দের মাধ্যমে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। যেমন ইতিপূর্বে মূসা ও তাঁর নিরস্ত্র সাথীদের বিরুদ্ধে বাতিলের শিখণ্ডী ফেরাঊন আল্লাহ্র হুকুমে সসৈন্যে ডুবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তুমি হকপন্থীদের শক্তিশালী কর-আমীন![১৩১]

---

১৩১. ১৫তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১২।

৩৪. কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ

মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে ফিরিয়ে কথিত 'অন্তর্গুরু'র ইবাদতে লিপ্ত করার অভিনব প্রতারণার নাম হ'ল 'কোয়ান্টাম মেথড'। হাযার বছর পূর্বে ফেলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান পাদ্রী ও যোগী-সন্ন্যাসীদের যোগ-সাধনার আধুনিক কলা-কৌশলের নাম দেওয়া হয়েছে 'মেডিটেশন'। হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সাময়িক প্রশান্তির সাগরে ভাসিয়ে এক কল্পিত দেহভ্রমণের নাম দেওয়া হয়েছে Science of Living বা জীবন-যাপনের বিজ্ঞান। আকর্ষণীয় কথার ফুলঝুরিতে ভুলে টাকাওয়ালা সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা এদের প্রতারণার ফাঁদে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে। ব্যয় করছেন কথিত ধ্যানের পিছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঢেলে দিচ্ছেন হাযার হাযার টাকা। অথচ একটা রঙিন স্বপ্ন ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। অন্যদিকে মুসলমান যারা এদের দলে ভিড়ছে, তারা শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাচ্ছে। নিম্নে আমরা এদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি যাচাই করব।-

কোয়ান্টামের পঞ্চসূত্র হ'ল, প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, সুখী পরিবার ও ধ্যান। বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। সুখী মানুষের সবটুকু প্রয়োজন পূরণের প্রক্রিয়াই রয়েছে কোয়ান্টামে। তাই কোয়ান্টামই হচ্ছে নতুন সহস্রাব্দে আধুনিক মানুষের জীবন যাপনের বিজ্ঞান'। অন্যান্য ডিগ্রীর ন্যায় এখানকার ধ্যান সাধনায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে 'কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট' বলে শ্রুতিমধুর একটা ডিগ্রী দেওয়া হয়। তাদের প্রচার অনুযায়ী বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং আত্ম উন্নয়নে ধ্যান পদ্ধতির প্রবর্তক প্রফেসর এম.ইউ. আহমাদ নাকি ক্লিনিক্যালি ডেড হওয়ার পরেও পুনরায় জীবন লাভ করেন শুধু 'তাঁকে বাঁচতে হবে, তিনি ছাড়া দেশে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসক নেই' তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে'।[১৩২] অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের হায়াত-মউতের মালিক হ'লেন।

১৩২. মহাজাতক, কোয়ান্টাম টেক্সট বুক, জানু. ২০০০, পৃঃ ২২-২৪।

প্রথমে বলে রাখি, মানবরচিত প্রত্যেক ধর্মেই স্ব স্ব নিয়মে ধ্যান পদ্ধতি আছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যোগী-সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে আমরা কিছুটা জানি। আল্লাহ প্রেরিত ঈসায়ী ধর্মে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হয়। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'আর সন্ন্যাসবাদ, সেটাতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমরা তাদেরকে এ বিধান দেইনি। অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারী' *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। এখানে আল্লাহ তাদেরকে দুইভাবে নিন্দা করেছেন। (১) তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত অর্থাৎ নতুন রীতির উদ্ভাবন করেছিল। (২) তারা নিজেরা যেটাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য মনে করে আবিষ্কার করেছিল, সেটার উপরেও তারা টিকে থাকতে পারেনি। ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে ভ্রষ্টতার যুগে মা'রেফতের নামে বিদ'আতী পীর-ফকীররা নানাবিধ ধ্যান পদ্ধতি আবিষ্কার করে। অতঃপর কথিত ইশক্বের উচ্চ মার্গে পৌঁছে হুয়া হু করতে করতে যখন চক্ষু ছানাবড়া হয়ে 'কাশফ' বা 'হাল' হয়, তখন নাকি তাদের আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। একে তাদের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ বা বাক্বা বিল্লাহ বলে। এরাই ছূফী ও পীর-মাশায়েখ নামে এদেশে পরিচিত। অথচ এইসব মা'রেফতী তরীকার কোন অনুমোদন ইসলামে নেই। ধ্যানকে কোয়ান্টামের পরিভাষায় বলা হয় 'মেডিটেশন' (Meditation)। যার প্রথম ধাপ হ'ল 'শিথিলায়ন' যা মনের মধ্যে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করে। আর শেষ ধাপ হ'ল মহা চৈতন্য (Super Consciousness)। যখন তারা বস্তুগত সীমানা অতিক্রম করে মহা প্রশান্তির মধ্যে লীন হয়ে যায়। যদিও এর কোন সংজ্ঞা তাদের বইতে সুস্পষ্টভাবে নেই।

এক্ষণে কোয়ান্টামের সাথে অন্যদের পার্থক্য এই যে, অন্যেরা স্ব স্ব ধর্মের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে ও স্ব স্ব ধর্মের নামেই পরিচিতি পেয়েছে। পক্ষান্তরে কোয়ান্টাম মেথড সকল ধর্ম ও বর্ণের লোকদের নতুন ধ্যানরীতিতে জমা করেছে। খানিকটা সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর মত। তখন আবুল ফযল ও ফৈযীর মত সেকালের সেরা পণ্ডিতবর্গের মাধ্যমে সেটা চালু হয়েছিল মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে। আর এ যুগে কিছু উচ্চ শিক্ষিত সুচতুর লোকদের মাধ্যমে

এটা চালু হয়েছে ইসলাম থেকে মানুষকে সরিয়ে নেবার জন্যে এবং শিক্ষিত শ্রেণীকে বিশ্বাসে ও কর্মে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার জন্যে। যাতে ভবিষ্যতে এদেশ তার ইসলামী পরিচিতি হারিয়ে সেক্যুলার দেশে পরিণত হয়। মুনি-ঋষিরা ধ্যান করে তাদের ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামে ধ্যান করা হয় স্ব স্ব 'অন্তর্গুরু'কে পাওয়ার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে, 'অন্তর্গুরুকে পাওয়ার আকাংখা যত তীব্র হবে, তত সহজে আপনি তার দর্শন লাভ করবেন। এ ব্যাপারে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের'।[১৩৩] যেমন একটি ঘটনা বলা হয়েছে, 'ছেলে কোলকাতায় গিয়েছে। দু'দিন কোন খবর নেই। বাবা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। মাগরিবের নামাজ পড়ে মেডিটেশন কমাণ্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থা দেখার চেষ্টা করতেই কোলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে এল। ছেলে সিনেমা হলের গেটে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন শিগগীর ফোন করতে'।[১৩৪] এমনিতরো উদ্ভট বহু গল্প তারা প্রচার করেছেন।

ইসলামের সাথে এর সম্পর্ক : ১. এটি তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং পরিষ্কারভাবে শিরক। তাওহীদ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ কেন্দ্রিক। ইসলামের সকল ইবাদতের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা ও পরকালে মুক্তি লাভ করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের ধ্যান সাধনার লক্ষ্য হ'ল অন্তর্গুরুকে পাওয়া। যা আল্লাহ থেকে সরিয়ে মানুষকে তার প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ করে। এদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি তাকে দেখ না যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে'? 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*। মূলতঃ ঐ অন্তর্গুরুটা হ'ল প্রবৃত্তিরূপী শয়তান। সে সর্বদা তাকে রঙিন স্বপ্নের মাধ্যমে তার দিকে প্রলুব্ধ করে।

---

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭।
১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১।

২. তারা বলেন, মনকে প্রশান্ত করার মতো নামাজ যাতে আপনি পড়তে পারেন সেজন্যই মেডিটেশন দরকার। কেননা নামাজের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হুযুরিল ক্বালব, একাগ্রচিত্ততা। এটা কিভাবে অর্জিত হয়, তা এখানে এলে শেখা যায়' *(প্রশ্নোত্তর ১৪২৭)*।

জবাব : এটার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হ'ল ছালাত। এর বাইরে কোন কিছুর অনুমোদন ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন, তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে দেখছ'।[১৩৫] তিনি যখন সংকটে পড়তেন তখন ছালাতে রত হ'তেন।[১৩৬] যারা খুশু-খুযুর সাথে ফরয ও নফল ছালাত সমূহ নিয়মিতভাবে আদায় করে, তাদেরকেই আল্লাহ সফলকাম মুমিন বলেছেন *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। আর ছালাতে ধ্যান করা হয় না। বরং বান্দা তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে একান্তে আলাপ করে।[১৩৭] সর্বোচ্চ শক্তির কাছে নিজের দুর্বলতা ও নিজের কামনা-বাসনা পেশ করে সে হৃদয়ে সর্বাধিক প্রশান্তি লাভ করে এবং নিশ্চিত আশাবাদী হয়। অথচ মেডিটেশনের কথিত অন্তর্গুরুর কোন ক্ষমতা নেই। তার সাধনায় নিশ্চিত আশাবাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ওটা তো স্রেফ একটা কল্পনা মাত্র। ছালাতে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। পক্ষান্তরে মেডিটেশনে অন্তর্গুরুর ইবাদত করা হয়। একটি তাওহীদ, অপরটি শিরক। দু'টিকে এক বলা দিন ও রাতকে এক বলার সমান। যা চরম ধৃষ্টতার নামান্তর।

৩. তারা বলেন, কোয়ান্টাম মেডিটেশনের জন্য ধর্ম বিশ্বাস কোন যরূরী বিষয় নয়। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। তাদের কার্যাবলীতে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, 'এখন কোয়ান্টাম শিশু কাননে রয়েছে ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর চার শতাধিক শিশু। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রামা, খ্রিষ্টান, প্রকৃতিপূজারী সকল ধর্মের শিশুরাই যার যার ধর্ম পালন করছে। আর এক সাথে গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসাবে' *(শিশু কানন)*।

---

১৩৫. বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩।
১৩৬. আবুদাঊদ হা/১৩১৯; মিশকাত হা/১৩২৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩।
১৩৭. বুখারী হা/৫৩১; মিশকাত হা/৭৪৬।

জবাব : মানুষকে সকল ধর্ম থেকে বের করে এনে কোয়ান্টামের নতুন ধর্মে দীক্ষা নেবার ও কোয়ান্টাম নেতাদের গোলাম বানানোর চমৎকার যুক্তি এগুলি। কেননা অন্তর্গুরুর ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে গেলে একজন আলোকিত গুরুর কাছে বায়াত বা দীক্ষা নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া আধ্যাত্মিকতার সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যেকোন সময়ই পা পিছলে পাহাড় থেকে একেবারে গিরিখাদে পড়ে যেতে পারেন' *(টেক্সটবুক, পৃঃ ২৪৭)*। অর্থাৎ এরা 'আলোকিত মানুষ' বানাচ্ছে না। বরং ইসলামের আলো থেকে বের করে এক অজানা অন্ধকারে বন্দী করছে। যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তা কবুল করা হবে না। ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছি'।[১৩৮] অতএব ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরাই কেবল আলোকিত মানুষ। বাকী সবাই অন্ধকারের অধিবাসী।

৪. তারা বলেন, বহু আলেম আমাদের মেডিটেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এর সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই বলেছেন।

জবাব : অল্প জ্ঞানী অথবা কপট বিশ্বাসী ও দুনিয়াপূজারী লোকেরাই চিরকাল ইসলামের ক্ষতি করেছে। আজও করছে। খলীফা ওমর (রাঃ) এবং প্রখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'দ্বীনকে ধ্বংস করে তিনজন : (১) অত্যাচারী শাসকবর্গ (২) স্বেচ্ছাচারী ধর্মনেতাগণ (৩) ছূফী ও দরবেশগণ'।[১৩৯] জানা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অতএব যা তাঁর ও তাঁর ছাহাবীগণের আমলে দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল, কেবলমাত্র সেটাই দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে। তার বাইরে কোন কিছুই দ্বীন নয়।

---

১৩৮. আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯।

১৩৯. দারেমী হা/২১৪; মিশকাত হা/২৬৯; শরহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়া ২০৪ পৃঃ।

৫. মেডিটেশন পদ্ধতি নিজের উপরে তাওয়াক্কুল করতে বলে এবং শিখানো হয় যে, 'তুমি চাইলেই সব করতে পার'। এরা হাতে মূল্যবান 'কোয়ান্টাম বালা' পরে ও তার উপরে ভরসা করে।

জবাব : ইসলাম মানুষকে মহাশক্তিধর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে শিখায় এবং আল্লাহ যা চান তাই হয়। এর মাধ্যমে মুমিন নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করে ও পূর্ণ আত্মশক্তি ফিরে পায়। আর ইসলামে এ ধরনের 'বালা' পরা ও তাবীয ঝুলানো শিরক।[১৪০]

৬. তারা বলেন, শিথিলায়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন এক ক্ষমতা তৈরী হয়, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে পারে। এজন্য একটা গল্প বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সে ডিভি ভিসা পেয়ে গেল। তারপর সেখানে ভাল একটা চাকুরীর জন্য মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সেখানে যাওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই উন্নতমানের একটা চাকুরী পেয়ে গেল' *(টেক্সট বুক পৃঃ ১১৫)*। **জবাব :** ইসলাম মানুষকে তাকদীরে বিশ্বাস রেখে বৈধভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বলে। অথচ কোয়ান্টাম সেখানে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে কথিত মনছবির পূজা করতে বলে।

৭. কোয়ান্টামের মতে রোগের মূল কারণ হ'ল মানসিক। তাই সেখানে মনছবি বা ইমেজ থেরাপি ছাড়াও 'দেহের ভিতরে ভ্রমণ' নামক পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরের নানা অঙ্গের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক ভ্রমণ করতে বলা হয়। এতে সে তার সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে এবং নিজেই কম্যাণ্ড সেন্টারের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। যেমন, একজন ক্যান্সার রোগী তার ক্যান্সারের কোষগুলিকে সরিষার দানা রূপে কল্পনা করে। আর দেখে যে অসংখ্য ছোট ছোট পাখি ঐ সরিষাদানাগুলো খেয়ে নিচ্ছে। এভাবে আস্তে আস্তে সর্ষে দানাও শেষ, তার ক্যান্সারও শেষ' *(টেক্সট বুক পৃঃ ১৯৪)*।

৮. এদের শোষণের একটি বড় হাতিয়ার হ'ল 'মাটির ব্যাংক'। যে নিয়তে এখানে টাকা রাখবেন, সে নিয়ত পূরণ হবে। প্রথমবারে পূরণ না হ'লে বুঝতে

---

১৪০. আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২।

হবে মাটির ব্যাংক এখনো সন্তুষ্ট হয়নি। এভাবে টাকা ফেলতেই থাকবেন। কোন মানত করলে মাটির ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। পূরণ না হলে অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এখানে খাঁটি সোনার চেইন বা হীরার আংটি দিতে পারেন। ইমিটেশন দিলে মানত পূরণ হবে না *(প্রশ্নোত্তর)*। এর জন্য একটা গল্প ফাঁদা হয়েছে। যেমন, 'মধ্যরাতে উঠে মাটির ব্যাংকে পাঁচশত টাকা রাখার সাথে সাথে মুমূর্ষু ছেলে সুস্থ হয়ে গেল' *(দুঃসময়ের বন্ধু..)*।

প্রিয় পাঠক! বুঝতে পারছেন, কত সুচতুরভাবে মানুষকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের কম্যাণ্ড সেন্টারে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং সেই সাথে মাটির ব্যাংকে টাকা ও গহনা রাখার ও তা কুড়িয়ে নেবার চমৎকার ফাঁদ পাতা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তা আরোগ্য দানের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ্র হুকুম আছে বলেই মুমিন ঔষধ খায়। ঔষধ আরোগ্যদাতা নয়। বরং আল্লাহ মূল আরোগ্যদাতা। এই বিশ্বাস তাকে প্রবল মানসিক শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। এজন্য তাকে মেডিটেশন বা কম্যাণ্ড সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। মাটির ব্যাংকে টাকা রাখারও দরকার হয় না। বরং 'ছাদাক্বা তার পাপকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়'।[১৪১]

৯. কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা : অন্যান্য বিদ'আতীদের ন্যায় এরাও কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছে মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে দলে ভিড়ানোর জন্য। যেমন-

(ক) 'সকল ধর্মই সত্য' তাদের এই মতবাদের পক্ষে সূরা কাফেরূনের *'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন'* শেষ আয়াতটি ব্যবহার করেছে। যেন আবু জাহলের দ্বীনও ঠিক, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীনও ঠিক। এই অপব্যাখ্যা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকরা ও তাদের অনুসারীরা করে থাকে। কোয়ান্টামের লোকেরাও করছে। অথচ ইসলামের সারকথা একটি বাক্যেই বলা হয়েছে, *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)। একথার মধ্যে সকল ধর্ম ও মতাদর্শকে অস্বীকার করা হয়েছে। কোয়ান্টামের অন্তর্গুরু নামক ইলাহটিকেও বাতিল করা হয়েছে।

---

১৪১. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; মিশকাত হা/২৯।

(খ) তারা বলেন, মেডিটেশন একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ) হেরা গুহায় করেছেন'। অথচ এটি স্রেফ তোহমত বৈ কিছু নয়। নিঃসঙ্গপ্রিয়তা আর মেডিটেশন এক নয়। তাছাড়া বাপ-দাদাদের অনুকরণে প্রথম দিকে এটা করলেও নবী হওয়ার পর তিনি কখনো হেরা গুহায় যাননি। ছাহাবায়ে কেরামও এটি করেননি।

(গ) তারা সূরা জিন-এর ২৬ ও ২৭ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলেছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গায়েবের খবর জানাতে পারেন। অতএব যে যা জানতে চায় আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞান দিয়ে দেন' *(প্রশ্নোত্তর ১৭৫৩)*। অথচ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না। এ সময় তিনি সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট 'অহি' প্রেরণ করেন এবং তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখেন' *(জিন ৭২/২৬-২৭)*। এই 'অহি'-টাই হ'ল গায়েবের খবর, যা কুরআন ও হাদীছ আকারে আমাদের কাছে মওজুদ রয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর 'অহি'-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব কোয়ান্টামের গুরুজী চাইলেও গায়েবের খবর জানতে পারবেন না।

(ঘ) তারা সূরা বুরূজ-এর 'বুরূজ' অর্থ করেন 'রাশিচক্র'। যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রাশিচক্র অনুযায়ী মানুষের ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ নির্ধারণের বিষয়টি তাদের শিষ্যদের মনে গেঁথে যায়। অথচ এটি হিন্দু ও তারকা পূজারীদের শিরকী আক্বীদা মাত্র।

(ঙ) তারা সূরা আলে ইমরানের ১৯১ আয়াতটি তাদের আবিষ্কৃত মেডিটেশনের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন *(প্রশ্নোত্তর ১৭৫৩)*। ঐ সাথে একটি জাল হাদীছকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম' *(প্রশ্নোত্তর ১৭২৪)*। অথচ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি বিষয়ে গভীর গবেষণা তাকে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে'। কোয়ান্টামের কথিত অন্তর্গুরুর কাছে যেতে বলে না। আর হাদীছটি হ'ল জাল। যা আদৌ রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী নয়। কোন

কোন বর্ণনায় ৬০ বছর ও ১০০০ বছর বলা হয়েছে' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭১)*।

পরিশেষে বলব, কোয়ান্টাম মেথডের পূরা চিন্তাধারাটাই হ'ল তাওহীদ বিরোধী এবং শিরক প্রসূত। যা মানুষের মাথা থেকে বেরিয়ে এলেও এর মূল উদ্গাতা হ'ল শয়তান। মানুষকে জাহান্নামে নেবার জন্য মানুষের নিকট বিভিন্ন পাপকর্ম শোভনীয় করে পেশ করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন *(হিজর ১৫/৩৯)*। তবে সে আল্লাহ্র কোন মুখলেছ বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না *(হিজর ১৫/৪০)*। শয়তান নিজে অথবা কোন মানুষের মাধ্যমে প্রতারণা করে থাকে। যেমন হঠাৎ করে শোনা যায়, অমুক স্থানে অমুকের স্বপ্নে পাওয়া শিকড়ে বা তাবীযে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফলে দু'পাঁচ মাস যাবত দৈনিক লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে হাযারো মুসলমানের ঈমান হরণ করে হঠাৎ একদিন ঐ অলৌকিক চিকিৎসক উধাও হয়ে যায়। এদের এই ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়েছিল সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর কওম। যারা পরে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমরাও যদি শিরকের মহাপাপ থেকে দ্রুত তওবা না করি, তাহ'লে আমরাও তাঁর গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। অতএব হে মানুষ! সাবধান হও!![১৪২]

সংযুক্তি

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার্স কোর্স সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য :

(১) কিশোর-কিশোরী হ'তে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যে কেউ গ্রাজুয়েট কোর্স করতে পারে। এই কোর্স করতে কমপক্ষে ৪ দিন লাগে। একই কক্ষে সবার বসার ব্যবস্থা। তবে পুরুষদের আসন ভিন্ন, মহিলাদের আসন ভিন্ন। কিন্তু মাঝে কোন পর্দার ব্যবস্থা নেই। ফলে ইচ্ছা না থাকলেও দেখা-দেখি হ'তেই পারে।

(২) মহিলারা শালীন পোষাকেই অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু তা কোনক্রমেই ইসলামী হিজাব বা মুসলিম নারীর পর্দা নয়। বিভিন্ন ধর্মের মহিলারা একই সমাবেশ স্থলে বসেন। মুসলিম মহিলাদের পর্দা মানতে কোন

১৪২. ১৫তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১২।

বাধা নেই। কিন্তু কোন নির্দেশ বা পরামর্শও দেওয়া হয় না। প্রতিষ্ঠানের মহিলা মহাপরিচালক নাহার আল-বোখারী শালীন পোষাকেই বসেন। কিন্তু কোনক্রমেই তা ইসলামী পর্দা নয়।

(৩) মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকলেও পুরুষদের জন্যে নেই। পুরুষদেরকে ছালাতের বিরতিতে নিকটবর্তী মসজিদে যেতে বলা হয়। কিন্তু অনেকের পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না। উপরন্তু যারা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করেন বা অন্যের সাহায্য নিয়ে মসজিদে যান, তাদের পক্ষে ছালাত আদায় করা খুবই দুরূহ। যেখানে প্রোগ্রাম হয়, সেখানে এসে পথের মুখে অথবা নীচতলাতে বেশ জায়গা থাকে। সাদা চাদর বিছিয়ে দিলেও ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে আয়োজকদের অনীহা দেখা যায়।

(৪) গ্রাজুয়েট হওয়ার পর অনেকগুলি নিয়ম-কানূন মেনে তবে প্রো-মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এই কোর্সের কিছু কিছু আবশ্যিক অঙ্গভঙ্গী হিন্দু সন্ন্যাসী যোগীদের যোগ সাধনার অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিশেষতঃ কোয়ানফি গ্রহণ (মহাকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে অদৃশ্য শক্তি গ্রহণ করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া)। ইসলামী কোন ইবাদত পদ্ধতির সাথে যা আদৌ খাপ খায় না।

(৫) প্রো-মাস্টার্স কোর্সের শেষ দিনে অন্তর্গুরু তথা শহীদ আল-বোখারীর কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে হবে। তবেই কোর্সটি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হবে এবং অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের পথ সুগম হবে। 'মনের বাড়ী'তে বসে প্রথমেই অন্তর্গুরুর কথা স্মরণ করতে হবে এবং তাকে নিজের সব কথা বলতে হবে। অন্তর্গুরুর স্মরণ ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি লাভ হবে না।

(৬) প্রো-মাস্টার্স কোর্সে বায়'আত নেবার পর নিকটস্থ কোয়ান্টাম কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে নিয়মিত দান করতে হবে। এর নাম 'বাইয়াতী কনট্রিবিউশন'। এটি না দিলে অন্তর্গুরু ধ্যানে দেখা দেবেন না, কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হবে না। এই কন্ট্রিবিউশনের ন্যূনতম পরিমাণ হলো মাসিক আয়ের ৫%। এর বেশী দিতে পারলে আয়-উন্নতিতে বরকত হবে, অভাবিত উপায়ে অর্থ আসতে থাকবে। শরীর সুস্থ থাকবে। নিরাময় লাভ নিশ্চিত হবে।

(৭) 'মাটির ব্যাংকে' দান আবশ্যিক। গ্রাজুয়েটরা তো মাটির ব্যাংকে দান নিয়মিতই করবেন, অন্যকেও করতে উৎসাহিত করবেন। প্রো-মাস্টার্সরাও 'বাইয়াতী কন্ট্রিবিউশনে'র বাইরেও মাটির ব্যাংকে দান করবেন। কারণ, 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'। যেকোন বিপদ দূরীভূত করার ও মনের আকাংখা পূরণের জন্যে মাটির ব্যাংকে দানই সর্বোত্তম উপায়।

(৮) মুসলমানদের ধর্ম পালনে উৎসাহিত করা হয় না, নির্দেশও দেওয়া হয় না। তবে কুরআনের বাণী কণিকা আকারে একশ করে বিতরণ করে। সারা বছর ইসলামী কোন প্রোগ্রাম না করলেও রামাযান মাসে 'খৎমে কুরআন' প্রোগ্রাম করে।

(৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য এরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু দুর্গত, দুঃস্থ মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য এদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

(১০) ইসলামী ঈমান-আক্বীদা-আমল বিষয়ে কোন আলোচনা কখনো করা হয় না। বরং সকল সাফল্যের চাবিকাঠি মেডিটেশন বা ধ্যানেই নিহিত এবং অন্ত র্গুরুই তার কাণ্ডারী এই বোধই মনে গেঁথে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস লক্ষণীয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সমস্ত কর্মকাণ্ডে, চিন্তা-চেতনায় সুপরিকল্পিতভাবে অনুপস্থিত।

(১১) কোয়ান্টাম কোর্সের সদস্যরা (গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার্স) এবং এর কর্মকর্তা/স্টাফ কেউই 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করে না। পর্ব অবস্থায়, আলোচনা, প্রার্থনা, লেখা ও বক্তৃতায় এরা বলে 'সৃষ্টিকর্তা'। সম্ভবতঃ আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করলে বা উচ্চারণ করলে হিন্দু, উপজাতি, আদিবাসী, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরা মনক্ষুন্ন হতে পারে এই আশংকায় অংশগ্রহণকারীদের ৮০% মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এরা আল্লাহ শব্দটি কখনই ব্যবহার করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলা তো আরও দূরের কথা। এরা সর্বাবস্থায় বলে 'সৃষ্টিকর্তা'। অথচ এর স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে, আল্লাহ শব্দের কোন লিঙ্গ নেই।

[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিজ্ঞ প্রফেসর (অবঃ)-এর লিখিত বক্তব্য; তাং ২৩.০২.২০১৬ইং; দ্রঃ প্রচারপত্র-৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬]

৩৫. চাই লক্ষ্য নির্ধারণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ভাল ও মন্দের সমষ্টি। যার মধ্যে যেটার আধিক্য, তার আচরণে সেটাই প্রকাশ পায়। হাদীছের ভাষায়, সে আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল অথবা হতভাগ্য পাপাচারী। এই দু'টি মজ্জাগত স্বভাব ও আচরণের মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে। কিন্তু উভয় স্বভাবের লোকই স্ব স্ব প্রয়োজনের তাকীদে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। প্রথম প্রকারের লোকেরা আল্লাহ প্রেরিত সত্য বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চায়। দ্বিতীয় ভাগের লোকেরা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী চলতে চায়। উভয় দলের মধ্যে সুবিধাবাদী কিছু লোক চায় দু'দিক ঠিক রেখে মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে। যদিও আল্লাহ্র বিধান সকলের জন্য সহজ এবং মানুষের স্বভাবধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেকোন চিন্তাশীল জ্ঞানী মানুষ তা স্বীকার করেন। এরপরেও স্বেচ্ছাচারী মানুষ চায় সবকিছু তার ইচ্ছামত চলুক।

বাংলাদেশে চারটি দর্শনের সংঘাত চলছে। (১) ব্যক্তি জীবনে ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী বিধানকে অস্বীকার করেন (২) ব্যক্তিজীবনে স্বীকার করেন ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মান্য করেন। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনে ইসলামী বিধানকে অস্বীকার করেন অথবা অমান্য করেন (৩) উভয় জীবনে ইসলামকে স্বীকার করেন। কিন্তু স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকা অনুযায়ী তা মান্য করতে চান (৪) যারা উভয় জীবনে ইসলামী বিধান মান্য করাকে অপরিহার্য বলেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার কামনা করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্ত নিতে হবে উপরোক্ত চারটি দর্শনের মধ্যে আমরা কোনটাকে বেছে নেব।

ইসলামের মূল আবেদন হ'ল মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া। আর আল্লাহ্র পথ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। যার ব্যাখ্যা হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। কেননা কুরআন রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছে এবং তাঁর কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে এর বাস্তব ব্যাখ্যা তিনিই দান করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সেই রঙে রঞ্জিত। আধুনিক কোন ইসলামী চিন্তাবিদের

বুঝ যদি ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের বিপরীত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব সর্বাগ্রে চাই লক্ষ্য নির্ধারণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ।

বস্তুত যারা ইসলামের বিজয় কামনা করেন, তাদেরকে ইসলামের মৌলিক আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার তথা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর নীতি অনুসরণ করতে হবে। দুনিয়ায় কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাজ করতে হবে। তবেই ইনশাআল্লাহ মুসলমানের হারানো সুদিন ফিরে আসবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, র‍্যাব-পুলিশ আর জনপ্রতিনিধি দিয়ে কখনো সমাজে শান্তি কায়েম করা যায় না। বরং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে আল্লাহভীরু সৎমানুষের নিয়োগের মাধ্যমে সমাজে শান্তি কায়েম করা সম্ভব। তাই নির্বাচনী খেলা বাদ দিয়ে জনগণকে আল্লাহভীরু ও আখেরাতমুখী করার উদ্যোগ নেয়া অধিক যরূরী। যেখানেই নির্বাচন সেখানেই গ্রুপিং ও হানাহানি। তাই নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ইসলামী শাসনেই কেবল সুশাসন আশা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকতে হবে, ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে জামা'আত গঠন করা যাবে, ইলেকশনে জেতার উদ্দেশ্যে দল গঠন নয়। দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ফরয, দ্বীনকে ক্ষমতায় বসানো ফরয নয়। এ দায়িত্ব আল্লাহ্র। তিনি কাকে দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আনবেন, কিভাবে আনবেন, সবই তাঁর এখতিয়ারে। যিনিই ক্ষমতায় আসবেন, মুমিন তার সৎকর্মে সমর্থন দিবে ও অসৎকর্মে প্রতিবাদ করবে। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না। অথচ আজকাল ব্যালটপন্থী হৌক বা বুলেটপন্থী হৌক সকলের একটাই উদ্দেশ্য, ক্ষমতা দখল করা। যা নবীদের তরীকা বিরোধী এবং যা সমাজে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনা।

অতএব সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, মানুষ আল্লাহ্র বিধান মানবে না প্রবৃত্তির গোলাম হবে। প্রবৃত্তির আরেক নাম শয়তান। শয়তান কখনো আল্লাহ্র আনুগত্য করে না। সে সর্বদা চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি দেখিয়ে ও দুনিয়াবী স্বার্থের

সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে তার দলে ভিড়াতে চায়। যদিও সেগুলি মায়া-মরীচিকা ভিন্ন কিছুই নয়। যার প্রমাণ আজকের অশান্ত বিশ্ব। শয়তানের বড় দুশমন হ'ল ইসলাম। আর ইসলামের বড় দুশমন হ'ল শয়তান। অন্যেরা তো সাথে আছেই। কেবল ইসলামী নেতা ও ইসলামের যথার্থ অনুসারীদের যেকোনভাবে হৌক দলে ভিড়াতে পারলেই শয়তান সফলকাম হবে। সেজন্য আপোষকামী ও সুবিধাবাদী ইসলামী নেতাদের 'মডারেট' এবং নিষ্ঠাবান নেতাদের 'মৌলবাদী' লকব দেওয়ার জন্য শয়তান সদা প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

এক্ষণে আমরা যদি আখেরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করি, তাহ'লে আল্লাহ্‌র পথেই থাকতে হবে। শয়তানের লোভনীয় পথে পা বাড়ানো যাবে না। আল্লাহ্‌র পথে থাকলে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিরই কল্যাণ করবেন। কিন্তু শয়তানের পথে গেলে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিই হারাতে হবে। দুনিয়া ভোগ করব আগে, তারপর আখেরাত দেখব, এরূপ লোভী মানসিকতা থাকলে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা বিজয় কেবল দৃঢ়চিত্ত মুমিনের জন্য, দো'দেল বান্দার জন্য নয়। আর আল্লাহ কারু বুকে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি *(আহযাব ৩৩/৪)*। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর (অর্থাৎ তাঁর বিধান মেনে চল), তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। মনে রাখতে হবে মুমিনদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই *(তওবাহ ৯/১১৯)*। তিনি বলেন, আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভয় দেখায়। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/৩৬)*।

পরিশেষে বাংলাদেশে প্রচলিত বিজাতীয় মতবাদ সমূহ এবং ইসলামের নামে প্রচলিত মাযহাবী মতবাদ সমূহের বেড়াজাল ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার জন্য জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৪৩]

১৪৩. ১৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১৪।

৩৬. নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান!

বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ ও শব্দ দূষণের চাইতে ভয়াবহ দূষণ হ'ল মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশন দূষণ। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও বিদ্যুতের লাইনের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এই ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। যা আধুনিক প্রযুক্তি অভিশাপের ডালায় একটি নতুন সংযোজন। ডঃ মার্টিন কুপারের হাতে যা ১৯৭৩ সালে নিউইয়র্কে জন্ম লাভ করে এবং ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে প্রথম বাংলাদেশে চালু হয়। গন্ধ, বর্ণ ও শব্দহীন এই অদৃশ্য ঘাতক তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণের ফলে 'স্লো পয়জন'-এর মতো দেশে ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির উদ্ভব ঘটেছে। মানুষ ও জীবজগতের সবাই এই মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মোবাইল টাওয়ার লোকালয়, বাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে স্থাপিত হওয়ায় এই ঝুঁকি শতগুণ বেড়ে গেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রেডিয়েশনের মাত্রা মনিটর করা হলেও আমাদের দেশে তার ব্যবস্থা নেই। ফলে লোভী কোম্পানীগুলো যত্রতত্র টাওয়ার বসাচ্ছে আর মানুষ অল্প কিছু টাকার জন্য এই আত্মঘাতি পথে প্রলুব্ধ হচ্ছে। যেখানে-সেখানে বিল্ডিংয়ের মাথায় প্রায় দু'টন ও তার অধিক ওজনের টাওয়ারগুলি বসানো হচ্ছে। যা পরে ঐ বিল্ডিং-এর জন্য মরণ ফাঁদে পরিণত হয়।

গত বছর ২৩শে এপ্রিলে সাভারের নয় তলা রাণা প্লাজা ধসের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই বিধ্বংসী মোবাইল টাওয়ার, যা ঐ প্লাজার ছাদে বসানো ছিল। যাতে ১১৩৫ জন হতভাগ্য মানুষের জীবন্ত সমাধি হয় এবং শত শত মানুষ পঙ্গু হয়। বিশ্বে মন্দ রেকর্ড সৃষ্টিকারী এতবড় ধ্বংসলীলার পরেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়লে এইসব টাওয়ারযুক্ত বিল্ডিংগুলির অবস্থা ও সেখানে বসবাসকারীদের অবস্থা কেমন হবে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সেই সাথে টাওয়ারের বৈদ্যুতিক তার থেকে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে বিস্তীর্ণ এলাকা ভস্মীভূত হতে পারে। টাওয়ারের ওজন সইতে না পেরে যদি কোন বিল্ডিং এভাবে ধসে পড়ে, তাহ'লে অগণিত রাণা প্লাজা ধসের ঘটনা ঘটে যাবে সারা দেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাদে এই টাওয়ার বসানো হয়েছে। ফলে এই বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক-ছাত্র এখন ক্যান্সার আতংকে রয়েছেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত উদয়ন স্কুলের ছাদে কয়েকটি মোবাইল কোম্পানী টাওয়ার বসিয়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের আতংক ও প্রতিবাদকে আদৌ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। দৈনিক ৬/৭ ঘণ্টা ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে অবস্থান করে। স্কুলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাযার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক এইসব টাওয়ারের সার্বক্ষণিক বিকিরণের অসহায় শিকার। এভাবে অর্থলোভী দালান মালিক ও টাওয়ার মালিকদের যোগসাজশে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে মানুষ ও জীবজগত। বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে যেসব প্রতিষ্ঠানের ছাদে বা কাছাকাছিতে টাওয়ার বসানো হয়েছে, তার বিকিরণের কুপ্রভাবে এখনকার শিশুরা ২০ বছর পরে লিউকোমিয়া (রক্তস্বল্পতা), ক্যান্সার, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ করে যারা এসব টাওয়ারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অর্থাৎ লাইন ম্যান, ইলেকট্রিক অপারেটর বা অনুরূপ পেশায় দায়িত্বরত, তারাই এসব রোগে দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া এইসব লাইনের নিকটবর্তী এবং দুই টাওয়ারের মধ্যবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করে, তারা দূরবর্তীদের তুলনায় বেশী এবং দ্রুত আক্রান্ত হয়।

মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশনের কারণে মানুষের ব্রেইন টিউমার, ক্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, নিদ্রাহীনতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও গর্ভপাত সহ মারাত্মক রোগসমূহ অকল্পনীয় মাত্রায় বেড়ে গেছে। এছাড়াও এর রেডিয়েশন আমাদের মগযের মধ্যে ঢুকে ডিএনএ ভেঙ্গে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। দেহের নার্ভের সেল নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং মানুষ পারকিনসন্স, আলঝেইমার্স প্রভৃতি শিরাঘটিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'তে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে দেশে একটি বিকলাঙ্গ ও অকেজো প্রজন্ম সৃষ্টি হ'তে পারে। শুধু মানুষ নয়, টাওয়ারের বিকিরণের ফলে পশু-পক্ষী ও জীবজগতের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। নারিকেল গাছের ফলন কমে যাচ্ছে। অকালে নারিকেল ঝরে পড়ছে। অধিকাংশ ডাব-নারিকেলে পানি নেই।

এইসব রোগের বাহ্যিক লক্ষণ হ'ল শরীরে ঝিম ঝিম ভাব হওয়া, অবসাদ, বিষণ্ণতা, অহেতুক ভয় করা এবং কাজে অমনোযোগী হওয়া, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া। অধিক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীগণ ইতিমধ্যেই এসব রোগে ভুগতে শুরু করেছেন। মোবাইল ব্যবহারের ফলে দেশের

অগণিত শিশু এখন 'অটিজমে' (মানসিক প্রতিবন্ধী) আক্রান্ত হচ্ছে। এতে পরিবার, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমেই এক দারুণ অরাজকতা। দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে।

সতর্কতা : (১) কর্ডলেস ফোন ও মোবাইলের ব্যবহার কমিয়ে দিন। ল্যাণ্ডফোন ব্যবহার করুন। কেননা তারযুক্ত হওয়ায় এটি অনেকটা নিরাপদ। (২) একটানা ৬ মিনিটের বেশী মোবাইল ফোনে কথা বলবেন না। তাতে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হতে পারে। (৩) মোবাইল ফোন শিশুদের থেকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরে রাখুন এবং রাতে ঘুমানোর সময় কমপক্ষে ৭ ফুট দূরে রাখুন (৪) কাছে বা বালিশের নীচে রেখে ঘুমাবেন না। এর নীরব রেডিয়েশন তার ঘুমন্ত মালিককে হত্যা করবে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি মোবাইল ফোন এক একটি মৃত্যুদূত সমতুল্য। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসব ক্ষতি বুঝতে পেরেই আমেরিকা সহ উন্নত দেশগুলি ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে এবং তারা এখন এগুলি তৃতীয় বিশ্বে চালান করে দিচ্ছে। আর এটাই তাদের চিরন্তন বদস্বভাব। অথচ বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার হু হু করে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে যার গ্রাহক সংখ্যা ৫ কোটিরও অধিক।

সুফারিশ : (১) লোকালয় থেকে বহু দূরে টাওয়ার স্থাপন করতে হবে। যার উচ্চতা কমপক্ষে ৪০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান হবে। যা ভূমি থেকেই কেবল উক্ত উদ্দেশ্যে স্থাপিত হবে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে। (২) টাওয়ারের রেডিয়েশন মাত্রা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হ'তে হবে। যা মনিটরিং করার মতো নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনবল মোবাইল কোম্পানীগুলির থাকতে হবে। অথচ এরূপ কোন মেশিন ও যন্ত্রপাতি কোম্পানীগুলির দূরে থাক, খোদ সরকারী বিটিআরসি-র কাছেই নেই। (৩) মোবাইল ফোন ব্যবহারে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে এবং টাওয়ার বসানোর ব্যাপারে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (৪) টাওয়ার বিহীন মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালুর ব্যাপারে কোম্পানীগুলিকে বাধ্য করতে হবে। (৫) নীরব ঘাতক এইসব টাওয়ার স্থাপনের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং যেসব টাওয়ার বসানো হয়ে গেছে, সেগুলি দ্রুত সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৪৪]

---

১৪৪. ১৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১৪।

৩৭. বিশ্বকাপ না বিশ্বনাশ?

৮ জন নিরীহ শ্রমিকের লাশের উপর দাঁড়িয়ে ল্যাংটা মেয়েদের নাচানাচি ও আতশবাজির মধ্য দিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ফুটবলের ২০তম বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে গত ১৩ই জুন'১৪ শুক্রবার থেকে। যা শেষ হবে আগামী ১৪ই জুলাই সোমবার। অর্থাৎ ১৫ই শা'বান থেকে ১৬ই রামাযান পর্যন্ত মাসাধিক কাল যাবৎ লেখাপড়া, ইবাদত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সমূহ চরমভাবে ব্যাহত হবে। ২২০টিরও বেশী দেশে এই ফুটবল খেলা দেখানো হচ্ছে। যা বাংলাদেশে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত চলে। ৩২টি দল যে সোনার ট্রফির জন্য লড়ছে, সেটি নকল ট্রফি। আসলে ব্যাপারটি অন্যখানে। এটি এখন খেলা নয়। বরং পুঁজিপতিদের বিশ্ববাণিজ্যের জন্য পাতানো ফাঁদ মাত্র। সার্কাসের হাতি-বানরগুলির মত এরা ভাড়াটে খেলোয়াড়দের কাজে লাগায় পয়সা উপার্জনের জন্য। সেকারণ বিশ্বকাপকে এখন বলা হয় 'মানি মেশিন' বা টাকা বানানোর যন্ত্র। অথচ বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষ এর মাধ্যমে কিছুই পায়না কেবল ক্ষতি ছাড়া। আর তাই খোদ ব্রাজিলেই চলছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও মিছিল-মিটিং। সেদেশের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য খ্যাতনামা ফুটবলার রোমারিও পর্যন্ত বিশ্বকাপ আয়োজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা ক্রিকেটার অ্যালান ডোনাল্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেট বন্ধ করে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন কয়েক বছর আগে। কিন্তু কে শুনবে কার কথা? সর্বত্র বিবেকহীনদের জয়-জয়কার। নিষ্ঠুর পুঁজিপতিচক্র ও তাদের বশংবদ জাতীয় সরকার এবং মিডিয়ার মত আসুরিক শক্তি এর পিছনে কাজ করছে। সবকিছু ধ্বংস হৌক, তাদের চাই টাকা, কেবলি টাকা। আল্লাহ বলেন, অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও। কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনোই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে' *(তাকাছুর ১০২/১-৪)*।

ক্ষতিসমূহ :

১. সময়ের অপচয় :

এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অথচ এটাই সবচেয়ে সস্তায় ব্যয় হয়। সময়ের মূল্য সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকদের হিসাব মতে একটানা টিভি দেখলে প্রতি ঘণ্টায় ২২ মিনিট আয়ু কমে যায়। এক্ষণে কেউ যদি দিবারাত্রি ক্রিকেট আর রাত জেগে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখে, যা প্রায় সারা বছর ধরেই চলে প্রায় সব দেশে, তাহ'লে মানুষের বিশেষ করে তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ কি? তাদের দ্বারা দেশ ও জাতি কি আশা করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তুমি পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত মনে কর। (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে'।[১৪৫]

২. অর্থের অপচয় :

প্রিয় দলের জার্সি ও সেদেশের পতাকা বানানো ও টাঙানো থেকে শুরু করে কত ধরনের যে অর্থের অপচয় হয়, তার হিসাব করা সম্ভব নয়। খেলা হচ্ছে ব্রাজিলে কিন্তু উন্মাদনায় কাঁপছে বাংলাদেশ। মনে হচ্ছে যেন দেশে কোন সমস্যাই নেই। সম্প্রতি ঝিনাইদহে ১০ কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ পতাকা ও তার পিছনে কয়েকশ' তরুণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, আমরা অমুক দলের সমর্থক। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, এতে কোন ফায়েদা নেই। কেননা খেলায় হারজিত থাকবেই। এটা ভাগ্যের ব্যাপার। এ বছরের শুরুতে ঢাকায় আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট আয়োজনে আমাদের সরকার নাকি ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। যার সবটুকুই পানিতে গেছে। যে দেশের মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, সেদেশের সরকারের এই অপচয়ের শাস্তি জনগণ দিতে পারবে না। কিন্তু মহান বিচারক আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারবে কি? আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী যারা হজ্জ ও কুরবানী না করে সে পয়সা গরীবদের দিতে বলেন, তারা কিন্তু বিশ্বকাপের সর্বগ্রাসী অপচয়ের বিরুদ্ধে টুঁ

১৪৫. হাকেম হা/৭৮৪৬; মিশকাত হা/৫১৭৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৫৫।

শব্দটি করেন না। সেই সাথে রয়েছে বাজিকরদের জুয়া। যাতে দৈনিক সর্বস্ব খোয়ায় হাযারো মানুষ।

৩. লেখাপড়ার ক্ষতি :

বিশ্বকাপ উন্মাদনার বড় শিকার হ'ল তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজ। এরা লেখাপড়া ছেড়ে রাত জেগে খেলা দেখছে। আর নিজ হাতে নিজেদের লেখাপড়া ও স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। সারা দিন হৈ হৈ আর শ্লোগান দিচ্ছে প্রিয় দলের নামে। ওঠায়-বসায়-খাওয়ায় একটাই আলোচনা 'বিশ্বকাপ'। এভাবে জাতির মেরুদণ্ড তরুণ সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

৪. নৈতিক স্খলন, পাপাচার ও হত্যাকাণ্ড :

বিশ্বকাপের উন্মাদনায় পৃথিবীতে পাপাচারের সয়লাব বয়ে যায়। বিশেষ করে যেসব দেশে ধর্মীয় কালচার নেই বা থাকলেও শিথিল, সেসব দেশকে নৈতিক স্খলন ও পাপাচার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত গ্রাস করে। ব্রাজিল হ'ল ফ্রি সেক্সের দেশ। তদুপরি বিশ্বকাপ মওসুমে সেদেশের হোটেলগুলিতে এখন দেহ ব্যবসা রমরমা। সেখানকার বিশ্বকাপ ভেন্যুগুলি এখন অঘোষিত পতিতাপল্লী। সেই সাথে রয়েছে প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে ছিনতাই, রাহাযানি ও হত্যাকাণ্ড। যার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে সেদেশের বিবেকবান মানুষ। গত ১৮ই জুন নাটোরে জনৈকা কৃষকবধু (২২) তার রাত জেগে টিভিতে খেলা দেখা স্বামীকে (২৫) হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে নিজ ঘরেই হত্যা করেছে। কিন্তু তাতে কি বিবেক জেগেছে আমাদের?

কাতার বিশ্বকাপ : আগামী ২০২২ সালের বিশ্বকাপ হবে কাতারে। ২০১২ সাল থেকেই শুরু হয়েছে তার প্রস্তুতি। কেবল অবকাঠামো নির্মাণে খরচ হবে ২০০ বিলিয়ন ডলার। খেলার পরে যা পড়ে থাকবে নষ্ট বর্জ্যের মত। তাহ'লে কেন এই অপচয়? অথচ আল্লাহ বলেন, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ১৭/২৭)*। লণ্ডনের বিখ্যাত 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের প্রচণ্ড গরমে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে প্রয়োজনীয় পানি ও ন্যায্য পারিশ্রমিক বঞ্চিত হতভাগ্য শ্রমদাসদের অধিকাংশ নেপাল, ভারত ও শ্রীলংকার নাগরিক। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১২ জন শ্রমিক মারা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বকাপের পর্দা ওঠার আগেই সেখানে অন্ততঃ ৪০০০ শ্রমিক

Contents

মারা যাবে। এদের অধিকাংশের বয়স ২০ বছরের নীচে। বর্তমানে সেখানে দৈনিক ১২ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। আগামীতে আরও ১০ লাখ যোগ দেবে। ব্যাপক সমালোচনার জবাবে আয়োজক কমিটি ও সরকার মুখস্ত গৎ বলছেন, সবকিছু আইন মোতাবেক চলছে। কোন অসঙ্গতি থাকলে প্রমাণ সাপেক্ষে তারা ব্যবস্থা নেবেন'। অসহায় বিদেশী শ্রমিকরা হিংস্র সরকারী ঠিকাদার ও নিষ্ঠুর প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কিভাবে সেখানে প্রমাণ উপস্থাপন করবে? তাহ'লে কি মরু বালুকার বুক চিরে বেরিয়ে আসা আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা তেলের টাকায় ফেঁপে ওঠা মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবেররা শ্রমিকদের রক্তে ভেজা মাটিতে বিশ্বকাপের জাহান্নামী আসর সাজাতে চায়?

পরিশেষে বলব, বিশ্বকাপ খেলা কখনো বিশ্বকে বাঁচায় না, বরং বিনাশ করে। তাই এসব সর্বনাশা প্রতিযোগিতা অবিলম্বে বন্ধ করুন। মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহিতার ভয় থেকে সর্বাগ্রে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হৌন। তরুণ সমাজ এগুলি বয়কট কর। যদি তোমরা বাঁচতে চাও। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৪৬]

৩৮. আত্মহত্যা করবেন না

মানুষ আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় এবং সেরা সৃষ্টি *(ইসরা ১৭/৭০)*। মানুষকে আল্লাহ 'নিজের দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। অতএব জীবন দানের মালিক যিনি, তিনিই কেবল জীবন নিতে পারেন। কেউ তাতে অন্যায়ভাবে হস্ত ক্ষেপ করলে সে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামী হবে। তাই তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি সাবধান করে বলেন, যদি কেউ সীমা লংঘন ও অত্যাচার বশে এ কাজ করে, তাহ'লে সত্বর আমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব' *(নিসা ৪/৩০)*। অতঃপর যদি কেউ আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞাকে সম্মান করে আত্মহত্যার মত কঠিন পাপ থেকে বিরত হয়, তার জন্য মহা পুরস্কার ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত হও, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহ'লে

১৪৬. ১৭তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৪।

আমরা তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব' (অর্থাৎ জান্নাত দান করব) *(নিসা ৪/৩১)*।

আত্মহত্যা মহাপাপ। এরপরেও মানুষ আত্মহত্যা করে। নিঃসন্দেহে সেটি করে যখন তার সামনে কোন উপায়ান্তর থাকে না। এরপরেও কোন মুমিন আত্মহত্যা করতে পারে না। কারণ এটা করলে সে ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাবে। তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, উপায়-উপাদানের মালিক আল্লাহ। নিরুপায় মানুষ আল্লাহ্র উপর একান্ত ভরসা করে বৈধ পন্থায় চেষ্টা করে গেলে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য উত্তম পথ সমূহ বের করে দিবেন। এ ব্যাপারে তিনি তার অনুগত বান্দাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তিনি উপায় বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রূযী দেন, যা সে কল্পনাও করেনি' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। তিনি বলেন 'যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। আল্লাহ্র এরূপ দৃঢ় আশ্বাস সত্ত্বেও অস্থিরচিত্ত মানুষ আত্মহত্যা করে। সে নিজে মরে, পরিবারের মুখে চুনকালি মাখায়। তাতে বংশের বদনাম হয়। দেশের সম্মান নীচু হয়।

'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে গত চার বছরে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে। যাদের বড় অংশের বয়স ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ২৫৫৫ জন আত্মহত্যা করত। এখন করছে বছরে গড়ে ১০ হাযারের বেশী। এছাড়াও যারা দেশের বড় বড় হাসপাতালের যরূরী বিভাগে ভর্তি হয়, তাদের শতকরা ২০ ভাগ আত্মহত্যার চেষ্টাকারী। ১০ই সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' (WHO)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি ২ সেকেণ্ডে একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং প্রতি ৪০ সেকেণ্ডে একজন আত্মহত্যায় সফল হয়। উক্ত সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০১১ সালে আত্মহত্যায় বিশ্বে ভারতের স্থান ছিল ১৬ এবং বাংলাদেশের ৩৮। ২০১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১ ও ১০। অর্থাৎ প্রতি বছর এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মীয় কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে কম।

আমাদের সরকারী হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের উঠতি যুবশক্তির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। যারা দেশের মেরুদণ্ড এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারাই যদি আত্মহত্যা করে, তাহ'লে দেশের চালিকাশক্তি কারা হবে? এরপরেও এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশী। যেটা আরও ভীতিকর। কেননা মায়ের জাতি যদি এভাবে শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে আগামী দিনের তরুণ শক্তি আসবে কোত্থেকে? আর্থিক অনটন ও বেকারত্ব এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় কারণ। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। কেননা উন্নত দেশগুলিতে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী।

আত্মহত্যার কারণ প্রধানতঃ ৩টি। (১) হতাশা : যেকোন কারণেই এটা হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। অতএব মুমিন কখনো হতাশায় ভোগে না। (২) অধিক পাওয়ার আকাংখা : যারা অল্পে তুষ্ট হতে পারে না। বরং সর্বদা অধিক পাওয়ার আকাংখায় পাগলপারা হয়। তারা তা না পেয়ে আত্মহত্যা করে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে তোমাদের অধিক পাওয়ার আকাংখা'। 'যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। অতএব মুমিন সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকে। (৩) অতি ক্রোধ : ক্রোধান্ধ মানুষ যা খুশী করতে পারে। অন্যায় যিদ তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না। পরবর্তী প্রশ্নগুলিতে তিনি একই কথা বলেন।[১৪৭] তিনি বলেন, বীর সে নয়, যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং বীর সেই যে নিজের ক্রোধকে সামলে নেয়'।[১৪৮] তিনি বলেন, ক্রুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ো, বসে থাকলে পার্শ্বে ঠেস দাও। অথবা *'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম পড়ো'*।[১৪৯] অনেক সময় দেখা যায়, বাবা-মা মোবাইল কিনে না দেওয়ায় সন্তান আত্মহত্যা করে। এগুলি অতি ক্রোধ ও অন্যায় যিদের কুফল।

---

১৪৭. বুখারী হা/৬১১৬; মিশকাত হা/৫১০৪।

১৪৮. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯; মিশকাত হা/৫১০৫।

১৪৯. বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০; মিশকাত হা/২৪১৮।

বাঁচার উপায় : (১) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা। যেটা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই নেই। বাংলাদেশে যার অবস্থা অতীব করুণ। সরকার ও সমাজ নেতাদের উচিত এদিকে সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া। নইলে তারা আল্লাহ্‌র কাছে জওয়াবদিহি করতে পারবেন না। (২) তাক্বদীরে বিশ্বাস মযবুত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। যখন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। আবার যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়, তখন ছবর করে। উভয় অবস্থায় সে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়'।[১৫০] (৩) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের ৭০ হাযার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। যারা কখনো ঝাড়ফুঁক নেয়নি, শুভাশুভ গণনা করেনি। বরং সর্বাবস্থায় তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করেছে'।[১৫১]

আত্মহত্যার পরিণতি : এর পরকালীন পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, তাকে সেই বস্তু দ্বারা ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে ফাঁসি দিয়ে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে সেভাবেই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।[১৫২] যখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার আগেই নিজের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছে। অতএব তার উপরে আমি জান্নাতকে হারাম করে দিলাম'।[১৫৩] এমনকি জিহাদের ময়দানে যখমের যন্ত্রণায় আত্মহত্যাকারী একজন বীর মুজাহিদকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামী বলেছেন।[১৫৪] অতএব হে মুমিন! আত্মহত্যা করা থেকে বিরত হও![১৫৫]

---

১৫০. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।
১৫১. বুখারী হা/৬৪৭২; মুসলিম হা/২১৮; মিশকাত হা/৫২৯৫।
১৫২. বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪।
১৫৩. বুখারী হা/১৩৬৪; মুসলিম হা/১১৩; মিশকাত হা/৩৪৫৫।
১৫৪. বুখারী হা/৪২০৩; মিশকাত হা/৫৮৯২।
১৫৫. ১৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৪।

৩৯. চরিত্রবান মানুষ ও নেতা কাম্য

সুন্দর দেশ ও সমাজ গড়তে গেলে চরিত্রবান মানুষ ও নেতা আবশ্যক। যা ব্যতীত সুষ্ঠু সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সেকারণ যুগে যুগে আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে পাঠিয়েছেন। কারণ কেবল কথা শুনে নয়, বরং সুন্দর চরিত্র ও আচরণ দেখে মানুষ মানুষকে ভালবাসে ও তাকে অনুসরণ করে। মূসা (আঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে কুরআনে বলা হয়েছে, ‘শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর নবুঅত-পূর্ব জীবনে ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত) বলে খ্যাত ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর নেতৃত্বের ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। নবুঅত লাভের পর স্বার্থান্বেষীরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়। এমনকি তারা তাঁকে ‘কাযযাব’ (মহা মিথ্যাবাদী) বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

নাস্তিক ও মুনাফিকরা আরও নোংরা কথা বলে থাকে। সেকারণ আল্লাহ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সত্যায়ন করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী’ *(কলম ৬৮/৪)*। খ্যাতনামা তাবেঈ সা‘দ ইবনু হিশাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মুমেনীন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়োনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবীর চরিত্র ছিল কুরআন’।[১৫৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য।[১৫৭] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে তার সচ্চরিত্রতা’।[১৫৮] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ’ল মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, আল্লাহভীরুতা ও সচ্চরিত্রতা। আবার প্রশ্ন করা হ’ল সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, ‘যবান ও লজ্জাস্থান’।[১৫৯] তিনি বলেন,

---

১৫৬. আহমাদ হা/২৪৬৪৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৮১১।

১৫৭. হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫।

১৫৮. আবুদাঊদ হা/৪৭৯৯; তিরমিযী হা/২০০৩।

১৫৯. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; মিশকাত হা/৪৮৩২; ছহীহাহ হা/৯৭৭।

‘যে ব্যক্তি তার যবান ও লজ্জাস্থানের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব’।[১৬০] তিনি বলেন, ‘যদি তোমাদের উপর কোন নাক-কান কাটা ব্যক্তিও আমীর হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তার কথা শোন ও আনুগত্য কর’।[১৬১] তিনি বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা‘আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়। কেননা শয়তান থাকে একক ব্যক্তির সাথে। আর যখন কোন পরপুরুষ কোন পরনারীর সাথে নিরিবিলি হয়, তখন সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান’।[১৬২]

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার যে, চরিত্রবান মানুষ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব ব্যতীত সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব নয়। আর সুন্দর জীবনের স্বপ্ন নিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমাদের দেশে কতটুকু হয়েছে?

বাস্তবতা :

স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর আমরা আমাদের রক্তে গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে কেমন উন্নতি করেছি, নিম্নোক্ত রিপোর্টে কিছুটা হ’লেও তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পাবে। সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরের সমাজচিত্র নিয়ে বেসরকারী একটি সংস্থার জরিপে যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ : রাজশাহী মহানগরীতে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ৫ শতাধিক ছাত্রী, যাদের বয়স ১৩ থেকে ২৬-এর মধ্যে, তারা নিয়মিত দেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত। মহানগরীর ৮টি হোটেলে খোলামেলাভাবেই এবং নামী-দামী হোটেলগুলিতে চলে গোপনে। এছাড়াও ১৫ থেকে ২০টি আবাসিক হোটেল, বিউটি পার্লার, ম্যাসেজ পার্লার ও রেস্ট হাউজে চলছে রমরমা দেহব্যবসা। ছোট-বড় অন্ততঃ ১০টি হোটেলে নির্মিত হচ্ছে পর্ণো ছবি। শিক্ষানগরী বলে খ্যাত রাজশাহীর মত একটি শান্ত ও সুন্দর নগরীর ভিতরকার এই কলংকিত চিত্র বেরিয়ে আসার পর শিল্পনগরী ও বন্দর নগরী বলে খ্যাত চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরী এবং বিশ্বের এক নম্বর দূষিত নগরী বলে খ্যাত রাজধানী ঢাকার

---

১৬০. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।

১৬১. মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

১৬২. তিরমিযী হা/২১৬৫; নাসাঈ কুবরা হা/৯২২৪; আহমাদ হা/১১৪; হাকেম হা/৩৮৭; মিশকাত হা/৬০০৩।

অবস্থা কেমন, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় কি? সেই সাথে রয়েছে ইভটিজিং, লিভ টুগেদার ও সমকামিতার মত পশুস্বভাবের বিস্তার। যার অধিকাংশ পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির ভয়াল আগ্রাসন মাত্র।

কারণ :

যুবসমাজের এই অধঃপতনের কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। যেমন (১) শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী নৈতিকতার অভাব (২) আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন ও পর্ণোছবি (৩) মাদকের ছড়াছড়ি (৪) অভাবের তাড়না (৫) শখ বা বিলাসিতার অর্থ যোগান (৬) প্রতারণার ফাঁদ (৭) অভিভাবকদের শৈথিল্য ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ইত্যাদি।

প্রতিকার :

প্রতিকার হিসাবে বলতে পারি, (১) ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা (২) নারী-পুরুষের সহশিক্ষা ও সহচাকুরী বন্ধ করা (৩) মসজিদ ও পঞ্চায়েতগুলিতে ধর্মীয় উপদেশ ও সামাজিক শাসন বৃদ্ধি করা (৪) পারিবারিক অনুশাসন ও তদারকি বৃদ্ধি করা (৫) ধর্ম ও সমাজ বিরোধী মেলা ও অনুষ্ঠান সমূহ বন্ধ করা (৬) বিদেশী সংস্কৃতি বর্জন করা ও বিদেশী মন্দ চ্যানেলগুলি বন্ধ করা (৭) ইন্টারনেট ও মোবাইলের মন্দ ব্যবহারের সুযোগগুলি বিনষ্ট করা (৮) সেই সাথে প্রয়োজন এমন শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন, যা এই মন্দ স্রোতকে বাধা দিবে এবং তার স্থলে সুস্থ স্রোত প্রবাহিত করবে। মুরব্বী, যুবক, বালক ও মহিলাদের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার যতবেশী ঘটবে এবং মন্দ প্রতিরোধকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হবে, তত দ্রুত স্ব স্ব পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে *ইনশাআল্লাহ*। নিঃসন্দেহে এটি হ'ল সমাজ বিপ্লবের স্থায়ী পথ এবং এটিই হ'ল নবীগণের পথ। যে পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। এ পথে জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাটাই হ'ল প্রকৃত জিহাদ। এ জিহাদে নিহত হলে শহীদ। এমনকি বিছানায় মরলেও শহীদ।[১৬৩] অতএব কেবল উপদেশ নয়, বরং জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে আল্লাহ্র নামে সমাজ সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে সমাজ

১৬৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮।

পরিবর্তনে দৃঢ়পদে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে লজ্জিত হ'তে হবে।

মানব কল্যাণে আল্লাহ্র বিধানসমূহ নাযিল হ'লেও যুগে যুগে মানুষ নিজেরা নানাবিধ আইন-কানূন তৈরী করেছে। কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য যে, নৌকা যেমন শুকনা ডাঙ্গায় চলে না, আল্লাহ্র আইন মান্য করা ব্যতীত তেমনি সামাজিক শান্তিও আসে না। যেকোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে, সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ হ'ল ধর্মবিমুখতা। অথচ দেশের নির্বাচিত কোন সরকারই ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেন না। এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ইসলামের প্রসার চান না। ফলে দেশ ক্রমেই রসাতলে যাচ্ছে।

একটি ছবি ও তার পরিণতি : ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। কেন হারাম? তার একটি প্রমাণ নিন। সম্প্রতি মস্কো শহরে একই দিনে পরপর ৫৭১টি গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটে। দিশেহারা পুলিশ কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখে যে, সবগুলো দুর্ঘটনাই ঘটেছে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে।

মস্কোর একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিজ্ঞাপনে নয়া চমক আনতে গিয়ে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। আর তা হ'ল, ৩০টি ট্রাকের গায়ে নারীর নগ্ন ছবি সেঁটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরানো। আর ঐ ছবির উপর তারা আড়াআড়ি লেবেলের উপর লিখে দেয়, 'এরা নজর কাড়ে'। চলমান ট্রাকের উপর তাক লাগানো ফ্লেক্সে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই ফন্দি কার্যকর করতে গিয়েই ঘটে যায় এই বিপত্তি। অথচ আমাদের দেশে এর চেয়েও মারাত্মক পর্ণো ছবি মোবাইলে ও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে হর-হামেশা। প্রশাসন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করেন। হয়তবা সেখানে কোন দুনিয়াবী স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। ফলে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। সরকার, পুলিশ, আদালত সবই আছে, নেই কেবল আল্লাহভীরুতা। সচ্চরিত্রবান মানুষ ও সমাজ গড়ার যা একমাত্র হাতিয়ার। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। অতএব শোনার মত কান ও বুঝার মত হৃদয় যাদের আছে, তারা এগিয়ে আসবেন কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৬৪]

---

১৬৪. ১৮তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৪।

৪০. ১লা বৈশাখ ও নারীর বস্ত্রহরণ

গত ১৪ই এপ্রিল'১৫ মঙ্গলবার ১লা বৈশাখের দিবাগত সন্ধ্যায় 'বর্ষবরণ' অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইটে কয়েকজন নারী যৌন হামলার শিকার হয়েছেন। তারা তাদের বস্ত্র হারিয়েছেন ও সংস্কৃতিবাজ দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লিটন নন্দী তাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের হাত ভেঙ্গেছেন। বর্তমানে যিনি হাসপাতালে আছেন। শাড়ী-ব্লাউজ হারানো একটি মেয়েকে উদ্ধার করে তিনি রিকশায় তুলে দিয়েছেন ও নিজের গায়ের জামাটি খুলে মেয়েটির গায়ে ছুঁড়ে মেরে তার লজ্জা নিবারণে সাহায্য করেছেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাই, মেয়েটা মারা যাচ্ছে ওকে বাঁচতে দিন'।[১৬৫] আমরা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে আমরা উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

১৩১টি ভিডিও ক্যামেরার ফুটেজে ঐসব দুর্বৃত্তের ছবি এসেছে। অথচ তিন স্তরের নিশ্ছিদ্র পুলিশী নিরাপত্তার কোন নমুনা সেদিন দেখা যায়নি। গত এক সপ্তাহেও পুলিশ তাদের কাউকে ধরতে পারেনি। কারণ সরকারের মুখপাত্র বলেছেন, 'এ রকম কোন ঘটনার প্রমাণ আমরা পাইনি'। এমতাবস্থায় পুলিশ কিভাবে বলবে যে, আমরা প্রমাণ পেয়েছি? অতএব এখন তারা গণরোষ থেকে বাঁচার জন্য কয়েকদিন দৌড়ঝাঁপ করবে ও 'তদন্ত চলছে' বলে লোকদের সান্তনা দিবে। তারপর একদিন সবাই ভুলে যাবে। যেমন প্রতি বছরের এরূপ ঘটনাগুলি মানুষ ভুলে গেছে।

বিগত ২০০০ সালের থার্টি-ফার্স্ট নাইট (৩১শে ডিসেম্বর) উদযাপনের সময় একই টিএসসি চত্বরে গভীর রাতে 'বাঁধন' নামে এক তরুণীকে বিবস্ত্র করা হয়। তৎকালীন সরকারী দলের বহু আলোচিত এমপি জয়নাল হাজারী এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং নারীকে পর্দার প্রচলিত সামাজিক প্রথা মেনে চলার পরামর্শ দেন। সাথে সাথে তিনি এই বেলেল্লাপনা সংস্কৃতি বন্ধের দাবী জানান। তিনি সংস্কৃতির নামে এই উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে বই লিখে মানুষের মধ্যে ফ্রি বিতরণ করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত গঠনের চেষ্টা

১৬৫. দৈনিক প্রথম আলো ২০শে এপ্রিল'১৫, শিরোনাম।

করেন। ফলে কথিত নারীনেত্রী ও সংস্কৃতিকর্মীরা হাজারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তারা বাঁধনের বস্ত্রহরণের বিষয়টিকে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বলে প্রচার করে নিজেদের প্রগতিশীলতা যাহির করেন। হ্যাঁ, ১৫ বছর আগের সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাই এবার সর্বসমক্ষে এক ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে তারা ‘অবিচ্ছিন্ন ঘটনা’য় পরিণত করল। অন্যান্য শহরেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে পত্রিকায় এসেছে। সেদিনের মত এদিনও চিহ্নিত এইসব নেতা-নেত্রীরা চুপ আছেন। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা গা ছাড়া ভাব। যখন উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করার দাবী উঠেছে সর্বত্র, তখন যারা নারীর অধিকার নিয়ে নিত্যদিন গলাবাজী করেন এবং কথায় কথায় আলেম-ওলামাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, সেই সব এনজিও নেত্রী ও কথিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা আজ নীরব কেন?

একজন সুপরিচিত প্রবীণ কথাসাহিত্যিক লিখেছেন, বহুদিন আগে ২৫ বছরের একজন তরুণী আমাকে বলেছিলেন, আপনারা, পুরুষেরা কখনোই আমাদের বেদনাটা বুঝবেন না। একটা ছোট উদাহরণ দিই। চৈত্রের রাত ১১টায় ধরুন বিদ্যুৎ নেই, গরমে ছটফট করতে করতে আপনি ভাবলেন, যাই, ঘর থেকে বেরিয়ে একটু রাস্তায় যাই, হাওয়া খেয়ে আসি। আপনি চাইলে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে এটা করতে পারবেন, কিন্তু আমি কি সেটা পারব? এটা কি এই দেশে হওয়ার জো আছে? আমি উত্তর দিতে পারিনি। সেই সামান্য না পারার অসামান্য বেদনাটা বুঝে চলার চেষ্টা করছি আজও। একদিন আমার ছোট্ট মেয়েটি, আমার হাত ধরে রিকশায় করে ফিরছিল স্কুল থেকে। ধানমন্ডি ৮ নম্বরের খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা, কত ছেলে ক্রিকেট খেলছে, ফুটবল খেলছে, এর মধ্যে একজনও মেয়ে নেই কেন? আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এই প্রশ্নের কী জবাব আমি দেব আমার চার-পাঁচ বছর বয়সী মেয়েকে?[১৬৬]

হ্যাঁ। এর জবাব তিনি পাবেন নিজের বাড়ীতে গিয়েই। যদি তিনি তার ২৫ বছরের মেয়েকে রাত ১১-টার সময় তীব্র গরমে তারই সাথে একটি হাফ প্যান্ট ও স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে খোলা রাস্তায় হাটতে বলেন। অথবা তার যুবক ছেলেকে তার যুবতী মেয়ের সাথে একই রূপ অর্ধনগ্ন পোষাকে লোক সমক্ষে

১৬৬. দৈনিক প্রথম আলো ১৭ই এপ্রিল’১৫, মতামত কলাম।

ফুটবল খেলতে বলেন। নিঃসন্দেহে তারা রাযী হবে না তাদের স্বভাবজাত লজ্জাশীলতার কারণে। এটাই হ'ল সংস্কৃতি। যা মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপ। আর এটাই হ'ল তাওহীদী সংস্কৃতি। যার বিপরীত হ'ল শিরকী অপসংস্কৃতি। যা করতে গিয়েই আজকে ঘটছে যত বিকৃতি। ফলে লেখকের 'অসামান্য বেদনাটা' হ'ল মূলতঃ শয়তানী বেদনা। সেখান থেকে তওবা করলেই তিনি খুঁজে পাবেন নিষ্কলুষ মানবীয় চেতনা এবং ফিরে পাবেন এক আলোকময় ইলাহী সংস্কৃতি। আমরা সেদিকেই তাঁকে আহ্বান জানাই।

আরেকজন বয়োবৃদ্ধ জাতীয় অধ্যাপক একটি দৈনিকে লিখেছেন, ইংরেজদের নিউ ইয়ার্স ডে পালনের দেখাদেখি শিক্ষিত নাগরিক সমাজে নববর্ষ পালন শুরু হয় ঊনিশ শতকের শেষভাগে। নৃত্যগীতবাদ্য দিয়ে দিনটিকে সুশোভিত ও আমোদিত করার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর তা ছড়িয়ে গিয়েছিল সবখানে। বাংলাদেশ-অঞ্চলে নববর্ষ উৎসব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ছায়ানটের উদ্যোগে। পাকিস্তান সরকার নববর্ষ পালনে আপত্তি করে জেনে আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। এখন তো ছায়ানটের পাশাপাশি চারুকলা ইনস্টিটিউট বা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা, বাংলা একাডেমির বক্তৃতা ও কবিতা পাঠের আসর, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর সংগীতানুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। রবীন্দ্র-সরোবরে বসছে গানের আসর'। একটু পরে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সমাজে কিছু মানুষ সবক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনেন এবং শিরক ও বেদাতের সন্ধান করেন।... মেয়েদের কপালে টিপ পরা থেকে শুরু করে পিচ-ঢালা পথে আলপনা আঁকাকে তাঁরা বিধর্মীয় আচার বলে সাব্যস্ত করেন এবং তা দমন করতে তৎপর হন। এসব প্রয়াসে তাঁরা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন, তা নয়। মেয়েদের সাম্প্রতিক পোশাক-আশাক দেখলে তা বোঝা যাবে। কেউ তার পসন্দমতো খাওয়া-পরা চলাফেরা করতেই পারে। গোলমাল লাগে যখন কেউ অপরের পসন্দ-অপসন্দে হস্তক্ষেপ করে, তখন'।

লেখকের কথাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে 'বর্ষবরণ' ঊনিশ শতকের শেষভাগে আবিষ্কৃত একটি নতুন অনুষ্ঠান, যা আগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যা পরে ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। অতএব নববর্ষ অনুষ্ঠানটি যে 'ইসলামী' নয়, সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ। সমস্যা

হ'ল এই যে, এঁরা নামে মুসলিম হ'লেও ইসলাম সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখেন না। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ প্রেরিত একটি অভ্রান্ত জীবন বিধানের নাম। মুসলিম জীবনের কোন অংশই ইসলামী বিধানের বাইরে যাওয়ার অবকাশ নেই। যতটুকু যাবেন, ততটুকু হবে শয়তানের দাসত্ব। আর সেটাই হ'ল শিরক ও বিদ'আত। শয়তান সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে জাহান্নামের পথে নিয়ে যেতে চায়। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুসলমানেরা যেকোন মূল্যে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়। কথিত সংস্কৃতিজীবীগণ এদেশের ৯০ শতাংশ মুসলমানের এই মনের কথা শুনতে পান কি? আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন- আমীন![১৬৭]

৪১. আল্লাহদ্রোহীদের আস্ফালন ও মুসলমানদের সরকার

সম্প্রতি দেশে ছিদ্দীক্বী ও চৌধুরীদের[১৬৮] বকওয়াস ও উল্লম্ফন দেখে এবং সেই সাথে আদর্শহীন ও দেশপ্রেমহীন নেতাদের চানক্যনীতি দেখে দূর অতীতের জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও মীরজাফরদের চেহারা মনের আয়নায় ভেসে উঠছে। মীর মদন ও মোহনলাল হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তরুণ মুসলিম নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সমর্থন দিয়ে তারা পলাশীর যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নেতার প্রতি অটুট আনুগত্য ও নিখাদ দেশপ্রেমের নীতিতে তারা অটল ছিলেন। সেকারণ ইতিহাসে তারা সম্মানিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে নবাবের নিকটাত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে মীরজাফর ও তার সঙ্গীরা 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে ইতিহাসে কলংকিত হয়েছেন। তাদের সেদিনের পদস্খলনের ফলে উপমহাদেশ থেকে মুসলিম শাসন চির বিদায় নেয় এবং আরও পরে অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ভারত, পাকিস্ত

---

১৬৭. ১৮তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০১৫।

১৬৮. (১) টাঙ্গাইলের আব্দুল কাদের ছিদ্দীকী (জন্ম : ১৯৪৭ খৃ.)-এর বড় ভাই আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকী আওয়ামী লীগের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন। ৩রা জুলাই'১৫ লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ইসলামের নবী ও হজ্জ অনুষ্ঠান নিয়ে নোংরা মন্তব্য করায় দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ফলে তার মন্ত্রীত্ব ও সংসদ সদস্য পদ দু'টিই বাতিল হয়। তিনি দল থেকে বহিস্কৃত হন ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

(২) আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বরিশালের উলানিয়ায় জন্ম (১৯৩৪ খৃ.)। আওয়ামী লীগপন্থী সাংবাদিক ও কলামিস্ট। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানের রচয়িতা ও গীতিকার। বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী।

ান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, আফগানিস্তান ৫টি খণ্ডিত রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। যদি সেদিন নবাবের মন্ত্রীরা ও প্রধান সেনাপতি ঘরের ও বাইরের পাতানো ফাঁদে পা না দিতেন, তাহ'লে উপমহাদেশে মর্মান্তিক রাজনৈতিক ট্রাজেডী সৃষ্টি হ'ত না। আজকে আমাদের দেশের রাজনীতিক ও ধনিকশ্রেণী যদি বিদেশী স্বার্থের ক্রীড়নক হন ও তাদের চালান করা কুফরী মতবাদ সমূহের অনুসারী হন, তাহ'লে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। ১৯৯৪ সালে কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার তাসলীমা নাসরীন ও তার দোসররা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়েছিল, বর্তমানে তেমনি ব্লগার, গণজাগরণী, ছিদ্দীক্বী ও চৌধুরীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে সময় ক্ষমতায় ছিলেন খালেদা জিয়া। আর এখন ক্ষমতায় আছেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতার বদল হ'লেও নীতির বদল হয়নি। তখন সরকারের দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে সে বছর ২৯শে জুলাই ২০ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল প্রতিবাদ সম্মেলন করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এখন তা করা সম্ভব নয়। কারণ সবার জানা। দমননীতি দ্বারা সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও তা যে ভবিষ্যতে কুফল ডেকে আনে, তা কে না জানে? দূরদর্শী ও দেশ প্রেমিক নেতাগণ নিজেদের জীবনের চাইতে নিজেদের আদর্শ, দেশ ও জাতিকে ভালবাসেন। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় সেটি দৃশ্যমান নয়। মানুষকে কথা বলতে দিলে ও তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে তাকে সহজে চেনা যায় ও জানা যায়। কিন্তু বাধা দিলে সে চুপ থাকে এবং চোরা পথ তালাশ করে। আর চাপ দিলে সে মিথ্যা বলে। অতএব ভদ্র ও সংযতভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত না করাতেই কল্যাণ বেশী। এগুলি রাজনৈতিক বিষয়ে হ'তে পারে। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে? বিশেষ করে যদি সেটা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও তার কোন ফরয বিধান সম্পর্কে হয়? তাহ'লে কি তাকে এসবের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া যাবে? গরু-ছাগলকে বিকট শব্দ করার সুযোগ দেওয়া গেলেও মনুষ্যবেশী এইসব অমানুষকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া যাবেনা। হাদীছের ভাষায় 'এরা মানুষের দেহধারী শয়তান'।[১৬৯] কেননা তারা সৃষ্টি হয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তার বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছে। সন্তান যদি পিতাকে অস্বীকার করে ও তার বিরুদ্ধে কুট মন্তব্য

---

১৬৯. মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।

করে, সে যেমন মাফ পায় না। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মন্তব্যকারী ব্যক্তিও তেমনি মাফ পাবে না। ইসলামের বিধানে তার একমাত্র শাস্তি হ'ল 'মৃত্যুদণ্ড'। তাসলীমা ও ব্লগাররা এবং সম্প্রতি ছিদ্দীক্বী ও চৌধুরীরা সে কাজটিই করছে। সরকারের উচিৎ ছিল এদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করা। কিন্তু তার বিপরীতটাই প্রকট।

বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্যের বরকন্দাজ সরকারগুলি তাদের নিজ দেশের মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার অহরহ লংঘন করছে। বোরকা-হিজাব নিয়ে বিদ্রুপ করছে। কোথাও কোথাও নিষিদ্ধ করছে। অফিসে ও কর্মস্থলে ছালাত আদায়ে বাধা দিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দানশীন মেয়েদের অপমান করা হচ্ছে। সামরিক বিভাগে দাড়ি রাখতে ও লম্বা প্যান্ট পরতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সেনা স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্র ও ছাত্রীদের একই বেঞ্চে পাশাপাশি বসতে বাধ্য করা হচ্ছে। দাড়িওয়ালা দ্বীনদার সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। অন্যেরা বস্‌কে খুশী করে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। কিন্তু তাদের অন্যায় দাবী পূরণ না করায় দ্বীনদার কর্মচারী ও কর্মকর্তারা অপদস্থ, অন্যায় স্থানান্তর এমনকি চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন। সরকারী দলের লোকদের অত্যাচারে এবং পুলিশী নির্যাতনে ও মিথ্যা মামলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। যখন যে দল ক্ষমতায় যায়, তখন সেই দল দু'হাতে লুটপাট ও দুর্নীতি করে। তাদের টিকিটি স্পর্শ করার ক্ষমতা কারু থাকে না। এমতাবস্থায় কাটা ঘায়ে নূনের ছিটার মত যদি মুমিনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামের ফরয বিধান নিয়ে কেউ তাচ্ছিল্য করে এবং সরকার তাকে পরোক্ষ সমর্থন দেয়, তাহ'লে কি মানুষ ঐ সরকারের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে, না তার জন্য বদ দো'আ করবে? ভদ্রলোকের কাছে ভদ্র প্রতিবাদই যথেষ্ট হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারগুলি মিছিল, হরতাল ও জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতিতে অভ্যস্ত বিধায় তারা ধর-মার-কাট ও জ্বালাও-পোড়াও-ভাংচুর ছাড়া নড়ে না। ফলে দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা বাড়ছে। দলীয় সরকার কেবল দলীয় লোকদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ফলে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া হবেই। আর এই বিভক্তি ও অসন্তুষ্টির সুযোগ নিচ্ছে শত্রুরা। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদেই সৃষ্টি হচ্ছে মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদী তৎপরতা। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে তারা স্ব স্ব দেশের

সরকারের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নামে সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দোষ লোকদের মারছে। এভাবে মারছে মুসলমান ও মরছে মুসলমান। দূর থেকে ক্রুর হাসি হাসছে দেশ ও জাতির শত্রুরা। পাকিস্তান আমলে ধনী ও গরীবের বৈষম্য দূর করার নামে কথিত শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বামপন্থীরা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করত। এখন জিহাদের নামে দ্বীনদার তরুণদের দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো হচ্ছে। ফলে নিজের ভাইয়ের রক্তপাত ঘটিয়ে সে জান্নাত কামনা করছে। এরপরেও এইসব জিহাদীদের রয়েছে অসংখ্য দল। তারাও একে অপরকে মারছে। অর্থ ও অস্ত্র কারা দিচ্ছে? রাতারাতি আই,এস পরাশক্তি হয়ে গেল কিভাবে?[১৭০] হ্যাঁ, এভাবেই সফল হচ্ছে শত্রুদের চক্রান্ত। অতএব সরকারকে যেমন ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে, তেমনি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে হবে। কথিত জিহাদীদেরকেও নিজ দায়িত্বে ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে। নইলে ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাতে হবে। নেতাদের বলব, আপনারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিন মাস ধরে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে পুড়িয়ে মেরেছেন। হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে তাদের কাতরানোর মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছেন। এখন একবার মনের আয়নায় জাহান্নামের আগুনে জীবন্ত অবস্থায় পুড়ন্ত মানুষের যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য অবলোকন করুন। আল্লাহ সেদিন কাউকে ছাড়বেন না। অতএব সাবধান হৌন!

পরিশেষে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী যেকোন ব্যক্তি ও সংস্থাকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন![১৭১]

---

১৭০. ইরাক ও সিরিয়াতে সৃষ্ট ইসলামিক স্টেট বা আই.এস জঙ্গী গোষ্ঠী নিজেদের খেলাফত ঘোষণা করেছে এবং বিশ্ব মুসলিমকে তাদের আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানিয়েছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের লেবার পার্টির এম.পি. বব ক্যাম্পবেল বলেছেন, ইস্রাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ আই.এস-কে নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও আই.এস খলীফা আবুবকর বাগদাদীর দু'টি দেহ একত্রিত করে একটি ছবি সামাজিক নেটওয়ার্কে পোস্ট করে তার মধ্যে লেখেন যে, আই.এস হ'ল একমাত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, যারা সিরিয়া থেকে দু'হাযার মাইল দূরে গিয়ে প্যারিসে হামলা করলেও মাত্র ৫২ মাইল দূরে ইস্রাঈলে হামলা করে না। কারণ কুকুর কখনো তার নিজের লেজে কামড় দেয় না' *(দৈনিক ইনকিলাব ৬ই এপ্রিল'১৬, ৬/৭ কলাম)*।

১৭১. ১৮তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১৫।

৪২. নৃশংসতার প্রাদুর্ভাব : কারণ ও প্রতিকার

(১) গত ২রা আগষ্ট'১৫ শেরপুরে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ৮ বছরের শিশু রাহাত-কে তার আপন খালু অপহরণ করে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। অতঃপর তাকে হত্যা করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। ৮ই আগষ্ট দুপুরে নালিতাবাড়ী উপযেলার মধুটিলা ইকোপার্কের কাছে একটি পাহাড় থেকে তার কংকাল উদ্ধার করা হয়।[১৭২] (২) ৮ই জুলাই সিলেটে সবজি বিক্রেতা ১৩ বছরের কিশোর সামিউল আলম ওরফে রাজন-কে চুরির অপবাদ দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দেড় ঘণ্টা যাবৎ নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। উল্লাসের সাথে পিটানোর ভিডিওচিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরাই তা ছড়িয়ে দেয়। (৩) ৩রা আগষ্ট খুলনায় নির্যাতনের শিকার হওয়া সাতক্ষীরার রসূলপুর গ্রামের ১২ বছরের রাকিব গ্যারেজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ কারণে আগের গ্যারেজ মালিক ও তার সহযোগীরা তাকে ধরে মোটরসাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার কমপ্রেসর মেশিনের নল মলদ্বারে ঢুকিয়ে দেয়। তাতে পেটে বাতাস ভরে শিশুটির পেট ফুলে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় ও ফুসফুস ফেটে সে মারা যায়। অথচ বয়স্ক নির্যাতনকারীদের অন্তর একটুও কাঁপেনি। (৪) ৩রা আগষ্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা থেকে সুটকেসের ভিতরে থাকা ৯ বছরের একটি ছেলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বুকে ও কপালে ইস্ত্রীর ছ্যাঁকার দাগ এবং পিঠে ছিল পাঁচ ইঞ্চির মতো গভীর ক্ষত। সম্ভবতঃ সে কোন গৃহকর্মী। (৫) ২৩শে জুলাই মাগুরায় সরকারী ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় গর্ভবতী মা ও তাঁর পেটের ৮ মাসের শিশু সন্তান গুলিবিদ্ধ হয়। তাতে শিশুটির পিঠ ফুঁড়ে বুক দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যায়। এরপরেও মা ও বাচ্চাটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। শিশুটি এখন 'বেবী অফ নাজমা' বা বাংলাদেশের একমাত্র 'বুলেট কন্যা' নামে খ্যাতি পেয়েছে। (৬) ৩রা আগষ্ট গভীর রাতে বরগুনায় রবিউল আউয়াল নামে ১০ বছরের এক মাদরাসা ছাত্রকে মাছ চুরির কথিত অপরাধে চোখ উপড়িয়ে শাবল দিয়ে বীভৎস কায়দায় পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় এক ব্যক্তি। আহ্ কি নৃশংস, কি জঘন্য, কি মর্মান্তিক এসব ঘটনা! এরা পশুরও অধম।

---

১৭২. দৈনিক ইনকিলাব ১৪.৮.১৫, ৫/৫ কলাম।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে বিগত সাড়ে তিন বছরে দেশে ৯৬৮টি শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ২৬৭টি সংগঠনের মোর্চা শিশু অধিকার ফোরামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ২০৯, ২০১৩ সালে ২১৮, ২০১৪ সালে ৩৫০ জন শিশুকে হত্যা করা হয়। চলতি বছরের সাত মাসেই সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ১৯১ জনে। বর্তমানে শিশুহত্যার প্রক্রিয়া বীভৎস থেকে বীভৎসতর হচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক। নির্যাতনকারীরা হচ্ছে প্রভাবশালী। ঘটনা ঘটছে, মামলা হচ্ছে। কিন্তু বিচার যে শেষ হচ্ছে, তার কোনো নযীর নেই। ঘটনা ঘটার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, দেখছি বা তদন্তাধীন আছে। জানতে চাইলে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বাইরে হয়তো আরও অনেক ঘটনা ঘটছে, যেগুলো জানা যাচ্ছে না। তিনি সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং অপরাধীদের দ্রুত বিচারের ওপর গুরুত্ব দেন।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আইন কমিশনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী ও শিশু-সংক্রান্ত মামলাসহ প্রায় ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ সংখ্যাটি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। এ বিষয়ে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বলেন, বিচার-প্রক্রিয়ার শ্লথ গতিতে অপরাধীরা অপরাধ করা থেকে নিরুৎসাহিত তো হয়ই না, বরং উৎসাহিত হয়। অপরাধীরা ভেবেই নিচ্ছে যে, অন্যায় করলে বিচার আর কী? ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সমন্বিত সেবাকেন্দ্র) সমন্বয়কারী বিলকীস বেগম বলেন, এক বছর বয়সী শিশুকে পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়। আমাদের কাছে যখন ওই শিশুকে আনা হয় তখন তার যৌনাঙ্গ একেবারে ছিঁড়ে গেছে। এক বা দুই বছর বয়সী কম থাকলেও তিন, চার বা পাঁচ বছর বয়সী শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রতিনিয়ত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে মনে করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচারহীনতা এবং ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শক্তি ও ক্ষমতার

কেন্দ্রবিন্দুতে দুর্বৃত্তপরায়ণ ও পশু প্রবৃত্তির লোকদের প্রাধান্য থাকায় এ ধরনের অমানবিক ঘটনাগুলো ঘটছে।[১৭৩]

সেই সাথে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে নারী নির্যাতন। ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। গত ৬ মাসে সারাদেশে ১০ হাযার মামলা হয়েছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের।[১৭৪] সবশেষে গত ১৩ই আগষ্ট মাদারীপুরের অষ্টম শ্রেণীর দুই স্কুল ছাত্রীকে ১৮/২০ বছর বয়সের চারজন যুবক ধর্ষণের পর হত্যা করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে লাশ ফেলে রেখে গেছে।[১৭৫] ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো অমানবিক, অনৈতিক, বর্বর এ ধরনের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে সামাজিকভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। ভিকটিম ও তার পরিবার লোকলজ্জা, সামাজিক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কেউ কেউ অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বর্ণিত রিপোর্টগুলিতে কি প্রমাণ হয় যে, আমরা মানুষের সমাজে বাস করছি?

কারণ : উপরের আলোচনায় সুধীদের বক্তব্যে নৃশংসতার কারণ ও প্রতিকার কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে আমাদের পরামর্শ হ'ল সেটাই যা মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি বলতে আড়ষ্টবোধ করেছেন। আর তা হ'ল, এসবের মৌলিক কারণ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, আল্লাহহীন শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থা এবং নিজেদের মনগড়া বিচার ব্যবস্থা।

প্রতিকার : (১) ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক শাসন যোরদার করা। (২) আল্লাহমুখী শিক্ষা, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা। (৩) বড়-ছোট নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দাঁতের বদলে দাঁত ও চোখের বদলে চোখ নীতি অবলম্বন করা *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*। (৪) যেসব অভিযোগের সত্যতা হাতে-নাতে পাওয়া যায়, সেগুলির শাস্তি আদালতের মাধ্যমে সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা এবং যাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাকে সেভাবেই হত্যা করা। এ ধরনের দু'চারটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে দেশ দ্রুত শান্ত হয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন![১৭৬]

---

১৭৩. সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৭.৮.১৫ইং।
১৭৪. দৈনিক ইনকিলাব ৬.৮.১৫ইং।
১৭৫. দৈনিক প্রথম আলো ১৪.৮.১৫ইং।
১৭৬. ১৮তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫।

অর্থনৈতিক

৪৩. শেয়ার বাজার

১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজার কেলেংকারির পর ২০১০-১১ সালে পুনরায় কেলেংকারি ঘটল। সেবারের কেলেংকারিতে ২০০ কোটি টাকার মত লোপাট হলেও এবার হয়েছে ১৫ হাযার কোটি টাকার উপর। যার রেশ এখনো চলছে। সর্বস্ব হারিয়েছে প্রায় ৪০ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী। চলছে হাযার হাযার মানুষের আর্তনাদ-আহাজারি। কিন্তু নেপথ্য নায়করা থাকছে পূর্বের ন্যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাদের টিকিতে হাত দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। কেননা শেয়ার বাজার মূলতঃ পুঁজিপতিদের সৃষ্টি। আর বর্তমান সংসদের অধিকাংশ এমপি-ই হলেন পুঁজিপতি ব্যবসায়ী। সেকারণ অনেকেই এ সংসদকে ব্যবসায়ীদের ক্লাব বলেন। যাই হোক শেয়ার ব্যবসাটা কি, এ ব্যবসা শরী'আতে বৈধ কি-না, এ ব্যবসায়ে জনগণের কল্যাণ বা অকল্যাণ কতটুকু- এগুলিই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামে ব্যবসা হালাল ও সূদ হারাম। যৌথ ব্যবসার দু'টি নীতিই ইসলামে বৈধ। আর তা হ'ল মুযারাবা ও মুশারাকাহ। প্রথমটি হ'ল, একজনের টাকা ও অন্যজনের শ্রম। যেমন খাদীজার ছিল সম্পদ ও রাসূলের ছিল শ্রম। দ্বিতীয়টি হ'ল শরীকানা ব্যবসা। যাতে উভয়ে সম্পদ ও শ্রমে আনুপাতিক অংশীদার হবে। দু'টি ব্যবসাতেই লাভ-ক্ষতির অংশীদার উভয় পক্ষ হবে। এ দুই নীতির বাইরে ব্যবসায়ের যত পথ-পদ্ধতি আধুনিক যুগে বের হয়েছে, প্রায় সবগুলিই পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়ানোর অপকৌশল মাত্র। যা তাদেরই স্বার্থে তাদেরই নিয়োজিত অর্থনীতিবিদদের সৃষ্টি।

আর শেয়ার বাজার তো আসলে কোন বাজারই নয়। এ এমন একটি বাজার যেখানে কোন মাল নেই, দোকান নেই। আছে কেবলই ক্রেতা। যাদের নযর থাকে কেবলই টিভি-কম্পিউটারের রূপালী পর্দার দিকে। শেয়ার বেচাকেনাকে কোম্পানীর অংশের বেচাকেনা ধরে নিয়ে একে বৈধতার সনদ দেওয়ার চেষ্টা

করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান শেয়ার বাজার এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার বেচাকেনা হ'লেও কোম্পানীর লাভ-লোকসান বা বাস্তব অবস্থার সাথে এর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। শেয়ারকে কেন্দ্র করে মূলতঃ Money-game-ই হচ্ছে শেয়ার বাজারের মূল ধারা। এখন শেয়ার ব্যবসা করার জন্য নিজের টাকা লাগে না। এজন্য মার্চেন্ট ব্যাংক হয়েছে। এরা কিন্তু মালের মার্চেন্ট নয়। বরং টাকার মার্চেন্ট। অর্থাৎ আপনি এদের কাছে শেয়ার বন্ধক দিয়ে যত টাকা খুশী নেবেন। বিনিময়ে এদের সূদ দিবেন। এদের উপস্থিতিতেই আপনি শেয়ার বিক্রি করবেন। আপনার লোকসান হলেও এদের লাভ ঠিক-ই থাকবে। শেয়ার বাজারের গতি নির্ধারণে এই সব ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। এরা জাহেলী যুগের আবু জাহল, উবাই ইবনু খালাফ ও বৃটিশ যুগের মাড়োয়ারী-কাবুলীওয়ালাদের মত।

মার্চেন্ট ব্যাংকের মত রয়েছে মিউচুয়াল ফাণ্ড। এদের অন্য কোথাও ব্যবসা নেই। এরা স্রেফ শেয়ারের ব্যবসা করে। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারই এদের পুঁজি। আর তা হচ্ছে লিকুইড মানি-র মত। যেকোন সময় তা মার্কেটে বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকা পেতে পারেন। কমবেশী যাই-ই পাক, সবটাই তাদের লাভ। এক কথায় বলা যায় এগুলি ভদ্র নামের আড়ালে স্রেফ ফটকাবাজারী। আরেকটি গ্রুপ কাজ করে হুজুগ লাগানোর জন্য। তারা ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের অতি মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রতারিত করে। রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে শেয়ার কিনতে প্রলুব্ধ করে। তারপর তাদের টাকাগুলো শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ হলেই তা লোপাট করে এই গোষ্ঠী সরে পড়ে। কিন্তু তারা থাকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে। যেমন সঊদী যুবরাজ রূপালী ব্যাংক কিনবেন বলে সংবাদ এল। অমনি প্রতারক চক্র সজাগ হ'ল। ফলে অচল রূপালী ব্যাংকের ১০০/- টাকার শেয়ার সচল হয়ে ৩০০০/- টাকার উপরে উঠে গেল। পরে যুবরাজ যখন কিনলেন না, তখন শেয়ারে ধস নামল। বহুলোক ফতুর হ'ল। এখন শেয়ার বাজার নিজেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মার্কেটে পরিণত হয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামটাই কেবল

ব্যবহৃত হয়। কোম্পানীর ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন সম্পর্ক এখন আর অবশিষ্ট নেই।

যদিও এগুলি রোধ করার জন্য এসইসি-র ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তারা সবক্ষেত্রে সফল হতে পারেন না। যেমন বর্তমানে পারছেন না। কারণ পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি-র নেই। নীতিবান কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হলে তাকে হয় সরে দাঁড়াতে হবে, নয় ম্যানেজ্‌ড হ'তে হবে। নেপথ্যের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাদের কাজ নয়। হ্যাঁ, সরকার তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও দলীয় সরকার সর্বদা বিরোধী দলের উপরে দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা জুয়ার মধ্যে পড়ে কি-না। উত্তরে বলা চলে যে, কোম্পানীর শেয়ার খরিদ ও তার লাভ-লোকসানের ভাগীদার হওয়ার বিষয়টি আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটা আপনি পাবেন বছর শেষে কোম্পানী যখন তার লভ্যাংশ ঘোষণা করবে তখন। অথচ শেয়ার মার্কেট ওঠা-নামা করে মিনিটে-মিনিটে। নাম ব্যবহার করা হয় কোম্পানীর। তাহ'লে এটা কোন পর্যায়ে পড়বে? নিঃসন্দেহে এটি জুয়া খেলার মত। অতএব হারামের দরজা বন্ধ করাই ইসলামী ফিক্বহের অন্যতম প্রধান মূলনীতির দিকে তাকালে প্রচলিত শেয়ার ব্যবসাকে হারাম বলা ভিন্ন উপায় নেই। সাথে সাথে সম্পুরক প্রশ্ন এটাও চলে আসে যে, যদি কেউ বার্ষিক লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ট পাবার আশায় কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করে, তাহ'লে সেটা জায়েয হবে কি?। উত্তরে বলা যায় যে, যদি ঐ কোম্পানীর মূলধনে ও লেনদেনে কোথাও সূদ মিশ্রিত না থাকে, অর্থাৎ সূদী ঋণ না থাকে এবং ব্যবসায়ে ও বিনিয়োগে ফটকাবাজারি ও হারাম মিশ্রিত না থাকে, তাহ'লে আপনি সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু হাযারো শরীকানার ঐ ব্যবসায়ে কে আপনাকে ঐ নিশ্চয়তা দিবে? তাছাড়া এরূপ কোম্পানীর অস্তিত্ব এদেশে আছে কি? সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়াই রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ[১৭৭] এবং তা মেনে চলাই মুমিনের নাজাতের পথ।

---

১৭৭. তিরমিযী হা/২৫১৮; আহমাদ হা/১৭২৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৭৭৩।

তাই জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য বর্তমান অর্থনীতিতে শেয়ার মার্কেটে প্রবেশ করা আদৌ বৈধ হবে না। কারণ (১) এতে ক্রেতার অনেক সময় সম্যক জ্ঞান থাকে না কী বস্তুর শেয়ার তিনি ক্রয় করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[১৭৮] (২) যে বস্তুর শেয়ার কেনা-বেচা হয়, তা দেখা ও জানা-বুঝার সুযোগ এখানে থাকে না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এমন ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকা বলেছেন।[১৭৯] (৩) শেয়ার ব্যবসার পণ্য আয়ত্তে নিয়ে আসার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তু ক্রয়ের পর তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম)*। (৪) শেয়ার ব্যবসা একটি জুয়া মাত্র। যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ মাল দেখে না। অথচ অনবরত দর উঠা-নামা করে। (৫) শেয়ার ব্যবসায় ফটকাবাজারীর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অনেক সময় কোম্পানী তার প্রকৃত তথ্য গোপন রাখে। কখনো কারখানা তৈরি না করেই তার শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়। কোনরূপ ব্যবসা বা মালামাল ছাড়াই তারা এ লাভ করে থাকে। এছাড়াও নিত্যনতুন ছলচাতুরী শেয়ারবাজারে যুক্ত হচ্ছে। (৬) এতে সূদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ শেয়ার ব্যবসা ব্যাংক থেকে সূদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে করা হচ্ছে। ফলে এতে দুনিয়া ও আখেরাতে জনগণের কোন কল্যাণ নেই। অতএব শেয়ার ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

পরিশেষে আমরা বলব, এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। তাদের নির্বাচিত সরকার মুসলমান। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে। তাহ'লে কেন এদেশে সূদ ও জুয়ার মত হারাম বস্তু যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে? যারা রাজনীতি ও অর্থনীতির দায়িত্বশীল পর্যায়ে আছেন, তাদেরকে আমরা আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং হারাম থেকে তওবা করে হালাল রূযীর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৮০]

---

১৭৮. বুখারী হা/২২২৪; মুসলিম হা/১৫৮৩; মিশকাত হা/২৭৬৭।

১৭৯. মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৭৮৪।

১৮০. ১৪তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১১।

৪৪. পুঁজিবাদের চূড়ায় ধস

Occupy Wall Street বা ‘ওয়াল স্ট্রীট দখল করো’ শ্লোগান দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শিক্ষার্থী ও সদ্য পাস করা বেকার যুবক গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ’১১ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক রাজধানী নিউইয়র্কের রাস্তায় যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তা মাত্র এক মাসের ব্যবধানে গত ১৫ই অক্টোবর বিশ্বের ৮২টি দেশের ৯৫১টি শহরে বিক্ষোভ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে লণ্ডনের ধনীরা এখন দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান সর্বত্র হাযার হাযার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। তাদের একটাই ক্ষোভ ৯৯ শতাংশ মানুষের রূযী মাত্র ১ শতাংশ মানুষ ভোগ করছে। মুনাফালোভী ব্যাংকার ও ধনী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী যেন একসাথে ফুঁসে উঠেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এটি এখন টাইম বোমায় রূপ নিয়েছে।

এটা কি একদিনে হয়েছে? এটা কি কোন সাময়িক ইস্যু? না, বরং এটি শত বছরের ধূমায়িত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বিশ্বজনীন ইস্যু। যেখানেই পুঁজিবাদ, সেখানেই এ ক্ষোভ অবশ্যই থাকবে। পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণী বিভিন্ন নিয়ম-কানূন তৈরী করে দু’হাতে অপরের ধন লুট করছে। আর একে আইনসম্মত ও নিরাপদ করার জন্য তাদের অর্থে ও তাদের স্বার্থে গড়ে উঠেছে দেশে দেশে বিভিন্ন নামে শোষণবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহ। মানুষ কেবল ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এ থেকে মুক্তির পথ তারা জানে না। তাই দেখা যায় নানা মুণির নানা মত। হ্যাঁ মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ থেকে মুক্তির পথ বাৎলে দিয়েছেন। যেটি হ’ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। মানুষকে অবশ্যই সে পথে ফিরে যেতে হবে, যদি তারা শান্তি চায়। আসুন একবার ফিরে তাকাই সেদিকে।

ভোগ ও ত্যাগ দু’টিই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। দু’টির সুষ্ঠু সমন্বয়ে মানুষের জীবন শান্তিময় হয়। কিন্তু কোন একটিকে বেছে নিলে জীবন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ব্যক্তির সীমাহীন ভোগবাদিতা ও লাগামহীন ধনলিপ্সাকে নিরংকুশ করা ও সম্পদ এক হাতে কুক্ষিগত করাই হ’ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল কথা। এর বিপরীতে ব্যক্তিকে মালিকানাহীন ও সম্পদহীন করে আয়-উপাদানের সকল

উৎস সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়াই হ'ল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল কথা। বুঝাই যাচ্ছে যে, দু'টিই মানুষের স্বভাব বিরোধী ও চরমপন্থী মতবাদ এবং কোনটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কল্যাণবহ নয়। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের মানুষ যেমন ফুঁসে উঠেছে, কম্যুনিষ্ট চীনের লৌহশৃংখলে আবদ্ধ মানুষ তেমনি কোন পথ না পেয়ে এখন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ফলে আত্মহত্যা প্রবণ দেশসমূহের তালিকায় চীন পৃথিবীতে শীর্ষে অবস্থান করছে। অন্যদিকে সমাজবাদী রাশিয়ায় ভিক্ষুকের সংখ্যা দুনিয়ায় সবচাইতে বেশী।

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী অর্থনীতির বাইরে সুষম অর্থনীতি এই যে, মানুষ তার মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বণ্টন করবে। এর ফলে সমাজে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরীবের বৈষম্য হ্রাস পাবে। প্রতিটি পরিবার সচ্ছল হবে। সমাজে কোন বেকার ও বিত্তহীন থাকবে না। সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে। এই আয় ও ব্যয়ের নীতিমালা মানুষ নিজে তৈরী করবে না। বরং আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বিধান সমূহ সে মেনে চলবে। আল্লাহ্র বিধান সকল মানুষের জন্য সমান। তাই তা অনুসরণে সমাজে সৃষ্টি হবে বৈষম্যহীন ও সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সত্যিকার অর্থে একটি মানবিক অর্থ ব্যবস্থা। যেখানে ধনী তার বিপদগ্রস্ত ভাইয়ের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অর্থ ব্যয় করবে। গরীব তার ধনী উপকারী ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে। সকলে হবে সকলের তরে। কেউ হবেনা কেবল নিজের তরে। এই অর্থনীতিই হ'ল ইসলামী অর্থনীতি। যা যথাযথভাবে অনুসরণের ফলে সূদী শোষণে জর্জরিত আরবীয় সমাজ খেলাফতে রাশেদাহ্র প্রথম দশ বছরের মধ্যেই এমনভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হয় যে, যাকাত নেওয়ার মত কোন লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আজও তা সম্ভব, যদি না মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিক হয়।

রূযী হালাল না হ'লে ইবাদত কবুল হয় না। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অর্থব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সেকারণ পুঁজিবাদ কেবল অর্থনীতির নাম নয়, বরং একটি সমাজ ব্যবস্থার

নাম। একই অবস্থা সমাজতন্ত্রের। উভয় সমাজ ব্যবস্থা স্ব স্ব আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী পরিচালিত। ঐ দুই সমাজ ব্যবস্থায় মুনাফালোভী ব্যাংকার, মওজূদদার ব্যবসায়ী ও সূদী মহাজনদের প্রধান সহযোগী হ'ল শোষণবাদী ও ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা। এরা তাদের বশংবদ একদল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলে। যারা বিভিন্ন চটকদার মতবাদ তৈরী ও প্রচার করে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করে। তারা তাদের সৃষ্ট ও পরিচালিত ব্যাংক-বীমা-ইনস্যুরেন্স ও নানাবিধ উপায়ে ব্যক্তিগতভাবে ও সমিতি করে কর্পোরেট বাণিজ্যের মাধ্যমে হিংস্র অক্টোপাসের মত অষ্ট হাতে সমাজকে শোষণ করে এবং যাবতীয় আর্থিক উপায়-উপাদানকে নিজেদের করায়ত্ত করে। বর্তমানে বিশ্বায়নের ধুয়া তুলে তারা বিশ্ব শাসন ও শোষণে নেমেছে এবং একে একে বিভিন্ন দেশে তারা হামলা ও লুট করছে। এতে এক শতাংশ লোক সম্পদের পাহাড় গড়ছে। বাকীদের নাভিশ্বাস উঠছে। আজ তারই ফলশ্রুতিতে আমেরিকায় প্রতি ৬ জনে ১ জন ও ভারতে শতকরা ৭৭ জন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। ইংল্যাণ্ডে শতকরা মাত্র ৫ জন ব্যতীত বাকী সবাই অসুখী জীবন যাপন করছে। অথচ এইসব দেশেই বাস করে বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তিরা।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ কোলিন ক্লার্ক বলেছিলেন, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম ও সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ের শতকরা অনুপাত হ'ল গড়ে ১ : ২০ লক্ষ। এই আকাশ ছোঁয়া অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে মানুষ কিভাবে বসবাস করে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বহু রক্তের বিনিময়ে রাশিয়া ও চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তথাকথিত শোষণহীন সমাজবাদী অর্থনীতি। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই এর তিক্ত ফল সেদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। একদিকে তারা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে, অন্যদিকে তাদেরকে আয়-রোজগারহীন করে কার্যতঃ কারাবন্দীর অবস্থায় নিয়ে ফেলে। এর পরিণতিতে তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের হার দাঁড়ায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বের রাশিয়ার সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১ : ৩ লক্ষ। তাই বর্তমানে পুনরায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে বিশ্বজাগরণ দেখা যাচ্ছে, তা যদি

ইসলামের দিকে ফিরে না এসে অন্যদিকে মোড় নেয়, তাহ'লে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে। তা মানুষকে তার কাংখিত সুখ কখনোই এনে দিতে পারবে না।

পুঁজিবাদী সমাজে বসবাস করে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে আন্তরিক হ'লে তারাই বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক হ'তে পারত। কিন্তু তাদের মধ্যে ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে যত না আগ্রহ আছে, নিজেদের রূযী হালাল করার ও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে সে তুলনায় বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা নেই। বরং এ বিষয়ে তারা পুঁজিবাদী বিশ্বের শতভাগ অনুসারী। ফলে সারা জীবন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। উন্নতির কোন লক্ষণ নেই।

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। মানুষ হ'ল তার যামিনদার। তাই মানুষ তার ইচ্ছামত আয় ও ব্যয় করতে পারে না। এ অর্থনীতিতে হালাল ও হারামের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং রয়েছে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক ধন বণ্টনের নীতিমালা। এ অর্থনীতি মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী শান্তির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ অর্থনীতি মানুষকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল বানায়। ফলে এ সমাজে কোন আর্থিক হানাহানি বা বাণিজ্য যুদ্ধ কিংবা কোনরূপ অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে না। এ সমাজের মানুষ ভোগে নয়, বরং ত্যাগে তৃপ্তি পায়। দেশের শাসক ও ধনিক শ্রেণী কি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারেন? যদি না পারেন তাহ'লে ওয়াল স্ট্রীট দখলের ঢেউ যে এদেশে আছড়ে পড়বে না, তার নিশ্চয়তা কে দিবে? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৮১]

১৮১. ১৫তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১১। একই সংখ্যায় (২) সম্পাদকীয় এসেছে 'চলে গেলেন আফ্রিকার সিংহ' শিরোনামে।

রাজনৈতিক

৪৫. মযলূমের অধিকার

দেশের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় কারাগারের জনৈক কর্মকর্তার মতে তাঁর জেলখানার শতকরা নব্বই ভাগ বন্দী নিরপরাধ। তাদের অধিকাংশই মিথ্যা মামলায় হাজতী ও অন্যায় বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। অপরাধ প্রমাণের আগেই নিরপরাধ মানুষকে হাজতের নামে জেল খাটানো হচ্ছে বছরের পর বছর। এর ফলে বহু পিতা-মাতা সন্তানের শোকে শয্যাশায়ী হয়েছেন। স্বামীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখে অনেকের সংসার ভেঙ্গেছে। তাদের বাচ্চারা সব পরিণত হয়েছে অসহায় কাঙালে। অনেকে মামলার পিছনে ছুটতে ছুটতে নিঃস্ব হয়েছে। স্বাস্থ্য, সুখ সব হারিয়েছে। এর কারণ, এদেশের প্রশাসন, বিচারবিধি, কারাবিধি সবই চলছে বৃটিশ প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক আইনে। যে বৃটিশরা এককালে মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল প্রতারণার মাধ্যমে। তাই মুসলমানদের নিকট মর্যাদাপূর্ণ সাদা টুপী ও পোষাক পরানো হচ্ছে কারাগারের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের। অনেককে সার্বক্ষণিক পায়ে পরিয়ে রাখা হচ্ছে লোহার বেড়ী। জিজ্ঞেস করলে বলা হয়, বৃটিশ কারাবিধি। যেন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মুসলমানরাই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জাতি। তাদের ব্যবহৃত পরিচ্ছদই দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য মানানসই। পুঁজিবাদী শোষকদের প্রেতাত্মারা এভাবে সর্বশক্তি নিয়ে সর্বত্র মযলূমের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন মুখোশ পরে। রক্ষকরা সব ভক্ষক হয়ে মানুষের জান-মাল ও ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে দিবারাত্রি। ধিক আমাদের নেতাদের! দু'বার স্বাধীন হয়েও যাদের হুঁশ ফেরেনি আজও।

দেড় হাযার বছর পূর্বেও পৃথিবীর এই করুণ দৃশ্য ছিল। তরুণ বয়সে ফিজারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখে কেঁদে উঠেছিল 'আল-আমীন' মুহাম্মাদের কোমল হৃদয়। হারবুল ফিজারের প্রতিক্রিয়ায় সেদিন সৃষ্টি হ'ল 'হিলফুল ফুযূল'। মযলূমের অধিকার আদায় ও যালেমের হাত ধরার জন্য তিনি ও তাঁর চাচা যুবায়ের মিলে গঠন করলেন এই কল্যাণকামী যুবসংগঠন। কয়েকজন গোত্রনেতার সমর্থন পেলেন তিনি। তাঁর উদ্ভাবিত চার দফা প্রস্তাব

গৃহীত হ'ল। অতঃপর চাচা-ভাতিজা এগিয়ে গেলেন। অর্থগৃধ্নু সমাজনেতা ‘আছ বিন ওয়ায়েলের কাছ থেকে বহিরাগত মযলূম ব্যবসায়ীর ন্যায্য পাওনা আদায় করলেন। চারিদিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু তারপর? যালেমের প্রতারণার সামনে মাযলূমের প্রতিরোধ কতক্ষণ টিকবে? যালেম ও মাযলূমের হানাহানির ভবিষ্যৎ কী হবে? উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত সত্য ও সার্বভৌম আইনী ক্ষমতার মালিক কে হবেন? এবম্বিধ চিন্তায় তরুণ মুহাম্মাদ যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পা দিলেন। হেরা পাহাড়ের নির্জন গুহায় চিন্তামগ্ন রইলেন দিনের পর দিন। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হ'ল। নেমে এল আল্লাহ্র রহমত। নাযিল হ'ল কুরআন। সূচনায় মাত্র পাঁচটি আয়াত। কিছুদিন পর থেকে শুরু হ'ল আসমানী তারবার্তার ক্রমাগত আগমন। শেষ হ'ল দীর্ঘ তেইশ বছরের মাথায়। পূর্ণতা পেল কুরআন। মানবতা খুঁজে পেল তার পথের দিশা। জানিয়ে দেওয়া হ'ল ‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। বলা হ'ল, ‘আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের দাসত্ব করছ, সেগুলি তোমাদের বানানো কিছু নাম মাত্র। প্রকৃত শাসনক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে (বান্দা তাঁর প্রতিনিধি মাত্র)। তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারু দাসত্ব করো না। এটাই হ'ল সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’ *(ইউসুফ ১২/৪০)*। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ কিংবা ২১ দিন পূর্বে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিল করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, ‘আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেলেন, ‘তোমরা আমার মৃত্যুর পরে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরো। সাবধান, নতুন নতুন মতবাদের অনুসরণ থেকে দূরে থাক। কেননা (ইসলামের নামে ও বেনামে সৃষ্ট) সকল মতবাদই বিদ‘আত। আর সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।[১৮২] আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম’।[১৮৩]

---

১৮২. আহমাদ হা/১৭১৮৫; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫।

১৮৩. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৮৫।

এভাবে মানুষ জানলো যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কোন মানুষ নয়। স্থায়ী ও মৌলিক কোন বিধান রচনার ক্ষমতা বা অধিকার মানুষের নেই। দুর্বল এই মানবজাতি দু'সেকেণ্ড পরে তার জীবনে কি ঘটবে, তা বলতে পারে না। অতএব মুখে আল্লাহ্র স্বীকৃতি ও কেবল ছালাত-ছিয়াম আদায়েই তার কর্তব্য পূর্ণ হয় না। বরং সর্বত্র তার সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বৈষয়িক ও সামাজিক বিধান সমূহ পালনে ও বাস্তবায়নের মাঝেই নিহিত রয়েছে তার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা। নতুন এই দর্শনে জীবনের মোড় ঘুরে গেল বিশ্বাসীদের। দুনিয়ার প্রতিপত্তি, ইন্দ্রিয়সুখ অর্জনের নেশা টুটে গেল। আখেরাতে মুক্তি ও জান্নাত লাভের আশায় শুরু হ'ল নতুন পথের যাত্রা। ফলে যালেম বারিত হ'ল ও মযলূম ফিরে পেল তার হৃত অধিকার। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে একদিন সবাই ভাই ভাই হয়ে গেল। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ও হিংসা-হানাহানির বদলে সমাজে ফিরে এলো শান্তির সুবাতাস। ইরাক হ'তে মক্কা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিঃসঙ্গ একজন মহিলা নিরাপদে একাকী ভ্রমণের নিশ্চয়তা পেল। ওমরের দশ বছরের খেলাফতকালে ২২ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী আরব উপদ্বীপের কোথাও যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ এই সমাজেই কিছুকাল পূর্বে অভাবের তাড়নায় মানুষ বেচা-কেনা হ'ত গরু-ছাগলের মত। মানুষ মানুষের দাসত্বে নিপীড়িত হ'ত। সমাজের এই আমূল পরিবর্তনে কোন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা জেল-যুলুমের প্রয়োজন হয়নি। স্রেফ বিশ্বাসের পরিবর্তনে এবং সেই পবিত্র বিশ্বাসের অনুসারী একদল মানুষের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। সেদিন যেটা সম্ভব হয়েছিল, আজও তা সম্ভব, যদি না কিছু মানুষ উক্ত বিশ্বাসের মূলে ঐক্যবদ্ধ হয় ও মযলূমের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়। স্বার্থবাদী মানুষ সর্বদা ক্ষমতার কেন্দ্রকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছে। কেননা তাতে রয়েছে তাদের দুনিয়াবী লাভ। যদিও তাদের মুখে সর্বদা জনদরদের কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হয়। যেমন সেদিনের ফেরাঊন তার জনগণকে বলেছিল, 'আমি তোমাদের কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন ৪০/২৯)*।

বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ্র বিধান সর্বদা মযলূমের পক্ষে ও যালেমের বিপক্ষে। আর এ জন্যই নবীগণ সর্বদা যালেমদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন।

তাঁদের অনুসারীগণকেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবুও জান্নাত পিয়াসীরা মযলূমের সাহায্যে এবং হক প্রচারে নিবৃত্ত হয়না। বরং সর্বাবস্থায় তারা বীরের মত অগ্রগামী হয়ে থাকে। অতএব মযলূমের অধিকার আদায় ও সুরক্ষার একমাত্র পথ হ'ল আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা এবং বিধান সমূহের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া। সচেতন ঈমানদার ভাইবোনদের দায়িত্ব হ'ল উক্ত লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টি করা, নিজের গৃহকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের দুর্গে পরিণত করা, সকল দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আখেরাত মুখী জীবন গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত করা। মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াবী কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ্‌র দেয়া একটি বিশেষ নে'মত এবং একটি বিশেষ পরীক্ষা মাত্র। এটি পাওয়ার লোভে বা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা যাবে না। বরং কেবলমাত্র পরকালে নাজাত পাওয়ার প্রত্যাশায় সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস এবং শরী'আত অনুমোদিত সৎকর্মাদি সম্পাদনই হ'ল দুনিয়াতে ইসলামী খেলাফত অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন![১৮৪]

৪৬. মুমিনের সংগ্রাম আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম

বীজ যেমন বৃক্ষ তেমন হয়। বিশ্বাস যেমন কর্ম তেমন হয়। বিশ্বাসের পরিবর্তনে কর্মের পরিবর্তন হয়। তেঁতুল বীজে যেমন সাগর কলার গাছ হয় না, কলার বীচিতে তেমনি তেঁতুলের গাছ হয় না। আবার বীজ ত্রুটিপূর্ণ হ'লে ফসল ত্রটিপূর্ণ হয়। পৃথিবীতে মূলতঃ দু'ধরনের মানুষ বসবাস করে। একদল বিশ্বাস করে যে, এ বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যিনি সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর ধারক ও ব্যবস্থাপক। তাঁর হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। তাঁর প্রেরিত বিধানই চূড়ান্ত সত্যের উৎস। আর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পর সেই উৎস হ'ল ক্বিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে তা মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির চিরন্তন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।

---

১৮৪. ১২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮।

দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ হ'ল তারাই, যারা অদৃশ্য সত্তা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। বরং সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা-আপনি চলছে বলে ধারণা করে এবং নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। উভয় প্রকার মানুষের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস ও কর্মের স্তরভেদ। বিশ্বাসীদের মধ্যে যেমন রয়েছে কপট বিশ্বাসী ও অসচেতন ব্যক্তিদের বিরাট ভিড়। অবিশ্বাসীদের সংখ্যা নগন্য হ'লেও তাদের মধ্যেও রয়েছে বিশ্বাস ও কর্মের তারতম্য।

যুগে যুগে নানাবিধ চটকদার মতবাদের মোড়কে স্বার্থবাদী মানুষ তার মন্দ প্রবৃত্তির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। গত শতাব্দীতেই তারা দু দু'টি মহাযুদ্ধ বাধিয়ে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। বহু প্রাচীন সভ্যতাকে তারা ধ্বংস করেছে। অথচ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীকে আবাদ করতে এবং একে সমৃদ্ধ করতে। এখানে শান্তির সঙ্গে বসবাস করার জন্য যুগে যুগে হেদায়াত সমূহ পাঠিয়েছিলেন তাঁর নবীগণের মাধ্যমে। যারা তাতে ঈমান এনেছিল ও সে অনুযায়ী দুনিয়াকে আবাদ করেছিল বা আজও করতে চাইছে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা তাতে অবিশ্বাস করেছে ও নিজেদের কপোল কল্পিত আইন অনুযায়ী দুনিয়া পরিচালনা করেছে ও তাতে সমর্থন দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে ইহকালীন দুর্ভোগ ও পরকালীন দুঃসংবাদ। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের দুর্বল করার জন্য বা অবিশ্বাসী বানাবার জন্য যুগে যুগে নানাবিধ প্রতারণার জাল ফেলেছে। যার লোভনীয় ফাঁদে বিশ্বাসীরা অনেক ক্ষেত্রে আটকে গেছে। আধুনিক যুগে রাজনীতি ও অর্থনীতির নামে নানাবিধ মনগড়া মতবাদ পৃথিবীতে চালু হয়েছে। যার পরিণতিতে বিশ্ব পারস্পরিক হানাহানিতে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। দলতন্ত্রের অভিশাপে ও নেতৃত্বের কোন্দলে মানুষ পরস্পরে শত্রু হয়েছে। ধনতন্ত্রের অভিশাপে ধনী-গরীবের বৈষম্য আজ চরমে উঠেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি হিংস্র অক্টোপাসের মত সারা বিশ্বের রক্ত শুষে নিচ্ছে। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব অপ্রতিরোধ্যভাবে জেঁকে বসেছে। এমতাবস্থায় ঈমানদারগণ কোন্ পথের পথিক হবেন? তারা কি অস্তিত্ব রক্ষার অজুহাতে কুফরীর সঙ্গে আপোষ করবেন? নাকি জীবন বাজি রেখে তার ঈমানকে আঁকড়ে ধরবেন? আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি

তাগূতে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ব্যক্তি এমন এক মযবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা কখনোই ভাঙ্গবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

পৃথিবীতে ব্যাপক অশান্তি ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ও দলাদলি। আল্লাহ বলেন, 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না । আর শুভ পরিণাম হ'ল কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত... *(আন'আম ৬/১৫৯)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা চেয়ে নিলে তুমি তাতেই সমর্পিত হবে (আল্লাহ্র সাহায্য বঞ্চিত হবে)। আর না চেয়ে পেলে তুমি তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে'।[১৮৫] তিনি বলেন, 'তোমরা সত্ত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে...।[১৮৬] তিনি বলেন, আমরা নেতৃত্ব সমর্পণ করিনা ঐ ব্যক্তির হাতে, যে তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাংখা পোষণ করে'।[১৮৭] অথচ নেতৃত্বের লড়াই হ'ল ভোটের রাজনীতির মূল কথা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতি হ'ল এর বিপরীত। যেখানে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়। চেয়ে নেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় কারণ হ'ল সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ইত্যাদির মাধ্যমে দু'হাতে মানুষের রক্ত শোষণ করার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। আর সূদ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের আটটি আয়াত[১৮৮] এবং

---

১৮৫. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৪১২।

১৮৬. বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১।

১৮৭. বুখারী হা/৭১৪৯; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩।

১৮৮. সূরা বাক্বারাহ ২৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০; আলে ইমরান ১৩০; নিসা ১৬১; রূম ৩৯।

Contents

চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা সূদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের টাকা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১৮৯] অথচ কথিত ঈমানদারগণের হাতেই দলতন্ত্র ও পুঁজিবাদ আইনী বৈধতা পাচ্ছে এবং প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সূদের টাকা শোধ করতে না পারলে একদিকে সরকার পিটাচ্ছে ও জেল খাটাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রাম্য সূদী মহাজন ও এনজিও-র লোকেরা ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউবা পিটিয়ে হত্যা করে লাশ গাছে বেঁধে রেখে অন্যদের ভয় দেখাচ্ছে। এসব যুলুমের কোন প্রতিকার নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি হ'ল এর বিপরীত। যেখানে সূদের ও পুঁজিবাদের কোন অবকাশ নেই। রয়েছে ধনী-গরীব সকলের প্রতি অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ হ'ল সর্বত্র জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষকামিতা। সকলেই জানেন যে, নবীগণ কারো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে ভাগ বসাতে আসেননি। তাহ'লে কেন তাদের উপরে সমাজনেতারা সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? কারণ ছিল একটাই যে, তাঁরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্র দাসত্বের পথ দেখিয়েছিলেন। কুফরকে সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাগ করে নিষ্কলুষ ঈমানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেননা ঈমান ও কুফর কখনো একত্রে চলতে পারে না। এভাবে যুগ যুগ ধরে ঈমানদারগণ ও তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে, তা নিছক কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সংগ্রাম নয়; বরং তা হ'ল আক্বীদা-বিশ্বাস ও দর্শন-চিন্তার সংগ্রাম। এটা ব্যতীত এই সংগ্রামের অন্য কোন মূল্যায়নই হ'তে পারে না। এখানে তাই মুমিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, বরং তাদের ঈমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম *(বুরূজ ৮৫/৮)*। যদিও বিরোধীগণ সর্বদা একে অন্যভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করে থাকে। জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন![১৯০]

---

১৮৯. আহমাদ হা/৩৭৫৪; হাকেম হা/২২৬২; মিশকাত হা/২৮২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৫১৮।

১৯০. ১২তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮।

৪৭. মানবতার শেষ আশ্রয় ইসলাম

মানুষ বড় অসহায় সৃষ্টি। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েই চিৎকার দিয়ে কান্নার মাধ্যমে সে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। তারপর মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীদের লালন পালনে সে ক্রমে বেড়ে ওঠে। যৌবনে ধনবলে-জনবলে বলিয়ান হয়ে সে অনেক সময় তার অসহায়ত্বের কথা ভুলে যায়। বার্ধক্যে সে আবার অসহায় হয়ে পড়ে। এভাবে এক সময় সে করুণ চাহনি দিয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তার জন্ম ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতি সকল ক্ষেত্রে সর্বদা সে অদৃশ্য কোন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। সেই অদৃশ্য মহা শক্তিধর সত্তার নাম 'আল্লাহ'। আসমান ও যমীনের সবকিছুই তাঁর অনুগত। তবে যেহেতু মানুষকে পরীক্ষার জন্য তার ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাই সে অনেক সময় তার সীমিত জ্ঞানের বড়াই করে। যিদ ও অহংকারে বুঁদ হয়ে নিজের ক্ষমতার দম্ভ করে। এক্ষণে যদি কেউ ভেবে থাকেন নিজেরা আইন বানিয়ে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে দেশ ঠিক করে ফেলব, তাহ'লে তাকে একবার পিছনের দিকে তাকাতে বলব।-

আমেরিকার 'মদ্য নিবারক' আইনটি ছিল গত শতাব্দীতে (১৯২০-১৯৩৩) বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংস্কার প্রচেষ্টা, যা মাত্র চৌদ্দ বছরের মাথায় চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। কারণ আমেরিকা তাদের শেষ আশ্রয় ভেবেছিল তাদের জনমত ও সিনেটরদের মতামতকে। শাশ্বত সত্য বলে কিছুই তাদের কাছে ছিল না, যার কাছে তারা মাথা নত করতে পারে। আর তাই ১৯২০ সালের জানুয়ারীতে 'মদ্য নিবারক আইন' পাস করলেও মদ হারানোর বিরহ বেদনায় ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে তারা পুনরায় মদ বৈধ করার পক্ষে আইন পাস করে। অথচ আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে চৌদ্দ বছরে ২০০ লোক পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। ৫ লাখ ৩৪ হাযার ৩৩৫ জন লোক কারারুদ্ধ হয়। এতে বুঝা যায় যে, মদ নিষিদ্ধ করার মত একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়েও সেদেশের মানুষ একমত হ'তে পারেনি। অথচ দেড় হাযার বছর আগে মদীনায় যেদিন মদ নিষিদ্ধ করা হয়, সেদিন মুসলমানরা সাথে সাথেই মদ পরিত্যাগ করল, ভাণ্ডসমূহ গুড়িয়ে দিল। এর জন্য কোন পুলিশ বা জেলখানার প্রয়োজন হয়নি। কারণ একটাই। মুসলমানরা আল্লাহ্কেই সার্বভৌমত্বের মালিক বলে বিশ্বাস

করেছিল এবং আখেরাতে মুক্তি অর্জনকে তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। পক্ষান্তরে মার্কিন জাতি জনগণকেই সার্বভৌমত্বের মালিক ভেবেছিল এবং দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়াকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। যা তাদেরকে সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী বানিয়েছিল। বর্তমান পৃথিবীতে তাদের অনুসারী রাষ্ট্রগুলির অবস্থাও প্রায় একই রূপ। ফলে শান্তির সোনার হরিণ আজও অধরা রয়েছে।

প্রশ্ন হ'ল : এভাবেই কি চলতে থাকবে চিরদিন? বারবার দলবদল ও নেতাবদলে সমাজের কাংখিত পরিবর্তন হয়েছে কি কোনদিন? অজ্ঞ ও বিজ্ঞের ভেদাভেদহীন দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আগতদের মাধ্যমে সংসদে বসে ঝগড়া ও টেবিল চাপড়ানো ছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় সৎ পরামর্শ ভিত্তিক নিরপেক্ষ প্রশাসন সম্ভব হবে কি কোনদিন? আইন রচনার শাশ্বত উৎস কোনটি? সার্বভৌমত্বের মালিক কে? -যার সামনে সকল সংসদ সদস্য মাথা নত করতে বাধ্য? এ প্রশ্নের সমাধান আজও হয়েছে কি? অথচ সেই সত্য তো কেবলমাত্র 'আল্লাহ'। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ তাঁরই সৃষ্ট বান্দা। তাঁর দেওয়া আলো-বাতাস, মাটি ও পানি যেমন সবার জন্য কল্যাণময়, তেমনি তাঁর প্রেরিত আইন ও আহকাম সকল মানুষের জন্য চিরন্তন কল্যাণ বিধান। নেপোলিয়ন, বার্নার্ডশ', এম.এন. রায় প্রমুখ অগণিত মনীষী ইসলামী শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। ভারত বিভাগের পর মিঃ গান্ধী সেদেশে ওমরের শাসন কায়েমের জন্য নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এভাবে জ্ঞানীগণ যুগে যুগে স্বীকার করলেও সমাজনেতাগণ তা মানতে চান না। কারণ তাতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাহত হয়। আর সেকারণেই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তোলেন। যার একমাত্র লক্ষ্য সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ফলে যে সংসদে ছালাতের বিরতি দিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়া হয়। সেই সংসদেই আল্লাহ্‌র বিধানকে পদতলে পিষ্ট করে নিজেদের বিধান চালানো হয়। অতঃপর প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে জনগণকে তা মানতে বাধ্য করা হয়। এভাবে স্বাধীন মানুষকে আল্লাহ্‌র গোলাম না বানিয়ে মানুষের গোলাম বানানো হয়। ফলে এক দলকে দিয়ে আল্লাহ আরেক দলকে প্রতিরোধ করেন *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*। সম্প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উপর বিগত

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার (২০০১-২০০৬ খৃ.) ইতিহাসের যে জঘন্যতম মিথ্যাচার ও অত্যাচার চালিয়েছে, তার কৈফিয়ত তারা আল্লাহ্‌র কাছে দিতে পারবেন কি? ট্রাজেডী এই যে, নেতারা কখনো নিজেদের অন্যায়ের কথা স্বীকার করেন না।

বৃটিশ চলে গেছে ৬১ বছর আগে। ইতিমধ্যে বহু নেতা এলেন আর গেলেন। কিন্তু নীতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? হীনমন্য কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলামকে টেনে-হিঁচড়ে প্রচলিত অমানবিক ও অযৌক্তিক মতবাদ সমূহের সাথে আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তাঁরা ভয় পান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেকে ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালন করেন। আর ভাবেন, ইসলামের আর কীইবা বাকী রাখলাম। অথচ তারা জানেন না যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য করার নাম 'ইসলাম'। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে পরিত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বহাল রাখা, আদালতে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা না করে নিজেদের রচিত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে তরুণ ছাত্রদেরকে আখেরাতমুখী শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াপূজারী ও বস্তুবাদী করে গড়ে তোলা কখনোই কোন মানবতাবাদী সরকারের কর্তব্য হ'তে পারেনা।

ইসলামের বাইরে সকল তন্ত্র-মন্ত্রই এক কথায় 'জাহেলিয়াত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানালো, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[১৯১] মুখে বলা হয় অধিকাংশ জনগণের রায় অনুযায়ী দেশ চলবে। অথচ এদেশের অধিকাংশ মানুষের আকীদা ও আমল হ'ল 'ইসলাম'। তাদেরকে পাকিস্তানী শাসকরা সবসময় ধোঁকা দিত যে, 'কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন করা হবেনা'। অথচ বলা হতো না যে, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আইন করব। কথার এই মারপ্যাঁচ সরল ঈমানদার জনগণ অত বুঝে না। তাই তারা বারবার

---

১৯১. আহমাদ হা/১৭৮৩৩; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ।

প্রতারিত হয়েছে, আজও হচ্ছে। সেক্যুলার সরকারের নিকট শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। তারা তাদের খেয়াল-খুশীকেই আইনের মর্যাদা দিয়ে দেশ শাসন করে থাকেন। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহলে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম' ..*(আ'রাফ ৭/৯৬)।* অতএব নেতৃবৃন্দ যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন, তাহ'লে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আন্তরিক হৌন। দেশকে ঈমানের পথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। অতএব মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম। মযলূম মানবতার পক্ষে তাই আমাদের আহ্বান, 'ফিরে চলুন শাশ্বত সত্যের পথে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে'। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৯২]

৪৮. নির্বাচনী যুদ্ধ

বিগত সংসদ নির্বাচনের পর এখন আসছে পৌরসভা নির্বাচন। এরপর আসবে ইউপি নির্বাচন। উদ্দেশ্য, দেশের সর্বত্র সুশাসন কায়েম করা। দলমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবনে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেওয়া। সমাজে ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিই জনগণকে অধিক জানেন, অতএব তিনিই জনগণের সত্যিকার বন্ধু- এরূপ একটা সুধারণা থেকেই বর্তমান যুগে নির্বাচনী রাজনীতির পদযাত্রা শুরু হয়েছে। আর এজন্য সৃষ্টি হয়েছে দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথা। সবাই ভোট চাইবে। ভোটার যাকে খুশী ভোট দিবে। শুনতে কতই না মধুর! কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ভোটাভুটির মাধ্যমে কি জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই হয়? কোন জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক কি নেতৃত্ব চেয়ে নিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে পসন্দ করেন? তাছাড়া অজ্ঞ ও বিজ্ঞের ভোটের মূল্য কি সমান? সমাজের অধিকাংশ সাধারণ লোকের ভোটে বিজ্ঞ লোক কিভাবে নির্বাচিত হবেন? এ জন্য জ্ঞানী ও

১৯২. ১২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৯।

যোগ্য লোকদের হয় সুবিধাবাদী নীতি ও প্রতারণামূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নইলে সরে দাঁড়াতে হবে। আজকে সেটাই হয়েছে। জ্ঞানীরা এসব থেকে দূরে থাকেন। আর অন্যেরা এসব স্থান দখল করে নিচ্ছে। ফলে অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিই এখন সমাজে অসম্মানিত শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। ১০০ ভোটারের মধ্যে ১০ জন প্রার্থীর ৯ জনের প্রাপ্ত ভোট যদি ৮৯ হয়। অন্যের ১০টি ভোটের চাইতে একজনের প্রাপ্ত ভোট যদি ১১টি হয়, তাহ'লে তিনিই হবেন ১০০ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধি। যদিও তিনি হলেন মূলতঃ ১১ জনের প্রতিনিধি। এই শুভংকরের ফাঁকি ছাড়াও রয়েছে বিরাট জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ও সময়ের অপচয়। রয়েছে ভয় প্রদর্শন, মিথ্যা আশ্বাস ও ধোঁকা-প্রতারণার গরমবাজারী। কেননা প্রত্যেক প্রার্থীই ১০০ ভোটারের মন জয় করার জন্য দু'হাতে পয়সা খরচ করে ও নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। অবশেষে ৯ জন ফেল করলে তারা সব হারায়। এই ভোটের জুয়ায় যে পাশ করে, তার প্রধান লক্ষ্য হয়- ব্যয়কৃত অর্থ সূদে-আসলে উঠিয়ে নেওয়া এবং আগামী ভোট আসার আগেই সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। এমনকি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া। এই নির্বাচনী যুদ্ধের আবশ্যিক পরিণতি হিসাবে সমাজের সর্বত্র সশস্ত্র ক্যাডারের একটি দল সৃষ্টি হয়েছে। যারা প্রার্থীর টাকা পেয়ে মিছিল-মিটিং করে, প্রতিপক্ষের ক্ষতি করে, এমনকি খুনোখুনিতেও লিপ্ত হয়। সেই সাথে সৃষ্টি হয়েছে একদল চাঁদাবাজ, টেণ্ডারবাজ ও তদবিরবাজ। যাদেরকে এড়িয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। তাদেরকে দমন করারও কেউ থাকে না। ফলে যে উদ্দেশ্যে এরা নির্বাচিত হন, তার কিছুই এদের দ্বারা সমাজ পায় না।

সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের অধিকাংশ দুর্নীতির উৎস হ'ল রাজনীতিবিদরা অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। যদিও নিঃস্বার্থ ও জনদরদী রাজনীতিবিদগণের সম্মান ও মর্যাদা সর্বদা ছিল ও থাকবে। কিন্তু বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিরা রাজনীতিবিদ নন। তাদেরকে আনা হয় প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য। সমাজে শান্তি ও শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে হয়ে থাকে তার উল্টা। আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই দিল্লীতে বসে বাংলা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের ১ লাখ ১৩ হাযার পরগণা শাসন করেছেন শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খৃ.)। শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৪-৮৮ খৃ.) টাকায় ৮ মণ চাউল কিনেছে ঢাকার মানুষ। অথচ এদেশের মানুষ এখন পেটের দায়ে

সন্তান বিক্রি করছে। নেতৃত্ব নিয়ে ঘরে ঘরে এরূপ মারামারি-কাটাকাটি তখন ছিল না। বরং সর্বত্র ছিল নেতার প্রতি আস্থা ও সম্ভ্রমবোধ। কিন্তু এখন সর্বত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও ছোট্ট একটি দেশ শাসন করতেও আমরা অপারগ। কারণ কী? এর গোড়ায় গলদ কোথায়? জবাব এই যে, এর প্রধান গলদ হচ্ছে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার রাজনীতি। যা তার মধ্যে নেতৃত্ব আদায় করে নেওয়ার হিংস্র মানসিকতা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন হ'ল : এরূপ নির্বাচনের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল বিচার, শাসন ও আইন বিভাগ। বিচার ও শাসন বিভাগে কোন নির্বাচন হয়না। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং ডিসি, ইউএনও গণ হন সরকারের নিযুক্ত। বাকী আইনসভা বা জাতীয় সংসদ সদস্যগণ হন জনগণের নির্বাচিত। অন্যদের যোগ্যতা বিচার করা আবশ্যিক হ'লেও যারা আইনপ্রণেতা হবেন, তাদের কোন যোগ্যতা-দক্ষতা-সততা কিছুই বিচার করা হয় না। তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন কোনরূপ ডিগ্রীহীন স্বশিক্ষিত দলনেতা। আর এইসব নেতারা যখন শিক্ষা বিভাগ এবং শাসন ও বিচার বিভাগের উপর খবরদারী করেন, তখন দেশের অবস্থা যেমনটা হওয়া উচিত, তেমনটাই হচ্ছে। মানীর মান নেই, গুণীর কদর নেই। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, গুম, খুন, নারী নির্যাতন এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। পৃথিবীর যেসব দেশে এই নির্বাচনী জুয়া রয়েছে, সেসব দেশ এভাবে অশান্তির দাবানলে জ্বলছে মূলতঃ এই দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার কারণে। এতে সৎ ও যোগ্য লোক নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কেউ হ'লেও নিজ দলীয় বা বিরোধী দলীয় চাপে তিনি সৎ ও নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না।

অথচ ডিসি ও ইউএনও-দের সাথে অতিরিক্ত প্রশাসক দু'তিনজনকে নিয়োগ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক ও উপযেলা প্রশাসকদের কাজ হবে দৈনিক গ্রামে-গঞ্জে সফর করা ও জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া ও তাদের কথা শোনা। যার যত সুনাম হবে, তার তত দ্রুত পদোন্নতি হবে ও তিনি পুরস্কৃত হবেন। দুর্নাম হলে শাস্তি হবে। যেলা প্রশাসকের ন্যায় প্রয়োজনে ইউনিয়ন প্রশাসকও নিয়োগ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রধান ২টি স্তম্ভের ন্যায় আইন প্রণয়ন বিভাগটিও হবে সরকারের মনোনীত। দেশের যিনি প্রধান হবেন একমাত্র তিনিই হবেন নির্বাচিত। আর তা হবে রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণীদের মাধ্যমে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির অনুসরণে। সাধারণ জনগণ উপরোক্ত নির্বাচনকে সমর্থন করবে মাত্র। এই প্রযুক্তির যুগে সকলে ঘরে বসে অন-লাইনে ভোট দিবে। কোনরূপ ছুটি ঘোষণা, ক্যানভাস, হৈ-হুল্লোড়, ক্যাডারভীতি ও টাকার ছড়াছড়ি থাকবে না। নির্বাচন কমিশন দায়িত্বশীল হবেন কিভাবে তাঁরা দল ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচিত নেতা জানতে বা বুঝতেও পারবেন না কারা তাকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। এর ফলে তার মানসিকতা থাকবে সবার প্রতি উদার ও নিরাসক্ত। দলীয় চাপ থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন ও নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করতে পারবেন। সরকারী ও বিরোধীদলের কোন নামগন্ধ থাকবেনা। অতঃপর তিনি দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানী-গুণী ও বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ও অভিজ্ঞ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পার্লামেন্ট মনোনয়ন দিবেন। যাদের পরামর্শে তিনি দেশ শাসন করবেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক যেহেতু আল্লাহতে বিশ্বাসী, সেহেতু তিনি আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা দিবেন এবং আল্লাহ্র বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করবেন। কোনভাবেই তিনি বা তার পার্লামেন্ট স্বেচ্ছাচারী হবেন না। ইনশাআল্লাহ এভাবেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ যদি চাওয়ার মাধ্যমে তোমাকে তা দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি তাতেই সমর্পিত হবে। আর যদি না চাইতে দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[১৯৩] তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমরা ঐ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিনা, যে ব্যক্তি তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে বা তার আকাংখা পোষণ করে'।[১৯৪] তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি নেতৃত্বের লোভ করবে, ক্বিয়ামতের দিন সেটি তার জন্য লজ্জার কারণ হবে'।[১৯৫]

---

১৯৩. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৪১২।

১৯৪. বুখারী হা/৭১৪৯; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩।

১৯৫. বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১।

Contents

অতএব, ঘরে ঘরে নেতা হবার এই অন্যায় প্রতিযোগিতা ও দলাদলি-হানাহানির মূল উৎস বন্ধ করতে হবে। সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তাই আমাদের পরামর্শ হ'ল, দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে চালু করুন। গণতন্ত্রের নামে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের প্রতারণামূলক নির্বাচন ব্যবস্থার লেজুড়বৃত্তি পরিহার করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন![১৯৬]

৪৯. গণজোয়ার ও গণঅভ্যুত্থান

সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছে। তাতে ইতিমধ্যে তিউনিসিয়া ও মিসরের দুই লৌহমানবের পতন ঘটেছে। আর লিবিয়া ও ইয়ামনের দুই লৌহমানব এখন পতনের মুখে। বাহরায়েন ও জর্ডানে লু হাওয়া বইছে। সিরিয়া ও সঊদী আরবে আতংক দেখা দিয়েছে। সুদান ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যকে আরও বিভক্ত করা হবে।

ছহীহ হাদীছ সমূহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহূদী-নাছারাদেরকে মুসলমানদের প্রধান শত্রুশক্তি হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এজন্য প্রতিদিন ছালাতে সূরা ফাতিহার শেষ দিকে 'গায়রিল মাগযূবে 'আলাইহিম অলাযযা-ল্লীন' বলে অভিশপ্ত ইহূদী ও পথভ্রষ্ট নাছারাদের পথে না যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু বলা চলে যে, আজকের মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রনেতা ঐসব অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের গোলামী করছে। কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে বললেও তাদের পাতানো সিস্টেমের গোলামী করছে। ফলে পরোক্ষভাবে তাদেরই কপট উদ্দেশ্য পূর্ণ হচ্ছে। গত শতাব্দীতে ওছমানীয় খেলাফতের শেষ খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের নিকটে যখন ফিলিস্তীনে ইহূদী বসতি স্থাপনের অনুমতি চেয়েছিল বৃটিশ প্রতিনিধি, তখন দুর্বল খলীফার সবল ঈমানী চেতনা তার তীব্র প্রতিবাদ করে উঠেছিল। তিনি অনুমতি দেননি। সুচতুর বৃটিশরা তখন অন্যপথ ধরেছিল। তারা আরবদের সাথে তুর্কীদের বিভেদ ঘটানোর জন্য জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করতে থাকে। সেই সাথে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয় তরুণদের মাঝে।

---

১৯৬. ১৪তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১১।

‘যেকোন নতুন বস্তুই মজাদার’-এই প্রবাদ বাক্যটি তরুণ বংশধরদের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফলে ১০/১২ বছরের মধ্যেই উত্তাল হয়ে ওঠে জনমত। পাশ্চাত্যের দাবার ঘুঁটি কামাল পাশার নেতৃত্বে ঘটে যায় বিপ্লব। ওছমানীয় খেলাফত ভেঙ্গে যায়। বিদেশীরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় পুরা খেলাফতকে। শক্তিশালী তুরস্ক রাতারাতি ‘ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি’ বলে পরিচিত হয়। ১৯২৪ সালে ঘটে যাওয়া এই মহা বিপর্যয়ের পিছনে মূল কারণ ছিল খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূরপ্রসারী নীলনকশা। তারা সেদিন অস্ত্র নিয়ে আসেনি। এসেছিল মতবাদ নিয়ে। মগয ধোলাই করেছিল তরুণদের। তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে নিজেদের তৈরী করা মতবাদ সমূহের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে-তাই করার উন্মত্ত নেশা, গণতন্ত্রের মাধ্যমে যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে যেকেউ নেতা হবার মদমত্ত আবেগ, পুঁজিবাদের মাধ্যমে লুটেপুটে ধনী হবার উন্মাতাল প্রেরণা, জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে উদার মানবতাবাদের কবর রচনা করে ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ চিন্তায় আচ্ছন্নকারী প্রগলভতা তুর্কী ও আরবদের মাঝে বাধার বিন্ধ্যাচল দাঁড় করিয়ে দেয়। যা পরবর্তীতে আরব বংশোদ্ভূত নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর প্রচারিত ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। তাই দেখা যায়, বিপ্লবের পর তুরস্ক থেকে আরবী আযান তুলে দেওয়া হয়। মেয়েদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বোরকা ছিঁড়ে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐক্যবদ্ধ ইসলামী খেলাফত ভেঙ্গে পৃথিবীতে এখন মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৬টি। তন্মধ্যে কেবল মধ্যপ্রাচ্যেই ২২টি। এবার সেগুলি ভেঙ্গে করা হবে নাকি ৪০টি। খ্রিষ্টানী সাম্রাজ্যবাদের এই আঘাত থেকে মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিপ্লবী নেতার জন্ম হয়। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠন থেকে স্ব স্ব দেশকে রক্ষায় সমর্থ হন। সঊদী আরবের আব্দুল আযীয, মিসরের মোহাম্মদ আলী, লিবিয়ার মু‘আম্মার আল-গাদ্দাফী, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। এঁদের মধ্যে কেবল গাদ্দাফী বেঁচে আছেন। কিন্তু শেষ দিকে এসে তিনি তাঁর বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ইরাকে সাদ্দাম হোসায়েন[১৯৭]

১৯৭. ১৯৭৯ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ২০০৩ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত ২৪ বছর তিনি ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গণবিধ্বংসী জীবাণু অস্ত্র তৈরী করার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ২০০৩ সালের

(১৯৩৭-২০০৬ খৃ.)-এর পরাজয়ের পর গাদ্দাফী রাতারাতি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মিত্র বনে যান এবং এইসব লুটেরাদের জন্য লিবিয়ার তৈল ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন। এর ফলে সেখানে কিছু ধনকুবের সৃষ্টি হ'লেও দেশে কর্মসংস্থানমুখী কোন শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা হয়নি। কৃষিতেও ঘটানো হয়নি কোন উন্নয়ন। ফলে সেদেশের মাথা পিছু জাতীয় আয় ১২ হাযার ডলারের বেশী হ'লেও দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের গড় আয় প্রতিদিন মাত্র দুই ডলারেরও কম। সেদেশে বর্তমানে কর্মক্ষম মানুষের ২১ শতাংশই বেকার। ফলে জনগণ গাদ্দাফীর প্রতি আগের মত এখন আর অন্ধভক্তি পোষণ করে না। অন্যান্য দেশেও কমবেশী একই অবস্থা বিরাজ করছে। আর এই সুযোগটাই নিয়েছে পাশ্চাত্য শকুনীরা। তারা এখন পুরা মধ্যপ্রাচ্যকে টুকরা টুকরা করে তৈল সম্পদের উপর দখল নিতে চায়। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল সেদিকেই এগোচ্ছে।

এক্ষণে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রচ্যের দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাগণ যদি নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেন এবং স্ব স্ব দেশে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে আন্তরিক হন ও জনগণের মৌলিক মানবাধিকার সমূহ সুরক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহ'লে নিজ দেশের জনগণ হবেন তাদের দেহরক্ষী। তবে এটাও বাস্তব যে, সর্বদা বিদেশের চর ও কপট রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী সব মুসলিম দেশেই আছে ও থাকবে। ওদেরকে চিহ্নিত করে দিলে জনগণ তাদের বয়কট করবে। বিদেশীরা নিরাশ হবে। মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণা কোন কাজে আসবে না *ইনশাআল্লাহ*।

বর্তমান অমুসলিম বিশ্ব ইসলামকে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে তারা সেক্যুলার, পপুলার ও ছূফী তিনটি দলকে তাদের আপন মনে করে ও সালাফীদের শত্রু মনে করে *(সূত্র : Rand 2007)*। কারণ সেক্যুলাররা পাশ্চাত্যের কাছে দাসখত দিয়েই রাজনীতি করে। তারা ক্ষমতায় গেলে পাশ্চাত্যের সবকিছুর অনুসরণ করবে এবং ইসলামের কোন বিধানই কার্যকর করবে না, এরূপ অলিখিত চুক্তি তাদের থাকে।

২০শে মার্চ আমেরিকা ইরাকের উপর হামলা করে এবং সাদ্দাম পালিয়ে যান। পরে গ্রেফতার হ'লে মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঈদুল আযহার দিন সকাল ৬.০৬ মিনিটে তাঁকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

পপুলার বা মডারেটরা 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে সবাইকে খুশী করার চেষ্টা করে। আর ছূফীরা তো 'যত কল্লা তত আল্লা' শ্লোগান দিয়ে সর্বদা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ঘুঁচিয়ে দেবার মেহনত করেন। আগ্রাসী যালেম শক্তি হয়তবা তাদের দৃষ্টিতে খোদ আল্লাহ্রই অংশ। অতএব তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেওয়াই কর্তব্য। কেননা 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়'। অতএব যুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা জিহাদ নয়, বরং যালিমের যুলুম হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া এবং ত্বাগূতী শক্তির গোলামীর তকমা গলায় বাঁধাকে তারা হয়তবা 'আল্লাহ হইতে হয়েছে' বলে সন্তুষ্ট হবেন। উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে তাদের এই চরিত্রই দেখা গেছে। ফলে এসব মতবাদের ওরস ও ইজতেমায় লাখ মানুষের ভিড় হয়। মানুষ সেখানে ছুটে যায় পরকালীন মুক্তির মিথ্যা আশায় অথবা দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার উদগ্র নেশায়। অথচ সবকিছুই মায়া-মরীচিকা মাত্র।

পক্ষান্তরে শত্রুদের চোখের বালি হ'ল সালাফী তথা আহলেহাদীছ আন্দোলন। যারা ইসলামকেই মানবজাতির ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করেন। উক্ত বিশ্বাসের আলোকে তারা তাদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকেন। অদ্বৈতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মডারেট উদারতাবাদের শিরকী ও বিদ'আতী ধারা সমূহের বাইরে তারা তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিরংকুশভাবে স্রেফ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ করেন। উক্ত অভ্রান্ত বিধানের আলোকে আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তারা সমাজের সার্বিক সংস্কার কামনা করেন এবং এজন্য দিন-রাত তাওহীদের দাওয়াত ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদে জীবন অতিবাহিত করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, ঈমান ও আমলে ছালেহ হ'ল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। দেশের জনগণ যখন উপরোক্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং এর অনুকূলে জামা'আতবদ্ধ হবে, তখনি আসবে কাংখিত ইসলামী খেলাফত। যাকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায় পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের দোসররা। আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পক্ষে বাংলাদেশে যখন গণজোয়ার সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল, তখনই পাশ্চাত্যের এদেশীয় দোসররা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের

উপর জেল-যুলুম চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে, *ইসলাম যেন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। বড় পরীক্ষাতেই বড় ফল আসে। তাই বিজাতীয় মতবাদের পক্ষে নয় বা ইসলামের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতের পক্ষে নয়, বরং নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পক্ষে সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ গণজোয়ার সৃষ্টি হৌক এবং জনগণকে পরিচালনার জন্য যোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি হৌক আল্লাহ্‌র নিকটে আমরা কেবল সে প্রার্থনাই করব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![১৯৮]

৫০. মিসকীন ওবামা, ভিকটিম ওসামা, সাবধান বাংলাদেশ

জনগণের আশা-আকাংখার প্রতীক হয়ে আমেরিকার ক্ষমতায় এলেন বরাক হোসায়েন ওবামা। তাঁর কথায় ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক নোবেল কমিটি তাঁকে অল্প দিনের মধ্যেই শান্তিতে 'নোবেল' পুরস্কারে ভূষিত করলেন। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তিনি যত ভাল মানুষই হন না কেন, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ও তার শোষণবাদী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পলিসির কোন পরিবর্তন হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১৯৯] আমেরিকা এখন সেই পরিণতিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের ৩৩১টি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। হাযার হাযার কর্মচারী-কর্মকর্তা চাকুরী হারিয়েছেন। এমনকি এ মাসেই খোদ নিউইয়র্ক সিটিতে ছয় হাযার শিক্ষক চাকুরী হারাতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই সেদেশে প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন হতদরিদ্র। আমেরিকার এখন নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাই চিরবৈরী গণচীনের কাছে তাকে হাত পাততে হয়েছে। তাদের কাছে সে এখন তিন হাযার বিলিয়ন ডলারের বিশাল অংকের ঋণের জালে আবদ্ধ। ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, গুয়ান্তানামো বে কারাগার বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণ প্রভৃতি কোন নির্বাচনী ওয়াদাই ওবামা পূরণ করতে পারেননি। এদিকে চার বছরের মেয়াদও শেষের পথে। ঐতিহ্য অনুযায়ী আগামী ২০১২ সালের নভেম্বরে তাঁকে দ্বিতীয় মেয়াদে জিততে হবে। নইলে বড়ই লজ্জার কারণ হবে। কেননা পরপর দু'বার নির্বাচিত হওয়া সেদেশের

---

১৯৮. ১৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১১।

১৯৯. আহমাদ হা/৩৭৫৪; হাকেম হা/২২৬২; মিশকাত হা/২৮২৭।

ভাল প্রেসিডেন্টদের নিদর্শন। পুনর্নির্বাচনের জ্বরে আক্রান্ত ওবামা তাই এখন বড়ই মিসকীন।

একদিকে অর্থনীতি উদ্ধার অন্যদিকে ক্ষমতা উদ্ধার। দু'দিকেই সামাল দেবার জন্য তিনি তাঁর পূর্বের প্রেসিডেন্ট বুশের পথ ধরেছেন। তিনি তাঁর সময়ে অর্থনীতি ও রাজনীতি উদ্ধারের জন্য দু'টি নোংরা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন। এক- মুসলিম বিশ্বের তৈল সম্পদ লুট করা এবং দুই- মুসলিম সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলিকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী আন্দোলন হিসাবে বদনাম করা ও তাদেরকে উৎখাত করা।

ইংরেজরা ইতিপূর্বে বিশ্ব শোষণ করেছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা তাদেরই দেশ। ভারতবর্ষ ছিল তাদের এককালের শোষণভূমি। তাই সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে আফগানিস্তানে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল এখানে। আফগানীদের ইসলামী জোশকে কাজে লাগালো অর্থ দিয়ে অস্ত্র দিয়ে। সঊদী আরবের বিখ্যাত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন লাদেন কোম্পানী-র অন্যতম উত্তরসুরী প্রকৌশলী উসামাকে একাজে লাগানো হ'ল। প্রায় দশ বছরের (১৯৭৯-৮৯) রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে রাশিয়া বিতাড়িত হ'ল। তালেবান নেতাদের হোয়াইট হাউজে ডেকে নিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হ'ল। কিন্তু বাগে ফিরলো না তালেবানের ইসলামী সরকার। তারা আফগানিস্তানের সম্পদ অন্যকে দেবে না। নিজেদের সম্পদ নিজেদের বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করবে।

স্বার্থে আঘাত লাগলো। অতএব এবার তালেবান সরকার উৎখাতের পালা। গণতন্ত্রের সুড়সুড়ি দিয়ে বিরোধী দলগুলির মাধ্যমে সে কাজ সারা হ'ল। পুতুল সরকার ক্ষমতায় এলো। এবার রাতারাতি তালেবান হ'ল সন্ত্রাসী দল। ওসামা ও মোল্লা ওমর হ'লেন বিশ্বের সেরা জঙ্গী। অতঃপর সরাসরি হামলার অজুহাত সৃষ্টি করা হ'ল। ১/১১-এর নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হ'ল। তিন হাযার লোক মারা গেল। কিন্তু ১৩০০ ইহূদী কর্মকর্তা-কর্মচারীর কেউ ঐদিন কাজে গেল না। এমনকি সেখানে ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর আগের দিনের সফর বাতিল করা হ'ল। ঘটনার সাথে সাথে ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে প্রেসিডেন্ট বুশ বিবৃতি দিলেন। অথচ ওসামার ওয়েব সাইটে ১১-২৪ সেপ্টেম্বর ১৩ দিনের মধ্যে ৪ বার ঘোষণা এল যে, তিনি বা তার সংগঠন এতে জড়িত নয়। এই মর্মান্তিক ট্রাজেডীর তদন্ত

রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। অথচ ঘটনার মাত্র ২৮ দিনের মাথায় ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আফগানিস্তানে সরাসরি হামলা করল আমেরিকা ও ন্যাটো জোট। আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হ'ল। কিন্তু ওসামাকে পাওয়া গেল না। শোষণ-শাসন দু'টিই চলতে থাকল। ৩ বছর ৯ মাস পর ২০০৫ সালের ১৯শে জুন বুশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি বললেন, ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কোন অকাট্ট প্রমাণ মার্কিন প্রশাসনের কাছে নেই। সে জন্যই তিনি কোন এলাকায় আছেন, সে সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও তারা তাকে গ্রেফতার করতে পারছেন না। কারণ গ্রেফতার করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। সেই মামলায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে তাকে মুক্তি দিতে হবে'।

প্রশ্ন হ'ল, সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত থাকার কোন প্রমাণ না থাকলে কিসের ভিত্তিতে তারা আফগানিস্তানের মত একটা স্বাধীন দেশের উপর হামলা চালালো? জবাব রয়েছে তাদের কাছেই। ২০০৫ সালের ২৮শে অক্টোবর ভার্জিনিয়ার সেনা সদরে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন, বিগত শতাব্দীর পতিত সমাজতন্ত্রের মতোই বর্তমান শতকে ইসলামী মৌলবাদ বিশ্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ... একে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করতে হবে'।

একই কথা প্রযোজ্য ইরাকের ক্ষেত্রেও। গণবিধ্বংসী জীবাণু অস্ত্র মওজুদ রাখার মিথ্যা অভিযোগ এনে তারা ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ ইরাকে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নিল। কিন্তু সেদিন বা আজও তারা সেখানে কিছুই পায়নি। তাহ'লে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ও টন কে টন বোমা মেরে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা, পঙ্গু ও গৃহহীন করে এবং সবশেষে একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসায়েনকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার দায়-দায়িত্ব কে নেবে? হ্যাঁ তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানুষ তাদের লক্ষ্য ছিল না, ভূগর্ভের তৈল ছিল তাদের লক্ষ্য। সেটা তারা ষোলআনা পেয়েছে। এখন তারা ইরাকের পুতুল সরকারের কাছ থেকে তাদের ইরাক যুদ্ধের পুরো খরচ আদায় করছে। বর্তমানে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির দিকে তারা থাবা বিস্তার করেছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার তাদের ফাঁকা বুলি মাত্র।

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য বুশ তার দেশবাসীকে বিন লাদেন জুজুর ভয় দেখিয়ে ভোটে পাস করেছিলেন। এবারেও দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য ওবামা তুরুপের তাস হিসাবে ওসামাকেই ব্যবহার করেছেন। অথচ অনেকের ধারণা মতে রোগাক্রান্ত ওসামা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন হয়তবা বহু পূর্বে। দুনিয়াবাসীকে যা জানতে দেওয়া হয়নি। আমেরিকা তাকে ভিকটিম বানিয়ে অন্য কাউকে হত্যা করে 'ওসামা হত্যা'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে মাত্র। নইলে ওসামার লাশ কাউকে দেখতে না দিয়ে রাতের অন্ধকারে সাগরে ডুবালো কেন? এরপরেও ঘুমন্ত ও নিঃসঙ্গ ওসামাকে হত্যাকারী বীর (?) হিসাবে ওবামা মার্কিন ভোটারদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট চাইবেন ও নির্বাচিত হবেন। কিন্তু কে না জানে যে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। তাই বিশ্ব নিন্দার মুখে ওবামা এখন বড়ই বিব্রত।

গত ২রা মে গভীর রাতে রাডার ফাঁকি দেওয়া চোরা (স্টিল্‌থ) হেলিকপ্টারে করে এসে পাকিস্তানের এবোটাবাদের সামরিক কেন্দ্রের নাকের ডগায় ওসামা হত্যার মহড়া চালিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। দৃশ্যপটের পাদ প্রদীপে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী থাকলেও পর্দার অন্তরালে কলকাঠি নাড়ছে ইহূদী-খ্রিষ্টান নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ করপোরেট হাউজগুলি। আফ্রিকা ও আরব দেশগুলি সহ মুসলিম বিশ্বের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ লুট ও বিশাল বাজার দখলের অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সর্বত্র গণতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। একাজে তারা ধর্মকেও ব্যবহার করছে। পূর্ব তিমূরে ধর্ম প্রচারের নামে তাদের খ্রিষ্টান বানিয়ে তাদেরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে পৃথক করে কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে পুতুল সরকারের মাধ্যমে সেখানকার সাগর তীরে বসে জাহাযের পর জাহায ভরে তেল লুটে নিয়ে যাচ্ছে তারা। মুখোশ খুলে যাওয়ায় পূর্ব তিমূরের বুভুক্ষ মানুষ এখন আবার ইন্দোনেশিয়ার দিকে ঝুঁকছে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ সূদানকে পৃথক করা হয়েছে, খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ এলাকার তেল লুট করার জন্য। লিবিয়ায় একদল গাদ্দাফী বিরোধীকে দিয়ে অস্থায়ী সরকার কায়েম করে তাদের কথিত অনুমতি নিয়ে তেল লুট করা শুরু হয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানের পর ওরা এবার পাকিস্ত ানকে পুরোপুরি কব্জায় নেবে। তালেবান দমন ও পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার নিরাপত্তার অজুহাতে সেদেশে মার্কিন সামরিক আগ্রাসন ও

দখলদারিত্ব কায়েমের পথ খোলাছা করা হচ্ছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের তাই এখন বাঁচা-মরা সমস্যা।

ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সূদান, মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়ামেন, বাহরায়েন-এর ন্যায় বাংলাদেশও মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের শতকরা ৯০ জন নাগরিক মুসলমান। এদেশটির উদ্ভাবিত ও নিরুপিত প্রাকৃতিক সম্পদের চাইতে অনুদ্ভাবিত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার বেশী সমৃদ্ধ। বলা হয়ে থাকে যে, পুরো বাংলাদেশ তেলের উপর ভাসছে। যা উত্তোলন করা গেলে এদেশের মাথাপিছু আয় আমেরিকার বর্তমান মাথাপিছু আয়ের চাইতে একশ' গুণেরও বেশী দাঁড়িয়ে যাবে। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সম্পদ। উপরন্তু দেশটির রয়েছে নিজস্ব দু'টি সামুদ্রিক বন্দর। রয়েছে ১৬ কোটি মানুষের বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজার। এর ভৌগলিক অবস্থান সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু বিবেচনায় নিলে এদেশটি পার্শ্ববর্তী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার এবং বিদেশী করপোরেট শক্তির আগ্রাসী থাবায় আক্রান্ত হওয়ার শতভাগ আশংকা রয়েছে। ইতিমধ্যে উজানে সব নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশটিকে মরুভূমি বানানোর চক্রান্ত সফল হয়েছে। আমাদের প্রায় এক কোটি মানুষ এখন বিদেশে শ্রম বিক্রি করছে। অথচ নিজ দেশের সম্পদের ভাণ্ডার অন্যেরা শুষে নিচ্ছে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক করপোরেট হাউজ তথা শোষক সংস্থাগুলি কখনোই চায় না বাংলাদেশ নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। তারা চায় এদেশটি সর্বদা তাদের কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারের সূদে নেওয়া ঋণের জালে আবদ্ধ থাকুক। আর তাই তাদের ইঙ্গিতে ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তি একদিকে যেমন এদেশের নেতৃত্বকে পরস্পরে বিভক্ত ও মারমুখী করে রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি দেশটিকে জঙ্গীরাষ্ট্র বানানোর সকল চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। এক্ষণে তারা কথিত জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে এদেশে ঘাঁটি গাড়বে এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতই দুরবস্থার সৃষ্টি করবে।

পরিশেষে বলব, দেশ, জাতি ও মানবতার স্বার্থে ওসামারা চিরকাল জীবন দেয়। আর তাদের অমলিন ত্যাগ ও তেজোদ্দীপ্ত ঈমানকে ওবামারা চিরদিন ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। অতঃপর ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত তাদের ফেলে

দেয় ডাষ্টবিনে। ওসামারা তাই মযলূম মানবতার প্রেরণার উৎস। আর ওবামারা হ'লেন যুলুমের প্রেতাত্মা। ওসামারা মরেও অমর। কিন্তু ওবামারা বেঁচে থেকেও মৃত। বাংলাদেশী নেতারা তাই সাবধান হও। আধিপত্যবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণনীতি ছাড়। এক বন্ধু গেলেও শত বন্ধু তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। অতএব আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে দৃঢ় ঈমান নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। মনে রেখ আল্লাহ্র শক্তির সামনে মানুষের শক্তি কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২০০]

৫১. বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম

মে ২০০৬ (৯/৮ সংখ্যা) 'দরসে কুরআন' কলামে আমাদের শিরোনাম ছিল 'জাতিসংঘের সংবিধান হৌক ইসলাম'। আজ আমরা সম্পাদকীয়তে বলছি 'বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম'। কেন বলছি? শুনুন তাহ'লে-

সংবিধান হ'ল একটি জাতি ও রাষ্ট্রের আয়না স্বরূপ। যার মধ্যে তাকালে পুরা দেশটাকে চেনা যায়। যদিও ছোট্ট পকেট সাইজ ঐ বইটির বাস্তবে কোন গুরুত্ব দেখা যায় না। কেননা কোন সরকারই এর কোন তোয়াক্কা করেন না। প্রত্যেকে স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা বা দলীয় ইশতেহার বাস্তবায়নের নামে দেশ শাসন করেন। তবে এটি কাজে লাগে মূলতঃ বিচার বিভাগের। কেননা তারা সংবিধানের দেওয়া গাইড লাইনের বাইরে কোন বিচার করতে পারেন না। এটা কাজে লাগে সংসদে আইন রচনার ক্ষেত্রে ও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তা অনুমোদনের ক্ষেত্রে। কেননা তখন সংবিধানের বাইরে গিয়ে আইন রচনা করা বা তা অনুমোদন করা যায় না। এটা প্রয়োজন হয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিচিতির ক্ষেত্রে। আমাদের দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র, না ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমাদের পাসপোর্টে সেটা লেখা থাকে। যা দেখে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশের ১ম সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের জন্য ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে। যদিও উচিত ছিল স্বাধীন দেশে নতুনভাবে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে নতুন সংবিধান রচনা করা।

---

২০০. ১৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১১।

ঐ সংবিধানে হঠাৎ করে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি যুক্ত করা হয়। যথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। অথচ এইগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ২১ দফা, ৬ দফা প্রভৃতি ৭টি বড় বড় আন্দোলনের ইশতেহারের কোথাও ছিল না। এমনকি ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে'ও ছিল না। তাহ'লে এলো কোত্থেকে? সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এগুলি এসেছিল ভারতীয় সংবিধান থেকে। যাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। যদিও বাস্তবে সেখানে আছে চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদ, চরম পুঁজিবাদ ও অন্ধ দলতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র। বর্তমান সংবিধানে আমাদের দেশের নাম হ'ল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। জানি না এর প্রকৃত অর্থ কী? কেননা এদেশে কোন রাজা নেই। তাহ'লে আমরা কার প্রজা? এর সাথে 'গণ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক'। অথচ জনগণই এদেশে সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী। আর মালিক হ'ল দলনেতা ও দলীয় ক্যাডাররা।

১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত উক্ত সংবিধান অনুযায়ী দেশ চলে বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতার শাসনাধীনে। কিন্তু দেশ পতিত হয়েছিল ইতিহাসের সবচাইতে নিকৃষ্টতম অবস্থায়। ফলে ঘটে যায় '৭৫-এর আগষ্ট ও নভেম্বর বিপ্লবের বিয়োগান্তক ঘটনাসমূহ। আসেন নতুন শাসক। পরিবর্তন আসে সংবিধানে। শুরুতেই অর্থসহ লেখা হয় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। অতঃপর প্রস্তাবনায় বলা হয়, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' (৮/১-ক)। বলা হ'ল যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলিয়া পরিচিত হইবেন (৬/২), 'বাঙ্গালী' বলে নন। অতঃপর নির্বাচিত ৪র্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত ১৯৮৮ সালের ৫ই জুন তারিখে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী হিসাবে যুক্ত হয় 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' (২/ক)। এবারের পঞ্চদশ সংশোধনীতে '৭২-এর ফেলে আসা চার মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। 'আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' উঠিয়ে দিয়ে সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'ও রাখা হয়েছে। পুরা জগাখিচুড়ী আর কি? মহাজোটের নির্বাচনী ইশতেহারের ২৫টি ওয়াদার মধ্যে সংবিধান

সংশোধনের কোন ওয়াদা ছিল না। তাহ'লে কেন বিরোধী দলবিহীন সংসদে সরকার গত ৩০শে জুন '১১ তড়িঘড়ি করে এটা পাস করে অহেতুক উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। যেখানে জনগণের জান-মাল-ইযযতের গ্যারান্টি নেই, সেখানে এসব দিকে কোন দেশপ্রেমিক সরকার নযর দেন কিভাবে? অথচ এই সংশোধনীতে মহাজোটের শরীক দলসমূহের মধ্যে রয়েছে তীব্র মতভেদ। এতে বামপন্থীরাও খুশী হয়নি, ইসলামপন্থীরাও খুশী হয়নি। তাহ'লে সরকার কাকে খুশী করতে এতবড় রিস্ক নিল? ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি, ইসলাম বিরোধী নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তি করে এবং সাথে সাথে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, শেয়ারবাজারে ধস, নারীর প্রতি সহিংসতার ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনী সহিংসতার বিগত সকল রেকর্ড অতিক্রম, ইত্যাকার হাযারো সমস্যায় জর্জরিত সরকারের উচিত ছিল সবকিছু ছেড়ে সর্বাগ্রে দেশে সুশাসন ও সুবিচার কায়েম করা। বিগত সরকার অন্যায় করেছে বলে আমরাও অন্যায় করব, এরূপ আচরণ ভাল নয়। বরং দলীয় সরকার যত বেশী নিরপেক্ষ আচরণ করবে, তত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করবে। যাইহোক সরকার যখন সংবিধানে হাত দিয়েছে, তখন দেশের জন্মগত নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। সংক্ষেপে যা নিম্নে পেশ করা হ'ল :

সংবিধান হবে দেশের জনগণের মুখপত্র স্বরূপ। যেখানে দেশের জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আচরণের প্রতিফলন থাকবে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে সেটা নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি মহাজোট ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের বিরোধী। কেননা সেখানে বলা হয়েছিল মহাজোট কখনোই 'কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন করবে না'। অথচ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' পুরাপুরিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from otherworldliness to life on earth... 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করায়'। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে ধর্মকে পৃথক করাই (فصل الدين عن الدولة) হ'ল সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অথচ মুসলিম

জীবনের ভিত্তিই হ’ল ইসলাম ধর্মের উপরে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন *(মায়েদাহ ৫/৩)*। যার বিধান সমূহ থেকে মুসলমানের জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগ মুক্ত নয়। তার রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার নীতি সবকিছুই ইসলামী হেদায়াত দ্বারা আলোকিত। উক্ত হেদায়াতের বাইরে গেলে সে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। দুনিয়াতে সে ফিৎনায় পতিত হবে ও আখেরাতে জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে। পক্ষান্তরে ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ হ’ল মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বস্তুবাদী জীবনাচারের নাম। যেখানে অহি-র বিধানের প্রবেশাধিকার নেই। যার একমাত্র লক্ষ্য হ’ল যেনতেন প্রকারেণ ‘দুনিয়া’ হাছিল করা। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। আর ইসলামী চেতনাই এদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এই চেতনাকে সমুন্নত করাই যেকোন নির্বাচিত সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের যুলুম থেকে বাঁচার চেতনা। ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী মতবাদ গ্রহণের চেতনা নয়। রাওয়ালপিণ্ডির যুলুম থেকে বাঁচার জন্য অন্য কারু দাসত্ব বরণের চেতনা নয়। ’৭২-এর সংবিধানের উপরে কোন গণভোট হয়নি। বর্তমান পঞ্চদশ সংশোধনীর উপরেও কোন গণভোট হয়নি। অথচ জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে যা খুশী করার অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কাউকে দেয়নি।

তাই আমাদের পক্ষ হ’তে দেশের সকল দলের নেতাদের প্রতি অনুরোধ ও দাবী থাকবে, এদেশের মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ‘পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ’-কেই সংবিধানের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করুন। যদি আপনারা একমত হ’তে না পারেন, তাহ’লে বর্তমান সরকারকে বলব, দেশের মানুষ ইসলামী সংবিধান চায়, না ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চায়, এর উপর গণভোট দিন। এই গণভোট যেন স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত হয়। যারা বলেন, ইসলামী শাসন অমুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর হবে এবং তাতে অমুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে, তারা ‘ইসলাম’ সম্পর্কে অজ্ঞ। দুষ্টমতি লোকেরাই কেবল ইসলামী শাসনকে ভয় পায়, ভাল মানুষেরা নয়। ইসলাম বিশ্বমানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রেরিত জীবন বিধানের নাম। এই বিধান না থাকাতেই বিশ্বে আজ অশান্তির দাবানল জ্বলছে। এজন্য সর্বাগ্রে নেতৃবৃন্দকে আক্বীদা ও আমলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসারী প্রকৃত

মুসলিম হ'তে হবে, শিরক ও বিদ'আতপন্থী কিংবা নামধারী কোন মুসলিম নয়। নেতাদের বলব, রাজনীতিকে পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে গ্রহণ করুন। ইসলামের বিরোধিতা করে মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতে আপনাদের পরিণতি কি হবে একবার ভাবুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের খাদেম হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

৫২. দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন!

লাগাতার ২ দিন, ৩ দিন, ৪ দিন সহ মোট ৭০ দিন হরতাল, অবরোধ ও লাগাতার ২২ দিন সহ ২৬ দিন অসহযোগ মিলে মোট ৯৬ দিনের তাণ্ডব ও তাতে সহিংসতায় নিহত শতাধিক ও আহত সহস্রাধিক মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস হয় এবং ৩০শে মার্চ তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতির পর বিলটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিলটি পাসের পর তৎকালীন বিরোধী নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) বলেছিলেন, 'ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম সবসময় জয়ী হয়'। নিঃসন্দেহে এটি অতীব সত্য কথা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এদেশের মানুষের কাছে শান্তির রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য। মানুষ তাকিয়ে থাকে, কখন ঐ ৯০ দিন আসবে। দলীয় হিংস্রতা ও সীমাহীন দুর্নীতির কবল থেকে তারা বাঁচবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী নেত্রী (খালেদা জিয়া) ছিলেন এর ঘোর বিপক্ষে। কিন্তু সকল বিরোধী দলের লাগাতার সহিংসতায় অতিষ্ট হয়ে অবশেষে তিনি এতে সম্মত হন এবং ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ছুটির দিন যরূরী সংসদ ডেকে বিল পাস করেন। ইতিহাসের চাকা কিভাবে ঘুরে গেল যে, তখনকার বিরোধী নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাতেই আবার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের অপমৃত্যু ঘটল। পার্থক্য এই যে, এবার কেউ এ বিল বাতিলের জন্য আন্দোলন করেনি বা দাবীও তোলেনি। এমনকি কোন কারণও ঘটেনি। স্রেফ নিজেদের খেয়াল-খুশীতে ও সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে এটা করা হয়েছে। সংবিধান নিয়ে নেতাদের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা সংবিধানের পবিত্রতার দাবীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের শামিল।

প্রশ্ন হ'ল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের মূল স্পিরিট কি ছিল? এক কথায় যার উত্তর হ'ল 'নিরপেক্ষ নির্বাচন' হওয়া। ঐ সময় সকল বিরোধী দল একমত ছিলেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে কোনভাবেই নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। বরং এটাই এ দেশে বাস্তব কথা যে, দলীয় সরকারের অধীনে কখনোই প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন হ'ল, একথা যদি তখন সঠিক হয়ে থাকে, তাহ'লে এখন বেঠিক হ'ল কেন? এর মাধ্যমে নাকি রাজনীতিবিদগণ কলংকমুক্ত হ'লেন। ভাল কথা- আপনাদের নিষ্কলুষ হওয়ার সার্টিফিকেট কে দিল? একই নেতারা তখন ছিলেন কলংকিত, আজ কেমন করে নিষ্কলংক হ'লেন? সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর আজ আছে, কাল যখন থাকবে না, তখন কেমনটি হবে?

হ্যাঁ, সকল দলের নেতাদের ও সেই সাথে জনগণের কল্যাণে আমরা একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন এটা মেনে নিলে এর মধ্যে আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেতৃত্বে আসার সুযোগ পাবে। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ : **দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন**। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা দিন। তারা রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে ইভিএম পদ্ধতিতে হৌক বা অন্য কোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে হৌক, প্রথমে একটি বিষয়ে মতামত নিন যে, তারা এদেশে ইসলামী খেলাফত চান, না নিজেদের মনগড়া শাসন ব্যবস্থা চান। দ্বিতীয় মতামত নিন যে, তারা কাকে আমীর বা প্রেসিডেন্ট হিসাবে চান। এরপরে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে একইভাবে মতামত নিন। তবে জ্ঞানী-গুণীদের মতামত হবে অগ্রগণ্য। জ্ঞানী-গুণীদের অধিকাংশ এখন দলীয় জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু যখন নির্দলীয় এবং প্রার্থীবিহীন নির্বাচন হবে এবং তাদের উপরেই সবকিছু নির্ভর করবে এবং এটিকে পরকলীন দায়িত্বানুভূতির সাথে গ্রহণ করা হবে, তখন আশা করি তাদের কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামত আসবে। এভাবে আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর তিনি একটি মুসলিম দেশের উপযোগী পরামর্শ পরিষদ নিয়োগ দিবেন ও তাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবেন। এম,পি নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবেনা। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবেনা। ক্ষমতা চেয়ে নেবার বা আদায় করে

নেবার মানসিকতা থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত অর্থে জনসেবায় ব্রতী হবে। নেতৃত্ব নিয়ে কোনরূপ হিংসা-হানাহানির সুযোগ থাকবে না। বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। জনগণ সুবিচার পাবে *ইনশাআল্লাহ*। *(দ্রঃ ইসলামী খেলাফত' বই ও সম্পাদকীয় : জানু'১১)*।[২০১]

৫৩. দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করুন

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যখন বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম তথাকথিত শান্তি বাহিনীর নেতা সন্তু লারমার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে, তখন বিএনপি সহ সকল বিরোধী দল এ চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে মিটিং-মিছিল-হরতাল করেছিল। এই চুক্তিকে বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড হারানোর চুক্তি হিসাবে সকলে আখ্যায়িত করেছিল। এখন সে আশংকা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে সন্তু লারমাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনে। তখন তারা নিজেদেরকে 'উপজাতি' মেনে নিয়েই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। সে চুক্তির অধিকাংশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকীগুলি বাস্তবায়নের পথে। চুক্তি অনুযায়ী ইতিমধ্যে সেখান থেকে ১৪৫টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে বাঙালী ও সাধারণ নিরীহ উপজাতীয়রা এখন সন্ত্রাসীদের হাতে যিম্মী হয়ে পড়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ১২ হাযারের বেশী ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয়দের পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলছে তাদের সূদসহ যাবতীয় ঋণ মওকূফের প্রক্রিয়া। উপজাতীয়দের শিক্ষা ও বৃত্তি কোটা চালু হয়েছে। প্রতিবছর তাদের ২০ জন ছাত্র বৃত্তি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। তাদের সন্ত্রাসীদের অস্ত্র জমা দেবার শর্তে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল, তার আলোকে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অধিকাংশ মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীতে তাদের নিয়োগের জন্য উচ্চতা শিথিলকরণ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে উপজাতীয়দের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও তাদের মধ্য থেকে উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এতকিছু করার পরেও তারা এখন হুমকি দিচ্ছে পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার। তারা এখন নতুন

---

২০১. ১৪তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১১।

আবদার তুলেছে যে, তাদেরকে 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। হঠাৎ এ দাবীর নেপথ্যে কারণ কি?

কারণ এটা হ'লে তারা ILO কনভেনশন-১৬৯ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। জাতিসংঘ ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের সহায়তা পাবে। এমনকি সরকারের অনুমতি ছাড়াই জাতিসংঘ এখানে এসে তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের নামে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে। কে না জানে যে, জাতিসংঘ এখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ধর্ম প্রচারের মুখোশে তারা ইতিমধ্যে যেমন ব্যাপকহারে খ্রিষ্টানীকরণ করছে, তখন তাদের নিয়ে একটা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রকাশ্য তৎপরতা চালাবে। যেভাবে তারা হাযার বছরের মুসলিম অধিবাসীদের ফিলিস্তীন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বাহির থেকে ইহূদীদের এনে গায়ের জোরে ইস্রাঈল রাষ্ট্র বানিয়েছে। অতঃপর ইন্দোনেশিয়া থেকে তৈল সমৃদ্ধ পূর্ব তিমুর এবং আফ্রিকার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র সূদান থেকে তৈল সমৃদ্ধ দক্ষিণ সূদানকে খ্রিষ্টান বানিয়ে তারা আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের বশংবদ পৃথক ও স্বাধীন খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বানিয়ে এখানে ঘাঁটি গেড়ে তারা চীনকে চোখ রাঙাতে চায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রাঈলের মত এখানে একটি সুদৃঢ় সামরিক কলোনী সৃষ্টি করতে চায়। সাথে সাথে এখানকার ভূগর্ভে লুক্কায়িত গ্যাস-তৈল ও সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ লুট করার অবাধ লাইসেন্স পেতে চায়। তাই বাংলাদেশের এখন সময় হয়েছে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক হবার। সুখের বিষয় সরকার সন্তু লারমাদের 'আদিবাসী' হবার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে।

আদিবাসী কারা? আদিবাসী অর্থ 'ভূমি সন্তান' (Son of soil or Aborigine)। যারা জন্ম-জন্মান্তর থেকে একটি অঞ্চলের অধিবাসী। যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আদি বাশিন্দারা। বাংলাদেশের আদিবাসী হ'ল এদেশের আদি কৃষক সমাজ। যারা শত বন্যা-জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও হাযার বছর ধরে এদেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। সম্প্রতি নরসিংদীর ওয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এ ভূখণ্ডের First nation বা আদি অভিবাসী হিসাবে বিগত চার হাযার বছর ধরে এ মাটিতে বসবাস করছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন রক্তধারায় মিশ্রিত হয়ে যারা এখন 'বাঙালী' জাতি নামে পরিচিত হয়েছে। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা আদৌ আদিবাসী নয়। কেননা তাদের আগমন সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী মুগল ও সুলতানী আমলে ১৭২৭ হ'তে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। কোন কোন গবেষকের মতে ১৬০০ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। গত ২৪শে জুলাই'১১-তে প্রস্তুতকৃত সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয় যে, ILO কনভেনশন-১৬৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। ৯৬ বছর বয়স্ক বোমাং রাজা অংশু প্রু চৌধুরী নিজেদের লিপিবদ্ধ বংশলতিকা ও দলীল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করে সম্প্রতি এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, আমরা এ অঞ্চলে 'আদিবাসী' নই। আমরা আমাদের দলীল-পত্রে সর্বদা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (নৃ-গোষ্ঠী) লিখি, 'আদিবাসী' নয়।

পার্বত্যদের অবস্থান : সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী উপজাতীয়রা ১৭২৭ সালে ভারত, বার্মা ও মঙ্গোলিয়া থেকে পার্বত্যাঞ্চলে আসতে শুরু করে। প্রধানতঃ গোত্রীয় সংঘাত ও রাজরোষ থেকে বাঁচার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান তিনটি গোষ্ঠী চাকমা (বর্তমানে ৩০.৫৭ শতাংশ), মারমা (১৬.৬০) ও ত্রিপুরা (৭.৩৯) চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে এসে বসবাস শুরু করে। বৃটিশরা মিজোরামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লুসাই পাহাড়ের উপর তাদের দখল কায়েমের জন্য চাকমাদের প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। অতঃপর লড়াই শেষে তাদেরকে রাঙামাটি অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ দেয়। মারমা সম্প্রদায়ের ইতিহাসও প্রায় একই রূপ। তৃতীয় বৃহৎ উপজাতীয় গোষ্ঠী 'ত্রিপুরা'গণ তাদের ত্রিপুরা রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এদেশে স্বেচ্ছা নির্বাসনে আসে খুব বেশীদিন আগে নয়। বাকী ১১টি ক্ষুদ্র উপজাতির (বর্তমানে মোট সংখ্যা ৬.১৬ শতাংশ) কোন কোনটি চাকমাদেরও আগে এসেছে। এদের সহ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় গারো, হাজং, সাঁওতাল, ওরাও, রাজবংশী, মণিপুরী, খাসিয়া প্রভৃতি মোট ৪৫টি উপজাতি রয়েছে। এদের অধিকাংশ ভারত থেকে এসেছে। তারা কেউ আদিবাসী নয়। তাদের সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান এদেশীয়

বাঙালীদের থেকে আলাদা। পৃথিবীতে এরূপ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাযার। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কিছু না কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। যারা সর্বদা স্ব স্ব রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। কিন্তু আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এদেরকে তাদের স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। আইএলও কনভেনশন-১০৭ ও ১৬৯ তাদেরই সৃষ্টি এবং বর্তমান 'আদিবাসী' শ্লোগান তাদেরই তৈরী। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে যারা টনকে টন বোমা মেরে লক্ষ লক্ষ নিরীহ বনু আদমকে অবলীলাক্রমে হত্যা করছে, সন্ত্রাস দমনের নামে যারা সারা বিশ্বে নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে হঠাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জন্য মায়াকান্নার কারণ বুঝতে কারু কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এরা যখন ভারতবর্ষে দখলদার ছিল, তখন তারা চাকমাদেরকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। এখনও তারা একই হীন স্বার্থে উপজাতীয়দের ব্যবহারের পাঁয়তারা করছে। অতএব উপজাতীয়রা সাবধান হও!

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা : ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সেখানে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্রের অর্থ, অস্ত্র ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী' তাদের অধিকার আদায়ের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে এবং ক্রমে পুরা পার্বত্যাঞ্চলকে অশান্ত করে তোলে। এভাবে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগ পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৩০ হাযার মানুষ নিহত হয়। আহত, পঙ্গু বা গৃহহারা লোকের কোন হিসাব জানা যায়নি। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী সেখানকার জনসংহতি সমিতি (UPDF) ও সংস্কারপন্থী (JSS) সদস্যরা এবং দেশী-বিদেশী কুচক্রী এনজিওগুলি। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করায় অঞ্চলটি এখন সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালী ও উপজাতীয় সাধারণ জনগণ পরস্পরে সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। যেভাবে তারা যুগ যুগ ধরে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। তথাকথিত স্বাধীন জুমল্যাণ্ড আন্দোলন, সেনা প্রত্যাহার, বাঙ্গালী খেদাও ইত্যাদি চরমপন্থী আন্দোলনে তাদের কোনই আগ্রহ নেই।

ধর্মীয় অবস্থা : ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর ২৮শে জুন'১১ পেশকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রাঙামাটিকে কেন্দ্র

করে পুরা পার্বত্য অঞ্চলকে খ্রিষ্টানীকরণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে। বিদেশী কুটনীতিকদের আনাগোনা এখানে সবচাইতে বেশী। দু'দশক আগেও পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। এখন তারা তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে। দ্বিতীয় অবস্থানে এসে গেছে নব্য খ্রিষ্টানরা। কোন কোন এলাকায় খ্রিষ্টান ব্যতীত অন্য ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। খ্রিষ্টান এনজিওগুলির আর্থিক সহযোগিতা ও লোভনীয় টোপে প্ররোচিত হয়ে গরীব উপজাতীয়রা খ্রিষ্টান হচ্ছে। তাছাড়া খ্রিষ্টান এনজিওগুলির সাহায্য পেতে হ'লে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সপ্তাহে রবিবারের দিন গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়'। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী খাগড়াছড়িতে ৭৩টি, বান্দরবানে ১১৭টি ও রাঙ্গামাটিতে ৩টি সহ মোট ১৯৪টি গীর্জার অধিকাংশ সেখানে ধর্ম প্রচার ও সমাজ সেবার নামে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণ এক কথা নয়।

দেশের অখণ্ডতা প্রশ্নবিদ্ধ : সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা সন্তু লারমাদের 'আদিবাসী' স্বীকৃতি দানের সাম্প্রতিক দাবীর ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরেছে। মহাজোট সরকারের কিছু বামধারার এমপি, বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি সেক্যুলার দৈনিক পত্রিকা এদের দাবীর পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। এদের খুঁটির জোর যে বিদেশে তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এম.পি সম্প্রতি বলেছেন, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যারা নিজেদেরকে 'উপজাতি' বলে সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি সই করেছিল, তারাই এখন হঠাৎ করে 'আদিবাসী' হবার দাবীতে আন্দোলন করছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রে এরূপ সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে জাতিসংঘ বা পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী কোন কথা বলে না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর পিছনে সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা রয়েছে কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে'। তাদের 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি দিলে তাদের সব দায়-দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। নইলে জাতিসংঘ সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। অতএব 'বুঝহ সুজন যে জানো সন্ধান'। আল্লাহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন'- আমীন![২০২]

---

২০২. ১৪তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১১।

৫৪. মাননীয় সিইসি সমীপে

আল্লাহ্র দাসত্ব ছেড়ে মানুষকে মানুষের দাসত্বে বন্দী করা এবং 'বিভক্ত কর ও শাসন কর'-এর বহু প্রাচীন অপরাজনীতির আধুনিক দার্শনিক নাম হ'ল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। বর্তমানে যা সরকারী ও বিরোধীদলীয় হানাহানিতে বিপর্যস্ত একটি অগ্নিগর্ভ ও জরাজীর্ণ সমাজের নাম। দুই বিপরীত জোটের পেশীশক্তি ও জনবলের প্রদর্শনী এবং সেইসাথে খুন-যখম ও মিথ্যা মামলায় জেলহাজত প্রভৃতি অমানবিক কর্মকাণ্ডই হ'ল প্রচলিত নির্বাচনী রাজনীতির আবশ্যিক অনুষঙ্গ। এর মূলে প্রকৃত গলদ হ'ল দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা, যা মানুষকে নেতৃত্ব আদায়ে আগ্রাসী করে তোলে। কুয়াতে পচা বিড়াল রেখে সমস্ত পানি সেচে ফেললেও যেমন গন্ধ দূর হয় না, তেমনিভাবে এই মূল গলদ দূর না করে ফ্রী ও ফেয়ার ইলেকশনের জন্য যত আইন করা হোক না কেন, কোনটাই কাজে আসবে না। ইসলাম বহু পূর্বেই এর সমাধান দিয়েছে। যেমন-

(১) দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে। সর্বাধিক সহজ, দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত মিডিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালিত হবে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে উক্ত নির্বাচন পরিচালনা করবেন। যেহেতু কোন প্রার্থী থাকবে না, সেহেতু কোনরূপ ক্যানভাস ও অন্যায় পথ তালাশের সুযোগ থাকবে না। নির্বাচিত নেতা জানতে বা বুঝতেও পারবেন না, কারা তাকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। এর ফলে তাঁর মানসিকতা থাকবে সবার প্রতি উদার ও নিরাসক্ত। ফলে দলীয় চাপ ও আবেগমুক্ত মনে তিনি পূর্ণ আল্লাহভীতির সাথে নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করলে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৫/৬ জন ইসলামী নেতার নাম তাঁদের পূর্ণ পরিচয়সহ প্রস্তাব আকারে পেশ করতে পারেন। প্রস্তাবিতদের বাইরে অন্যকেও ভোট দেয়ার সুযোগ থাকবে। এভাবে রাষ্ট্রের একজন আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। এ নির্বাচন কেবল দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মাধ্যমেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাদের নির্বাচনকেই সকলের মেনে নেওয়া উচিত। চার খলীফার নির্বাচন এভাবেই হয়েছিল। বর্তমান যুগে আমেরিকায়

ইলেক্টোরাল ভোটার ৫৭০ জনের অধিকাংশের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে থাকে। পপুলার ভোট কেউ বেশী পেলেও তা ধর্তব্য হয় না। মানসিকতা তৈরী হ'লে সেটা এদেশেও সম্ভব।

অতঃপর রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে বর্তমানের বিচার ও শাসন বিভাগের ন্যায় আইনসভাও প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হবে। এম.পি. নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধীদল বলে কিছু থাকবে না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। সর্বত্র সমাজের উত্তম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শমতে প্রশাসন চলবে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ও প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন সমূহ থাকবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ হবে সকল সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

(২) ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমীরকে (ক) আল্লাহভীরু যোগ্য পুরুষ (খ) সুস্থ মস্তিষ্ক ও দূরদর্শী (গ) নির্লোভ সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ (ঘ) ইসলামী শরী'আতে অভিজ্ঞ ও সালাফে ছালেহীনের অনুসারী (ঙ) নিরহংকার, সাহসী ও আমানতদার এবং (চ) ছালাত-ছিয়াম ও যাকাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে।

(৩) ভোটারদের ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুফারিশ করে, সে তার নেকী পায় এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুফারিশ করে সে তার অংশ পায়' *(নিসা ৪/৮৫)*। ভোট হ'ল সুফারিশ। এক্ষণে তার সুফারিশে নির্বাচিত নেতা স্বীয় নেতৃত্বকালে যত নেকীর কাজ করবেন, ভোটার তার একটা অংশ পাবে। পক্ষান্তরে পাপ করলেও ভোটার তার অংশ পাবে।

নেতাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যাকে জনগণের নেতৃত্বে বসান, অতঃপর যদি সে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে

হারাম করে দেন'।[২০৩] ওমর (রাঃ) বলেন, যদি ফোরাত নদীর কূলে রাষ্ট্রের অবহেলায় একটি বকরীও মারা যায়, আমি মনে করি ওমরকে সেজন্য ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে' *(হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৫৩)*।

(৪) নির্বাচিত নেতা সাবেক রাষ্ট্রনেতা, প্রধান বিচারপতি এবং যোগ্য আলেমদের সমন্বয়ে পাঁচজনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। অতঃপর তাদের ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ মতে সীমিত সংখ্যক সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ দিবেন এবং তার মধ্য থেকে অথবা কিছু বাইরে থেকে নিয়ে একটা ছোট মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। এভাবে রাষ্ট্রের মূল যিম্মাদার হবেন আমীর বা প্রেসিডেন্ট। অন্যেরা হবেন তাঁর পরামর্শদাতা ও সহযোগী।

ইসলামী খেলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন 'আমীর'। যিনি একই সাথে জনগণের প্রতিনিধি ও আল্লাহ্র প্রতিনিধি হবেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ এবং মজলিসে শূরা ও জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাকবেন। যা Check & Balance-এর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে কাজ করবে। আমীর আল্লাহ্র বিধানের বাইরে কোন বিধান জারী করতে পারবেন না এবং অহি-র বিধান জারী করতে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। অধঃস্তন প্রশাসনে কোনরূপ নির্বাচন হবে না। বর্তমানে ডিসি ও ইউএনও-এর ন্যায় ইউনিয়ন প্রশাসকও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সাথে একাধিক অতিরিক্ত প্রশাসক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। যারা নিয়মিত গ্রামে-গঞ্জে সফর করবেন। জনগণের কথা শুনবেন ও তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবেন।

দেশের বিচার ও প্রশাসন বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকবে এবং ইসলামী নীতির অনুসরণে কাজ করবে। একইভাবে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে আমীরকে আইনগত পরামর্শ দিবে। আমীরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণিত করলে আদালতের রায়ে এবং মজলিসে

২০৩. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২; মিশকাত হা/৩৬৮৬।

শূরার অনুমোদনক্রমে আমীর যেকোন সময় অপসারিত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারতের যোগ্য থাকা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকবেন।

এভাবে নেতৃত্ব নির্বাচনের ফল দাঁড়াবে এই যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। রাজনৈতিক দলাদলি ও সন্ত্রাস থেকে জাতি মুক্তি পাবে। একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২০৪]

৫৫. নেতৃবৃন্দের সমীপে

দেশে চলছে চরম অরাজকতা। সর্বত্র আতংক। কারু জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা নেই। এক দল অপর দলকে দায়ী করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। কিন্তু ফলাফল একটাই, মরছে মানুষ, পুড়ছে গাড়ী, চলছে গুম-খুন-অপহরণ। শিল্প কারখানায় দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে সরকারী নির্দেশ জারি হয়েছে। বিদেশী কূটনীতিক নিহত হচ্ছেন। স্বদেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বলতে গেলে শূন্য। চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতি উপমহাদেশের সব দেশের চাইতে বেশী, যা এখন ১৪ শতাংশে পৌঁছে গেছে। অর্থনীতি কার্যতঃ স্থবির। সামনে সচল হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এর মূল কারণ কি?

সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, মানুষ যখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে ও আখেরাতে জওয়াবদিহিতার কথা বিস্মৃত হবে, তখনই সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে যাবে। আর একবার শয়তানের কব্জায় চলে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হবে, যদি না আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে ‘শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। সে মানুষের রগ-রেশায় প্রবেশ করে ধোঁকা দেয়। অথবা মানুষের বেশে এসে ধোঁকা দেয়। শয়তানের লোভনীয় ফাঁদে পড়ে মানুষ বুঝতে পারে না কোন্ পথে তার মুক্তি নিহিত। আর এখানেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় একটি

---

২০৪. ১৫তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১২।

সার্বভৌম সত্তার কাছে। যাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। যার বিধান শাশ্বত সত্য ও অপরিবর্তনীয়। মানুষ যখন সেই সত্যকে আঁকড়ে ধরে, তখন সে একটি মযবুত হাতল করায়ত্ত করে, যা ভাঙবার নয়। সেই হাতল হ'ল ঈমান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যার বুনিয়াদ। যখনই মানুষ উক্ত হাতল কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে, তখনই শয়তান তাকে ছেড়ে যায়। যেমন আযান শুনে শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালিয়ে যায়।[২০৫] মুমিন যখন সিজদার আয়াত পড়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, তখন শয়তান কেঁদে উঠে বলে, হায়! বনু আদমকে সিজদার আদেশ দিলে সে সিজদা করল ও জান্নাতী হ'ল। আর আমাকে সিজদার আদেশ দিলে আমি অবাধ্যতা করলাম ও জাহান্নামী হ'লাম।[২০৬]

ছালাত অবস্থাতে শয়তানের উপস্থিতি বুঝতে পারলে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে নাঊযুবিল্লাহ বলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২০৭] ব্যবহারিক জীবনেও মানুষ যদি শয়তানকে থুক মেরে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে, তাহ'লে সমাজে হিংসা ও অরাজকতা হ্রাস পাবে। যিয়াদ বিন হুদায়েরকে একদিন ওমর ফারূক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান কোন কোন্ বস্তু ইসলামকে ধ্বংস করে? তিনি বললেন, না। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তিনটি বস্তু ইসলামকে ধ্বংস করে। (১) আলেমের পদস্খলন (২) আল্লাহ্‌র কিতাবে মুনাফিকদের বিতণ্ডা (৩) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন।[২০৮] বর্তমানে আমাদের সমাজে উক্ত তিনটি কারণ প্রকটভাবে বিরাজ করছে। ইহূদী আলেমদের মত মুসলিম আলেমরা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ইসলামের ব্যাখ্যা না দিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। দুনিয়াপূজারী কপটবিশ্বাসী লোকেরা কুরআনের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছে। পথভ্রষ্ট শাসকরা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন না করে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত বিধান

---

২০৫. বুখারী হা/৬০৮; মুসলিম হা/৩৮৯; মিশকাত হা/৬৫৫।
২০৬. মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫।
২০৭. মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭।
২০৮. দারেমী হা/২১৪; মিশকাত হা/২৬৯।

রচনা করে সে অনুযায়ী দেশ শাসন করছেন ও জনগণের উপর যুলুম চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।[২০৯] আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই কান, চোখ, হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*। ৩য় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহী দল কর্তৃক স্বগৃহে অবরুদ্ধ হন, তখন তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধারণের জন্য ছাহাবীগণ বারবার তাঁর অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যূন চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পরেও তিনি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন। যাতে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে না পড়ে *(আল-বিদায়াহ ৭/১৯০)*। শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হলেন। কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দিলেন না। অতএব দেশে শান্তি রক্ষার জন্য শাসকদের দায়িত্ব সবচাইতে বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ কাউকে জনগণের নেতৃত্বে আনেন, অতঃপর যদি সে তার দায়িত্বের প্রতি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন।[২১০] তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী হ'ল তওবাকারীগণ।[২১১]

অতএব আসুন! আমরা ধৈর্য্যশীল হই এবং আমরা যে যে পর্যায়ে আছি, নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি। আসুন, আমরা স্ব স্ব পাপের জন্য অনুতপ্ত হই ও তওবা করি। অতঃপর নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ এবং আমাদের এ প্রিয় দেশটিকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধিময় দেশে পরিণত করি। ঐ শুনুন আল্লাহ্র ওয়াদা- 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম...' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। অতএব হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের দেশকে শান্তির দেশে পরিণত কর- আমীন![২১২]

---

২০৯. বুখারী হা/২৪০৯; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।
২১০. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২; মিশকাত হা/৩৬৮৬।
২১১. তিরমিযী হা/২৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১।
২১২. ১৫তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০১২।

৫৬. গিনিপিগ

গিনিপিগ হ'ল ছোট কান বিশিষ্ট বড় ইঁদুর জাতীয় একটি প্রাণী, যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনে যবহ করে কেঁটে-ছেটে ইচ্ছামত ব্যবহার করা হয়। অত্যাচারী শাসকরা যখনই কাউকে তাদের স্বার্থের বিরোধী মনে করে, তখনই তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অত্যাচারের খড়গ চালিয়ে তাকে শেষ করে দেয় বা শেষ করে দেবার চেষ্টা করে। এই নিরীহ-নিরপরাধ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকেই বলা হয় 'গিনিপিগ'। এটি এখন আধুনিক রাজনীতির নোংরা পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। কখন কাকে যে গিনিপিগ বানানো হবে, কেউ তা ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারে না। অথচ পরে সরকারী অপপ্রচারের মাধ্যমে দেখা যায় ঐ ব্যক্তি বা দল 'জিরো থেকে হিরো'-তে পরিণত হয়েছে। (১) বিগত যুগে নমরূদ ও ফেরাঊনরা নবী ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-কে নিয়ে এবং সবশেষে মক্কার কুরায়েশ নেতারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে যে গিনিপিগ রাজনীতি করেছিল, আধুনিক যুগে তার অসংখ্য নযীর রয়েছে সভ্যতাগর্বী দেশগুলিতে। (২) মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলির উপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য গত শতাব্দীতে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের গিনিপিগ বানানো হয় ও তাদেরকে ভিটেছাড়া করে সেখানে সারা দুনিয়া থেকে ইহূদীদের এনে বসিয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সালে 'ইসরাঈল' নামক একটি ইহূদী রাষ্ট্রের পত্তন দেওয়া হয়। অতঃপর ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলার অজুহাত তৈরীর জন্য ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর (ওয়ান ইলেভেন) নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করে কথিত 'টুইন টাওয়ার ট্রাজেডী' মঞ্চায়িত করা হয়। যার ফলে আজও ইরাক ও আফগানিস্তানে রক্ত ঝরছে। সেই সাথে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম বলে শত শত মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সেইসাথে পবিত্র কুরআন পোড়ানো ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে।

(৩) আমাদের দেশের শাসকরাও কখনো বিদেশী প্রভুদের খুশী করার জন্য, কখনোবা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যকে গিনিপিগ বানিয়ে থাকেন। এজন্য হরহামেশা তাদের মিথ্যা বলতে হয় মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য। ফলে রাজনীতিকদের কোন কথাকেই লোকেরা এখন আর বিশ্বাস করে

না। ২০০২ সালের ২১শে আগষ্ট ঢাকায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর জনসভায় যে বোমা হামলা করা হয়, তাতে বর্তমান প্রেসিডেন্টের স্ত্রীসহ ২৪ জন নিহত হন ও তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত ও চিরদিনের মত পঙ্গু হন। অথচ প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্য নোয়াখালীর এক দরিদ্র মায়ের একমাত্র সন্তান জজ মিয়াকে ধরে এনে তাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করিয়ে চমৎকার একটি নাটক সাজানো হয়, যা সকলের মুখরোচক 'জজ মিয়া' নাটক নামে পরিচিত হয়েছে। (৪) একই সরকার নিজেদের লালিত জঙ্গীদের আড়াল করার জন্য ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে গিনিপিগ বানায় এবং মিথ্যা মামলা ও জেল-যুলুমের মাধ্যমে সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা বর্তমান সরকার কেউই এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি মানবতার পক্ষে সদা সোচ্চার তথাকথিত সুশীল সমাজ এই অমানবিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। বরং কথিত গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে বিভিন্ন মিডিয়া আজও এই সংগঠনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা মহান আল্লাহ্র নিকটে বিচার দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, মযলূমের দো'আ আল্লাহ ফিরান না। যালেমকে অবশ্যই দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে ইহকালে ও পরকালে। সে যতবড় শক্তিশালী হৌক না কেন।

বর্তমান সরকারের আমলে গিনিপিগ হ'ল রামু, উখিয়া ও পটিয়ার নিরপরাধ বৌদ্ধরা ও তাদের উপাসনার বিহারগুলি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। যারা এ কাজ করেছে, তারা মানবতার শত্রু, ইসলামের শত্রু এবং দেশের শত্রু। প্রকাশ্যে যারা এ কাজ যারা করেছে, তাদের ছবিসহ নাম-ধাম সবকিছু পরের দু'দিনের পত্রিকায় এসেছে। নেপথ্য নায়করা কখনো ধরা পড়বে কি-না সন্দেহ। তবে ঘটনার পরের দিনই সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিরা কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই বিরোধী দল ও ইসলামী নেতা-কর্মীদের দায়ী করে যেভাবে হম্বিতম্বি শুরু করলেন তা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। ফলে হামলাকারীরা উৎসাহিত হয়ে

পরদিন উখিয়ার বৌদ্ধ বিহারে এবং পটিয়ার বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরে হামলা করল। সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত রামু সফরে গিয়ে বিরোধী দলীয় এম.পিকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেন। যদিও তাঁর কাছ থেকে সকলে নিরপেক্ষ বক্তব্য আশা করেছিল। ফলে এটা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, এ ঘটনার কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না এবং প্রকৃত দোষীরা কখনোই শাস্তি পাবে না। দেখা গেল যে, তাঁর ঐ জনসভায় ৩০/৪০ জনের বেশী বৌদ্ধ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন না এবং মঞ্চে মাত্র একজনকে ডাকা হয়েছিল যাকে মন খুলে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধ নেতারা দুঃখ করে বলেছেন, শত শত বছর ধরে আমরা মুসলমান প্রতিবেশী ভাইদের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছি। একদিন আগেও আমাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না। হঠাৎ ফেসবুকে অপপ্রচারের দোহাই দিয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার দিবাগত রাত ১১-টার দিকে শত শত বহিরাগত ব্যক্তি ট্রাকে করে এসে আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিল ও উপাসনালয় ধ্বংস করল। ধ্বংস কার্যে ব্যবহৃত গান পাউডার, পেট্রোল জেরিকেন, আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের সিমেন্টের রক এখানে কিভাবে এল? এসব তো রামুতে পাওয়া যায় না। কক্সবাজার যেলার রামু উপযেলার হাইটুপি গ্রামের বৌদ্ধ যুবক উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক একাউন্টে 'ইনসাল্ট আল্লাহ' নামক পেজ থেকে অন্য কেউ ট্যাগ করে দেয়। যাতে আল্লাহ শব্দকে বিকৃত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, 'পবিত্র কুরআনের উপর একজন মহিলার দু'টি পা' এবং 'কা'বা শরীফে কেউ ছালাত পড়ছেন, কেউ পূজা করছেন'। স্থানীয় সরকারী দলের এক নেতা ঐ ছেলেকে এজন্য মোবাইলে কৈফিয়ত তলব করেন রাত ১০ টায়। অতঃপর ঘন্টা খানেকের মধ্যে মিছিল অতঃপর হামলা শুরু হয়। প্রশ্ন হ'ল, এই ঘটনা ঐ এলাকার কয়জন লোক জেনেছিল? কয়জনের বাড়ীতে ইন্টারনেট আছে? তাছাড়া বাবরী মসজিদ, গুজরাট ইস্যু, আসামে মুসলিম নিধন, মিয়ানমারের বৌদ্ধদের দ্বারা রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন ও বিতাড়নের টাটকা ইস্যুতেও যখন মুসলমানেরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর হামলা করেনি, তখন আজকে ফেসবুকের কয়েকটা ছবিকে ইস্যু করে মুসলমানরা হঠাৎ কেন এমন কাজ করবে? এদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারাই বা কেন তাদের উপর হামলা করে নিজেদের একমাত্র আশ্রয়স্থলকে হুমকির মুখে ঠেলে দিবে?

নিঃসন্দেহে এটি আকস্মিক উত্তেজনার ফল নয়। বরং পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন। দেশপ্রেমিকগণ তাদের ভালভাবেই চেনেন। কিন্তু এ ঘটনা যারাই ঘটাক না কেন, এর ফলে বৌদ্ধদের সাথে গিনিপিগ বনে গেছে খোদ সরকার এবং সেই সাথে পুরা দেশ। কেননা এর মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এদেশের হাযার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সোনালী ঐতিহ্য। গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সজাগ থাকলে এই নারকীয় কর্মকাণ্ড আদৌ ঘটতে পারত কি-না সন্দেহ। এজন্য তাদেরকে অবশ্যই জনগণের নিকট ও আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহী করতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট সকলে পূর্বের ন্যায় সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখবেন এবং চক্রান্তকারীদের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকবেন।

উক্ত ঘটনাকে পুঁজি করে ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের পুরানো কোরাস গেয়ে চলেছেন। ইসলামই যত নষ্টের মূল। অতএব ইসলাম হটাও। তাহ'লে দেশ অসাম্প্রদায়িক হবে এবং সর্বত্র শান্তি ফিরে আসবে। অথচ এরা বুঝেন না যে, মানবতার একমাত্র রক্ষাকবচ হ'ল 'ইসলাম'। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনে যখন ধর্ম নিষিদ্ধ ছিল, তখন সেখানে মানবতার কি করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা কি তাঁরা ভুলে গেছেন? তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম আছে বলেই এদেশে ধর্মের নামে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নেই। অথচ পাশেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হরহামেশা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে ও মুসলিম নিধন চলছে। একইভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রতিবেশী মিয়ানমারে চলছে রোহিঙ্গা বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতন। অথচ বাংলাদেশী মানবতাবাদীরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। তাহ'লে মুসলমানেরা তাদের দৃষ্টিতে কি মানুষও নয়? অমুসলিম সন্ত্রাসীরাই প্রকৃত মানুষ? পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী এনজিওগুলি কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে তাদের খ্রিষ্টান বানাচ্ছে। দেশের অন্যত্রও খ্রিষ্টানীকরণ চলছে। অথচ এর বিরুদ্ধে সরকার বা ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাহ'লে কি একথাই সত্য হয়ে যাচ্ছে না যে, এইসব বুদ্ধিজীবীরা এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রগুলির চর? যারা সর্বদা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র বানাবার চক্রান্তে লিপ্ত। উদ্দেশ্য চীনকে ঠেকানো এবং একটা বাফার স্টেট কায়েম করে পাহাড়ের তলদেশের গ্যাস ও তৈলভাণ্ডার লুট করা।

Contents

এরা সবই জানেন, কেবল জানেন না ইসলাম ও ইসলামের নবীকে । তাই তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নের কথাগুলি নিবেদন করছি ।-

(১) ইসলাম মানুষের মস্তিষ্কপ্রসুত কোন ধর্ম নয়। এটি বিশ্বমানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রেরিত একমাত্র ধর্ম। এ ধর্ম কবুল না করে মারা গেলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামী হতে হবে।[২১৩] (২) সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন বিশ্বনবী। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের তিনি একমাত্র নবী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। (৩) এ ধর্ম মানুষকে সার্বিক জীবনে কেবল আল্লাহ্র দাসত্বের আহ্বান জানায়, অন্যের দাসত্ব নয় (৪) এ ধর্ম মানুষকে দুনিয়ার এ নশ্বর জীবনের বিনিময়ে পরকালের অবিনশ্বর জীবনে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায় (৫) এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'কুরআন' সরাসরি আল্লাহ্র কালাম, যার একটি বর্ণও পরিবর্তন হয়নি এবং তা করার সাধ্য কারু নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীছ- সরাসরি তাঁর প্রেরিত রাসূলের অভ্রান্ত বাণী *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। যাতে কোন মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। (৬) এ ধর্মে অনুমোদিত জিহাদ, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ। পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যা অপরিহার্য। তা কখনোই কোন নিরপরাধ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। (৭) এ ধর্ম কখনোই অন্যের উপর যবরদস্তিকে সমর্থন করে না। কেননা সরল পথ ও ভ্রান্ত পথ দু'টিই স্পষ্ট' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

উপরের বক্তব্যগুলির বাস্তবতা দেখুন নিম্নের ঘটনাগুলিতে।- (১) চক্রান্তকারী ইহূদী বনু নাযীর গোত্রকে ৪র্থ হিজরীতে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার সময় তাদের গৃহে প্রতিপালিত আনছার সন্তানদের ফিরিয়ে নেবার জন্য তাদের মুসলিম মায়েরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জোর দাবী জানালো। এই সময় রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হুকুমই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু না। আয়াত নাযিল হ'ল, *'লা ইকরা-হা ফিদ্দীন'* ধর্মের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। অর্থাৎ এ সন্তানেরা স্বেচ্ছায় ইসলামে ফিরে আসবে। (২) এক ইহূদী বালক রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম ছিল। তার রোগশয্যায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। মৃত্যু লক্ষণ বুঝতে পেরে তিনি তাকে বললেন, তুমি বল, *লা*

২১৩. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)। বালকটি তার ইহূদী পিতার দিকে তাকালো। পিতা চুপ রইল। রাসূল (ছাঃ) পুনরায় বললেন। ছেলেটি আবার তার বাপের দিকে তাকাল। এবার পিতা বলল, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) কথা মেনে নাও'। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। বেরিয়ে আসার সময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমার মাধ্যমে ছেলেটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[২১৪]

এরূপ অসংখ্য ঘটনা রাসূল (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন ও দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনানায়কদের জীবনীতে পাওয়া যাবে। যার কোন তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। অতএব প্রকৃত মুসলমান কখনোই কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপর অন্যায়ভাবে হামলা করে না। তবে কেউ অন্যায়াচরণ করলে তার প্রতিরোধ করার অধিকার সবার আছে। বরং এটাই সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের নামে আমাদের দেশে ও বিশ্বব্যাপী যে দলীয় সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। অতএব যদি কেউ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি চান, তাহ'লে তাকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের কাছে, অন্য কোথাও নয়। আল্লাহ আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন- আমীন![২১৫]

৫৭. নির্বাচনী দ্বন্দ্ব নিরসনে আমাদের প্রস্তাব

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় ৪২ বছর আমরা কথিত গণতন্ত্রের দেশে বসবাস করছি। গণতন্ত্রের অর্থ যদি কেবল ভোটাভুটি হয়, তবে সেটা ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলেও ছিল। যার যুলুম থেকে বাঁচার জন্য বহু রক্তের ও ইয্যতের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হ'ল। পাকিস্তানী গণতন্ত্র ছেড়ে আমরা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা হাছিল করেছি। ফলাফল সকল যুগে সমান। বরং আরও অধঃপতন। সবচেয়ে বড় অধঃপতন হ'ল নৈতিকতার অধঃপতন। বৃটিশ ভারতের রাজনীতিকদের যতটুক নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ ছিল, দেশ ভাগের পরে পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে তা অনেক হ্রাস পেল। অতঃপর বাংলাদেশী নেতাদের নৈতিকতা

২১৪. বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪।
২১৫. ১৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১২।

তলানিতে গিয়ে ঠেকল। এখন রাজনীতির উদ্দেশ্য হয়েছে কেবল ক্ষমতা দখল, প্রতিপক্ষ দমন ও দু'হাতে লুটপাট ও শোষণ।

দেশের ভৌগলিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উপর ক্রমেই হুমকি বাড়ছে। সংবিধানে ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতির সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। আইন-আদালত-শিক্ষা ও প্রশাসন সর্বত্র দলীয় স্বৈরাচার স্পষ্ট। দেশের নেতৃত্ব সর্বদা দু'টি দলের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। একদলের যুলুমে অতিষ্ট হয়ে মানুষ আরেক দলকে ভোট দিচ্ছে। পরে তাদের যুলুমে অতিষ্ট হয়ে কোন পথ না পেয়ে পুনরায় পূর্বের দলটিকে ভোট দিচ্ছে। এভাবে সাধারণ মানুষ দু'দলের কাছে যিম্মী হয়ে পড়েছে। দু'দলই ভাবছে আমরাই দেশের ত্রাণকর্তা। অথচ তারা যে কেবল নেগেটিভ ভোটই পেয়ে থাকেন, সেটা তারা মানতে নারায। যুলুম-শোষণ ও নির্যাতনের দিক দিয়ে উভয় দল ও জোটের মধ্যে ঊনিশ ও বিশ-এর পার্থক্য মাত্র।

প্রশ্ন হ'ল, যুগ যুগ ধরে কি এভাবে দলীয় স্বৈরাচার চলবে? ভোটের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাওয়ার অর্থ কি এটা নয় যে, নির্বাচিত সরকার নিরপেক্ষ নয়? অতএব যদি নব্বই দিনের জন্য নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার চাওয়া হয়, তাহ'লে পাঁচ বছরের জন্য সেটা চাইতে আপত্তি কোথায়? আর এখন তো স্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারই ভাল নির্বাচিত সরকারের চাইতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশ জন উপদেষ্টা সুন্দরভাবে দেশ চালাতে সক্ষম হ'লে প্রায় সাড়ে তিনশ' দলীয় এমপি নির্বাচন করে হাতি পোষার কি দরকার? এমপিরা ভোটের সময় জনপ্রতিনিধি। ভোটের পর হয় জনবিচ্ছিন্ন ও স্বার্থসর্বস্ব। এর জন্য তারা নিজেরা যতটা না দায়ী, তার চাইতে বেশী দায়ী হ'ল বর্তমান সিস্টেম। এই সিস্টেমে ঐ এমপি জনপ্রতিনিধি নন, বরং তিনি হয়ে পড়েন দলনেতার প্রতিনিধি। ফলে তাকে দল ও দলনেতার তোষণে জীবনপাত করতে হয়। বহু কিছুর বিনিময়ে তাকে প্রথমে মনোনয়নপত্র হাছিল করতে হয়। অতঃপর ভোটে জিতলেও নেতার মর্যি বিরোধী কোন কথা বা আচরণ প্রমাণিত হ'লেই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার সংসদ সদস্যপদ বাতিল করা যায়। ফলে জাতীয় সংসদ মূলত 'জী হুযুর' সংসদে পরিণত হয় এবং সেটা সরকারী ও বিরোধী দলের দুই নেতার বন্দনা ও

পরস্পরের বিরুদ্ধে খেস্তি-খেউড়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়। লোভ অথবা ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করতে হয়। ফলে পুরা সমাজ এখন দলীয় সন্ত্রাসীতে ভরে গেছে। সম্মানী মানুষ প্রতিনিয়ত অসম্মানিত হচ্ছেন। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুম, খুন, অপহরণ। অতঃপর 'বন্দুকযুদ্ধের' নাটক সাজিয়ে হত্যা অথবা মিথ্যা মামলায় পুলিশী রিম্যাণ্ডে নিয়ে পিটিয়ে পঙ্গু অথবা হত্যা করা হচ্ছে। অতঃপর বলা হচ্ছে হার্টফেল করে মারা গেছে। এছাড়াও নিরপরাধ লোকদের মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে হাজতের নামে বছরের পর বছর কারা নির্যাতন করা হচ্ছে। হাযার হাযার পরিবার এভাবে সর্বদা নিঃস্ব ও ধ্বংস হচ্ছে। মেধা ও মননের এবং আল্লাহভীরু মানুষের কোন মূল্য গণতান্ত্রিক সমাজে নেই। বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা সমাজকে পরস্পর হানাহানিতে পূর্ণ একটি শতধাবিভক্ত কুটিল রাজনৈতিক সমাজে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন দেশের পরিণতি আরও করুণ হবে।

দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে গেলে এই অপরাজনীতি থেকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং নেতৃত্ব নির্বাচনের ইসলামী নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাই এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব হ'ল :

অনতিবিলম্বে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন। কেউ প্রার্থী হবেন না, ভোট চাইবেন না, ক্যানভাস করবেন না। জনগণকে ছেড়ে দিন। তারা স্বাধীনভাবে তাদের নেতা নির্বাচন করুক। যিনি কমপক্ষে ৫৫% ভোট পাবেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট্ট একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। যারা নিজেরা ও অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে দেশ চালাবেন। এছাড়াও নেতা দেশের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে নিজের জন্য একটা ওলামা কাউন্সিল গঠন করবেন। ইসলামী শরী'আতের অনুকূলে আইন রচিত হচ্ছে কি-না তারা সেটা যাচাই ও অনুমোদন করবেন। অতঃপর তা কার্যকর হবে। দেশে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। যাতে হিংসা-হানাহানি বন্ধ হয়ে যায় ও নাগরিকদের মধ্যে পরস্পরের মহব্বতের বন্ধন দৃঢ় হয়।

জনগণের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি যেলায় একাধিক এডিসি ও প্রতি উপযেলায় একাধিক সহকারী ইউএনও এবং ইউনিয়ন ও গ্রাম

প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিযুক্ত হবেন। যারা জনগণ ও সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। তারা ও তাদের সাথী পুলিশ বাহিনী জনগণের সেবক হবেন। আইন সবার জন্য সমান থাকবে। যেকোন সমস্যা তারা স্থানীয়ভাবে শালিসের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। এতে আদালতের উপর চাপ কমে যাবে। এভাবে সারা দেশ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে শাসিত হবে।

সরকারের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করার দরকার নেই। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সাথে সাথে সরকারের জনপ্রিয়তা জরিপ করবে। সেখানে কেবল মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য বিমোচনের হার দেখা হবে না। বরং জনগণের সত্যিকারের সুখ-শান্তির হার কত বৃদ্ধি পেল, সেটাই দেখা হবে। এই হার ক্রমাবনতিশীল হ'লে এবং তা পরপর তিনবছর চলতে থাকলে পুনরায় নির্বাচন হবে। যদি জরিপ রিপোর্ট সরকারের পক্ষে যায় এবং দেশের অবস্থা ক্রমোন্নতিশীল থাকে, তাহ'লে পুনরায় নেতা নির্বাচনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি অবনতিশীল হয় এবং জনমত নেতিবাচক হয়, তাহ'লে সরকারকে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে এক বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে। সবকিছুরই দায়িত্ব থাকবে কেবল নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন ব্যবস্থা সহজ হবে। যাতে জনগণ অতি সহজে ও চাপমুক্তভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। ভোট দেওয়ার জন্য দেশে ছুটি ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই। নিজ বাড়ীতে বা কর্মস্থলে বসে এমনকি ব্যবসা ও বিপণীকেন্দ্রে অবস্থান করেও যাতে ভোট দেয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মোটকথা নেতৃত্বের পরিবর্তন ও জনমত প্রকাশের পন্থা সহজ থাকতে হবে। তাহ'লে মিছিল-হরতাল-গাড়ীভাঙ্গা বন্ধ হয়ে যাবে। নেতার সঙ্গে জনগণের দূরত্ব দূর হবে এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। নেতাদের অহংকারী মেযাজ পাল্টে গিয়ে তারা জনগণের খাদেমে পরিণত হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন![২১৬]

[আমরা ইতিপূর্বে মাননীয় সিইসি সমীপে উপরোক্ত বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রস্তাবসমূহ প্রেরণ করেছি।- সম্পাদক]

---

২১৬. ১৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩।

৫৮. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সমূহ ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। নাস্তিক ও সেক্যুলারদের মুকাবিলা করার নামে ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ইসলামী নেতারা একে একে যেসব কৌশল নিচ্ছেন, তাতে ইসলামের কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ বেশী হচ্ছে। সেই সাথে সাধারণ মুসলমানদের দুর্ভোগ বাড়ছে ও ইসলাম সম্পর্কে বিরোধীদের অপপ্রচারের সুযোগ মিলে যাচ্ছে।

'শত্রু যে পথে হামলা করবে সে পথেই তাকে প্রতিহত করতে হবে' এই যুক্তিতে ইসলামী নেতারা বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ধোঁকা প্রচলিত গণতন্ত্রের মুকাবিলা গণতন্ত্রের মাধ্যমে করতে গেলেন। দেখা গেল, সাধারণ গণতন্ত্রীদের চাইতে তারা এক কাটা বেড়ে গেলেন তথাকথিত হেকমতের নামে। বাহ্যিক পোষাকটুকুর পার্থক্যও ঘুচে গেল। দাড়িও প্রায় হারিয়ে গেল। এমনকি ফরয ইবাদত ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ-যাকাত 'মুবাহে' পরিণত হ'ল। কারণ 'বড় ইবাদত' হুকূমত অর্থাৎ শাসনক্ষমতা দখল এখনও সম্ভব হয়নি। তিউনিসিয়া ও মিসরে আরব বসন্তের নামে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রপন্থী ইসলামী নেতারা খুশীতে বলতে লাগলেন এ শতাব্দী ইসলামের শতাব্দী। এক বছরও যায়নি মিসর ও তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থী সরকারগুলির পতন হয়েছে। ব্যালট হৌক বুলেট হৌক 'শাসনক্ষমতা দখল করা ব্যতীত ইসলাম কায়েম হবে না' দ্বীন কায়েমের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণেই দেশে দেশে ইসলামের নামে জঙ্গী তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিছু গোষ্ঠী জিহাদের নামে তরুণদের সশস্ত্র যুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। এর পিছনে শত্রুদের যেমন ইন্ধন রয়েছে, তেমনি ইসলামী নেতাদের ভুল ব্যাখ্যাও কাজ করছে। মিসর ও পাকিস্তানের প্রভাবশালী বিগত দুই ইসলামী নেতা তো তাদের সমস্ত লেখনী ও সাংগঠনিক তৎপরতা এর পিছনেই ব্যয় করেছেন। তাঁদের অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে তাদের ভুল আক্বীদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং শাসনক্ষমতা দখলের জন্য সব রকম হীন তৎপরতা চালাচ্ছে ইসলামের নামে। সিরিয়াতে তাদের অনুসারীরা প্রতিপক্ষের কলিজা বের করে চিবিয়ে খাওয়ার দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সিরিয়ায় সরকারী বাহিনীর এক সেনার কলিজা চিবিয়ে খাওয়া ঐ ব্যক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের গুলিতে সম্প্রতি নিহত হয়েছে। ইনি আল-কায়েদার শাখা আন-নুছরা ফ্রন্টের সামরিক কমাণ্ডার

খালেদ আল-হামাদ, যিনি আবু সাক্কার নামে পরিচিত। ২০১৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত এক ভিডিওতে আবু সাক্কারকে এক যোদ্ধার কলিজা চিবাতে দেখা যায় *(এএফপি, প্রথম আলো ০৭.০৪.১৬ইং ৭/১ কলাম)*। অন্যান্য দেশে গণতন্ত্রে স্বীকৃত বৈধ পন্থার নামে হরতাল, গাড়ী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, প্রতিপক্ষকে হত্যা, যখম ইত্যাদি চালানো হচ্ছে ইসলামের নামে এবং 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী' মন্ত্র শুনিয়ে। এভাবে তাদের শহীদের তালিকা প্রকাশ করছে তাদের ডায়েরীতে ও ইন্টারনেটে।

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা গণনা করা দুঃসাধ্য। বর্তমানে তো বড় বড় পীরদের একেকটি রাজনৈতিক দল। তারা মাঝে-মধ্যে যিকিরের সাথে রাজধানীতে এসে বিরাট বিরাট শোডাউন করেন ও নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে কিছু ইসলামী দাবী নিয়ে কিছু অরাজনৈতিক আলেম কঠিন রাজনৈতিক কায়দায় উত্থান করে বিরোধী দল সমূহের সমর্থনে ঢাকায় লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। পরিণতি হয়েছে মর্মান্তিক। ফলাফল হয়েছে শূন্য।[২১৭] এদেশের মানুষ ইসলামপ্রিয়, একথা সবাই জানেন। গুটিকতক 'গণজাগরণী' ও নাস্তিক্যবাদীরাও তা ভালোভাবে জানে। কিন্তু তার জন্য শোডাউন, হরতাল বা অবরোধের কি প্রয়োজন? মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম তরুণদের সশস্ত্র যুদ্ধের উস্কানি দেওয়া কি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নয়? ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজনীতি করার হিম্মত এদেশে কার আছে? কিন্তু সমস্যা হ'ল একখানে। আর তা হ'ল নেতৃত্ব আমার হ'তে হবে। ক্ষমতা দখলের এই অন্ধ নেশাই দুধে গো-চেনা ঢেলে দিচ্ছে। ফলে আদর্শের লড়াই পরিণত হয়েছে ক্ষমতার লড়াইয়ে। এই লড়াইয়ে কোন মুসলিম 'শহীদ' বা 'গাযী' হবে না। কারণ এ লড়াইয়ের লক্ষ্য হ'ল 'দুনিয়া'।

প্রশ্ন হ'ল, ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম হবে, না জনগণের হৃদয়ে দ্বীন কায়েম হওয়ার পর ক্ষমতা দখল হবে? প্রথম পন্থাটি হ'ল বর্তমানে কথিত ইসলামী রাজনীতির দাবীদারদের। আর দ্বিতীয়টি হ'ল নবীগণের তরীকা। নবীগণের তরীকায় একজন মানুষ ইসলাম কবুল করলে তার পুরো জীবনটাই

---

২১৭. ইনি হ'লেন হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিম ও হেফাজতে ইসলামের আমীর মুফতী আহমাদ শফী। ২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে এই মহা সমাবেশ ও অবরোধ কর্মসূচী ডাকা হয়। সেখানে পুলিশী হামলায় বহু মানুষ হতাহত হয়।

পরিবর্তন হয়ে যায়। সে ব্যবসা করলে সূদ-ঘুষ-মওজুদদারী থেকে বিরত হয়। পারিবারিক জীবনে সে হয় একজন আল্লাহভীরু ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ। রাজনীতি করলে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সে দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। এজন্য ইসলামী রাজনীতির নামে আলাদা পরিভাষা চালু করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হ'ল মানুষকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপটা বুঝানো। অধিকাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখে না। তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বুঝে না। ইসলামী নেতাদের কর্তব্য ছিল সবার আগে মানুষকে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। চেতনাহীন ও আদর্শহীন মুসলিমের ভোট নিয়ে ইসলামী আইন চালু করতে গেলে ঐসব ভোটাররাই একদিন বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাই দলবৃদ্ধির উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে জনগণের ঈমানবৃদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক। তবেই 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে মুসলমান তার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। আর শ্রেষ্ঠ উম্মতের দায়িত্ব হিসাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। আর মা'রূফ ও মুনকার তথা ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যার বুঝ হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। পরবর্তী যুগের কোন চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর-মাশায়েখের বুঝ অনুযায়ী নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামপন্থী উভয় দলের মুসলিম নেতাদের তাই সর্বাগ্রে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। অতঃপর তার আলোকে নিজেদের আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসতে হবে। মানুষের অন্তরকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করতে হবে। তাদের মধ্যে আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। কোন আদম সন্তান যেন জাহান্নামের আগুনে পুড়ে শাস্তি না পায়, সেই দরদ নিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে হবে। এভাবে ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম কায়েম হলে রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম হবে। তখন যদি ক্ষমতায় অন্য কেউ থাকে, তবুও তারা মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকারকে সম্মান করবে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমনকি নাজাশীর মত নিজেরাই ইসলাম কবুল করবে। ইসলামের এই শান্ত-সুনিবিড় ও সুন্দর তরীকা ছেড়ে ক্ষমতার

লড়াইয়ে জীবনপাত করা কোন ইসলামী পথ নয়। নবীগণের পথও নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের সোনালী ভবিষ্যৎ নবীগণের পথেই নিহিত। অন্যপথে নয়। আমরা মানুষকে সেপথেই আহ্বান করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২১৮]

৫৯. আমরাও আল্লাহকে বলে দেব

জনগণের বেতনভুক আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা মিলে প্রতিদিন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। আর তাকে 'ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী নিহত' বলে তারা হরহামেশা মিথ্যাচার করছে। গভীর রাত্রিতে গাড়িবহর নিয়ে আসামী ধরার নামে ঘুমন্ত গ্রামবাসীর উপর শত শত রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে মারধর, লুটপাট ও বাড়ি ভাঙ্গার মত ন্যাক্কারজনক কাজ করে বলা হচ্ছে 'আত্মরক্ষার স্বার্থে করা হয়েছে'। অতঃপর ত্রিশ/চল্লিশটা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিশ/পঞ্চাশ হাযার মানুষকে অজ্ঞাত আসামী করে চালানো হচ্ছে গ্রেফতার বাণিজ্য। ওদিকে বিরোধী দলের সন্ত্রাসীরা পাল্টা হামলা চালিয়ে নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করছে। আর প্রত্যেকে দোষ চাপাচ্ছে অন্যের উপরে। গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করা, পেট্রোলবোমা ছুঁড়ে গাড়ী ও ট্রেন পোড়ানো ও মানুষ হত্যার এক নতুন শয়তানী রীতি চালু হয়েছে। বন বিভাগের হিসাব মতে গত ১০ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫০ হাযার বৃক্ষ নিধন করা হয়েছে। যার গড় মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। মানুষ এখন সরকারী ও বিরোধী দলের হাতে যিম্মী। যাকে যে বিরোধী ভাবছে, তাকেই সে গুম, খুন, অপহরণ, মিথ্যা মামলা ইত্যাদিতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। মানুষ সত্য বলতে ভয় পাচ্ছে। না জানি কখন কার স্বার্থে ঘা লাগে। বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করা ও বিরোধী মত-পথের নাগরিকদের নির্মূল করাই যদি কারু লক্ষ্য হয়, তবে তাদের জেনে রাখা ভাল যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। সে স্বাধীনভাবে কথা বলবে, হাসবে, কাঁদবে। এতে কারু বাধ সাধার অধিকার নেই। আর আল্লাহ কখনো কোন যালেমকে বরদাশত করেন না। কেবল তওবা করার জন্য কিছুটা অবকাশ দেন মাত্র। অতএব সরকার হৌক আর বিরোধী দল হৌক, সীমা লংঘন করলে আল্লাহ্র গযব থেকে কেউ

২১৮. ১৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৩।

রেহাই পাবে না। আর আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠোর, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

(১) বৃদ্ধ পিতা সারা জীবন সরকারী দলের সমর্থক ও স্থানীয় দায়িত্বশীল। যুবক ছেলে স্রেফ একজন ঘের ব্যবসায়ী। কোন দল করে না। ঘের শুকানোর মওসুম এসে গেছে। তাই সে দিন-রাত সেখানে পাহারা দেয়। বুকভরা আশা কয়েকদিন পরেই মাছ ধরবে। মাছ বেচে সংসারে হাসি ফুটাবে। হঠাৎ যৌথবাহিনী নামক 'যম বাহিনী'-র গাড়ী। সেখান থেকে নামল কয়েকটি যমদূত। চিনিয়ে দিল একজন। অতঃপর সেখানেই গুলি করে শেষ। দেখলো সবাই প্রকাশ্য দিনমানে। রাতেই টিভিতে ও পরদিন পেপারে এল, বড় মাপের এক সন্ত্রাসী ও আইনশৃংখলা বাহিনীর উপর হামলাকারী দশ-বারোটি মামলার কুখ্যাত আসামী ক্রসফয়ারে নিহত। অথচ আসল ঘটনা হয়ত এটাই যে, সে কিছুই নয়। বরং কারু হিংসার শিকার হয়েছে।

(২) এক উপযেলা থেকে ১৩/১৪ বছর বয়সের একটা বাচ্চাকে ধরে এনে যেলা শহরের কাছাকাছি এক ফিলিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে পায়ে গুলি করে ছেলেটিকে রক্তাক্ত করে ফেলে রাখল মাটিতে। উপস্থিত লোকজন ছুটে এলে ওসি বাহাদুর অট্টহাসি হেসে বললেন, আরে অমুক দলের কর্মীকে মেরেছি। ভাবখানা এই যে, সরকারী দলের বাইরের কারু এমনকি কচি বাচ্চাদেরও এদেশে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

(৩) মাথায় টুপী দেওয়া নবম শ্রেণী পড়ুয়া তরুণ ছাত্রটি মাদরাসা থেকে পায়ে হেটে বাড়ী যাচ্ছে। মা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছেন কখন বাচ্চা এসে মা বলে ডাকবে। আর তিনি তার ক্ষুধার্ত সন্তানকে প্রাণভরা স্নেহ দিয়ে ভাত খাওয়াবেন। কয়েক কদম গেলেই বাড়ী। হঠাৎ একটা মাইক্রো এসে হাযির। মাথায় কালো টুপী পরিয়ে চোখমুখ ঢেকে বেঁধে নিয়ে গেল তাকে গাড়ীতে করে। সবাই দেখল এ দৃশ্য। কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া গেলনা ছেলেটিকে। সারারাত নির্যাতন করে ভোর রাত সাড়ে চারটার দিকে প্রকাশ্য রাজপথে ৮/১০টা গুলি করে তার কচি দেহটা ঝাঝরা করে দিল যৌথবাহিনী। ইলেকশনের আগে তার পিতাকে না পেয়ে তাদের বাড়ী গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সরকারী বুলডোজার দিয়ে। ইলেকশনে ফাঁকা মাঠে জিতে এবার তার নিরীহ-নিরপরাধ একমাত্র সন্তানকে হত্যা করল তারা। পত্রিকা ও টিভিতে যথানিয়মে

মিথ্যাচার করা হ'ল যে, বড় এক সন্ত্রাসী ক্রসফায়ারে নিহত। বৃটিশ-পরবর্তী বাংলাদেশে এরূপ অমানবিক ও নিষ্ঠুরতম বর্বরতার কোন নযীর আছে বলে আমাদের জানা নেই।

(৪) হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে এদেশে বসবাস করছে পাশাপাশি ভাই-ভাইয়ের মত। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও তাদের বাড়ী-জমি দখল করে সর্বদা ক্ষমতাসীনরা ও তাদের পেটুয়ারা। আর ঐসব জবরদখলকারীরাই তাদের উপর সুযোগ মত হামলা করে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে। তারা কেউ কেউ হুমকি দিয়ে বলে, 'থাকলে ভোট, গেলে জমি'। অথচ দোষ চাপানো হয় দ্বীনদার মুসলমানদের উপরে। যারা ইসলামের বিধান মতে সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও ইযযতকে পবিত্র আমানত মনে করে। এদিকে সরকার তারস্বরে চিৎকার দিয়ে সর্বদা জঙ্গীমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিচ্ছেন। অর্থাৎ তারা অনৈসলামিক বাংলাদেশ চান। অতএব তাদের কাছে ইসলামপন্থীদের রক্ত হালাল ও ইসলাম বিরোধীদের রক্ত হারাম। এগুলি কি জঙ্গীপনা নয়? এটাই কি সরকারের নিরপেক্ষতার নিদর্শন? জানা উচিৎ যে, এদেশ সবার। আর এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তাই ইসলামকে সাম্প্রদায়িকতা বলে বিদ্রুপ করার আগে আয়নায় একবার নিজেদের চেহারা দেখুন। পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ ভারত, মিয়ানমার ও চীনের দিকে একবার তাকান। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতনকারীদের কেউ সাম্প্রদায়িক বলে কেন নিন্দা করেন না? তাই কানাচক্ষু বকধার্মিক না হয়ে চোখ-মুখ খোলা রাখুন। আর ইসলামকে ভালভাবে জানুন। ইসলামে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সকলের অধিকার সমান। আর এদেশ কোন একটি দলের বা ব্যক্তির মৌরুসী সম্পত্তি নয়। জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের পয়সায় সরকার চলে। নিহত ব্যক্তির রাজস্ব দিয়েই হত্যাকারী সরকারী বাহিনীর বন্দুক কেনা হয় ও তাকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। অতএব সাবধান হৌন! আল্লাহকে ভয় করুন।

(৫) ক্ষমতাতন্ত্রীদের বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন তিন বছরের বাচ্চাটি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলে যাচ্ছে, 'আমি গিয়ে আল্লাহকে সব বলে দেব'। সিরিয়ার ঐ কচি মেয়েটির কাতর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলছি- হে সরকার ও বিরোধী দলীয় ক্ষমতাতন্ত্রীরা! তোমাদের সীমাহীন অত্যাচারের কথা আমরাও

আল্লাহকে বলে দেব। হে আল্লাহ! তুমি যালেমদের রুখে দাও ও নিরীহ মানুষকে রক্ষা কর! আমীন![২১৯]

৬০. উপযেলা নির্বাচন

সদ্য সমাপ্ত উপযেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে 'সীল মারার মহোৎসব'; বেলা ৮-টায় ভোটদান শুরুর আগেই ভোর ৪-টায় ভোটের বাক্স ভর্তি ইত্যাদি নানা চটকদার শিরোনাম পত্রিকা সমূহে এসেছে। বস্তুতঃ বিগত সময়ে প্রায় সকল নির্বাচনে কমবেশী এটাই হয়ে এসেছে। তবে অনেকের মতে এবার কোন কোন ভোট কেন্দ্রে দৃষ্টিকটুভাবে একটু বেশী হয়েছে। যদিও বিজয়ী সরকারী দলের পক্ষ থেকে পূর্বের সরকারগুলির ন্যায় একইভাবে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন খুবই সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জনগণ বিপুল উৎসাহে ভোট দিয়েছে। শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ভোট পড়েছে ইত্যাদি। সেজন্য সরকারী দল জনগণকে ধন্যবাদও জানিয়েছে। কিন্তু আসলে সবই শুভংকরের ফাঁকি। যা সবার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যুগ যুগ ধরে নির্বাচনের নামে এভাবেই প্রতারণা চলে আসছে। মাঝে মধ্যে অনেকের কাছ থেকে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা যায়। যেমন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খান কিছুদিন আগে বলেছেন, নির্বাচন ব্যবস্থা নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কোন কোন জাতীয় পত্রিকায় বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়েছে। যদিও কোন প্রস্তাব তারা দেননি বা দিতে পারেননি। পার্শ্ববর্তী ভারতেও এখন এই নির্বাচনী খেলা চলছে। বলা চলে যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই প্রথার মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন হচ্ছে। প্রধানতঃ দল ও প্রার্থী ভিত্তিক এই নির্বাচনী ব্যবস্থার কুফল হিসাবে সমাজিক দ্বন্দ্ব, রেষারেষি ও খুন-খারাবি কমবেশী সব দেশেই সমান। এমনকি এর ফলে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ছে। সুশাসনের নামে ও নেতৃত্বের সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে একাজে নামানো হ'লেও পরিণামে জনগণই শোষিত ও বঞ্চিত হয়। কিন্তু তখন তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

২১৯. ১৭তম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব হ'ল, উপযেলা হৌক বা জাতীয় সংসদ হৌক কোন স্তরেই কোন নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলিতে স্রেফ জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি, পারস্পরিক হানাহানি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। তাছাড়া এই সকল জনপ্রতিনিধি জনকল্যাণে তেমন কোন ভূমিকা রাখেন না। উল্টা তারা প্রশাসনকে অহেতুক বাধাগ্রস্ত করেন মাত্র। আর এটাই বাস্তব ও সঠিক কথা যে, বিচক্ষণ নির্বাচক ব্যতীত বিচক্ষণ নেতা নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্র বিধান এই যে, দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ পরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রের একজন 'আমীর' নিযুক্ত হবেন। প্রয়োজনে দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে তিনি নির্বাচিত হবেন। কেননা ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া, নেতৃত্বের লোভ করা বা আকাংখা করা এবং নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[২২০] এভাবে জ্ঞানীদের মাধ্যমে 'আমীর' নির্বাচনের পর জনগণ তাঁকে সমর্থন দিবেন ও আনুগত্যের বায়'আত বা অঙ্গীকার করবেন। কেউ আমীরকে দলীয়ভাবে চিন্তা করবে না এবং তিনিও কারু প্রতি দলীয় আবেগ বা বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। কারণ তিনি প্রার্থী হননি। কোন দলের হয়ে ভোট চাননি এবং তিনি জানতে পারেন না কারা তাঁকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সকলের প্রতি উদার হবে এবং তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন। 'আমীর' রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্য হতে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা মনোনয়ন দিবেন। প্রয়োজনে অন্যান্য যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ। এ তিনটির মধ্যে বর্তমানে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি দেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। ইসলামী শাসনে উপরোক্ত দু'টি বিভাগ ছাড়াও আইন সভার সদস্যগণও 'আমীর' কর্তৃক মনোনীত হবেন। অথচ গণতন্ত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিকে জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে অদক্ষ বা অযোগ্য ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ এখানে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং সেই সাথে সমাজে সৃষ্টি হয় অনাকাংখিত ভাবে দলাদলি, হিংসা-হানাহানি ও চরম অশান্তি। আর নির্বাচনগুলি মেয়াদ ভিত্তিক হওয়ার কারণে মানুষ সর্বদা ক্ষমতা লাভের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ আর গীবত-

---

২২০. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৪১২।

তোহমত এমনকি গুম-খুন ও অপহরণের মত নোংরা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের মেয়াদ কাটে।

অতএব নির্বাচন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হ'ল, আমরা মুসলমান। আমাদের নেতা নির্বাচিত হবেন ইসলামী বিধান মতে দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে বিচক্ষণ নির্বাচকদের মাধ্যমে। ইহূদী-নাছারা বা অন্য কারু মনগড়া বিধান মতে নেতৃত্ব নির্বাচনে আমাদের ইহকালে ও পরকালে কোন কল্যাণ নেই। আর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবেন আল্লাহ। কুরআন ও সুন্নাহ হবে দেশের আইন রচনার মানদণ্ড। যা মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। যেমন আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস সবার জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্র চাইতে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। তিনি সর্বদা আল্লাহ ও মজলিসে শূরার নিকটে এবং জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাকেন। যা Check & Balance-এর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে কাজ করে। দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। যা ইসলামী বিধান মতে বিচার করবে। 'আমীর' বা যেকোন সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করলে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এবং মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে তিনি যেকোন সময় অপসারিত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারত-এর যোগ্য থাকা পর্যন্ত বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন।

এই নির্বাচনের ফল দাঁড়াবে এই যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নেতৃত্ব নির্বাচনের অন্যায় ঝামেলা, অহেতুক অপচয় ও জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে। এর ফলে প্রশাসন ও জনগণ একাগ্রচিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে। সর্বোপরি আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার কারণে দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২২১]

---

২২১. ১৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০১৪।

আন্তর্জাতিক

৬১. গাযায় লুণ্ঠিত মানবতা : বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হও

ফিলিস্তীনের গাযা ভূখণ্ডে তিন সপ্তাহব্যাপী মুসলিম নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর সম্প্রতি আগ্রাসী ইসরাঈল সেখানে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। প্রায় দেড় সহস্রাধিক নারী-পুরুষ নিহত হয়েছে এবং আহত ও পঙ্গু হয়েছে পাঁচ সহস্রাধিক। নিহতদের এক তৃতীয়াংশই নিষ্পাপ শিশু। সমস্ত গাযা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। যারা এখনো বেঁচে আছে, তারা ইসরাঈলের নিক্ষিপ্ত ফসফরাস গ্যাসে ও অন্যান্য কারণে জটিল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল বিধ্বস্ত শহর পরিদর্শন শেষে গাযা পুনর্গঠনে অন্যূন দু'শো কোটি ডলার প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধনকুবেররা হয়ত ডলার দিবেন, কিন্তু যে জীবনগুলি হারিয়ে গেছে, তা কি কেউ ফেরৎ দিতে পারবেন? প্রায় হাযার বছর পূর্বে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা যখন ফিলিস্তীনে আগ্রাসন চালিয়েছিল, সে সময় তারা মসজিদুল আক্বছায় আশ্রয় গ্রহণকারী সত্তুর হাযারের অধিক মুসলমানকে এক সপ্তাহের মধ্যে হত্যা করেছিল। আজও সেই খ্রিষ্টান আমেরিকার সহায়তায় ইহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের নেতারা নির্বিবাদে মুসলিম হত্যা করে চলেছে। যার বিরুদ্ধে এখন খোদ ইহূদী জনগণ ফুঁসে উঠেছে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরী সনে ফিলিস্তীন ইসলামী খেলাফতভুক্ত হয়। তার পূর্ব থেকে এ যাবত ফিলিস্তীন সর্বদা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা। তুরস্কের ওছমানীয় খেলাফতের অধীনে দীর্ঘ প্রায় চারশো বছর ফিলিস্তীন এক প্রকার স্বাধীন রাষ্ট্রই ছিল। মুসলিম-ইহূদী সবাই সেখানে মিলেমিশে বসবাস করত। কিন্তু ১ম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) পর ইরাক ও ফিলিস্তীন যখন অন্যতম বিজয়ী পক্ষ ইংরেজদের দখলে চলে যায়, তখন থেকেই ফিলিস্তীনে ইহূদী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা হ'তে থাকে। যা প্রকাশ্যে রূপ নেয় ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেন কর্তৃক বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলফোর দুনিয়ার সকল ইহূদীর জন্য এখানে

একটি ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৮ সালে।

ফিলিস্তীনের লোকসংখ্যার শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল আরব এবং বাকী মাত্র ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহূদী। অতঃপর শুরু হ'ল মুসলিম বিতাড়ন ও নির্যাতনের পালা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীদের হাতে নির্যাতিত ও বিতাড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীগণ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র সমূহে আশ্রয় শিবিরের বাসিন্দা হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত। বহিরাগত ইহূদীরা এসে ফিলিস্তীনীদের মাতৃভূমি দখল করে নিল। যারা সেখানে রয়ে গেছেন মাটি কামড়ে, তাদের উপরে চলছে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের অবৈধ সৃষ্টি ইসরাঈলের বোমা হামলা ও রক্তের হোলি খেলা। হামাস-এর অপরাধ তারা ইসরাঈলের অভ্যন্তরে রকেট হামলা করে। হ্যাঁ, বাঁচার জন্য তাদের এতটুকুরও অধিকার নেই। অতএব তাদের দমনের জন্য চালানো হয়েছে ট্যাংক ও বিমান হামলা। তাতে তিন সপ্তাহে ইসরাঈলে নিহতের সংখ্যা তের। অথচ ফিলিস্তীনে নিহত হয়েছে দেড় সহস্রাধিক। বোমা হামলার সাথে চালানো হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত ফসফরাস গ্যাসের হামলা। এ গ্যাস বোমা যেখানে পড়ে সেখানে আগুন ধরে যায় এবং তার আশপাশের সব মানুষ পুড়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্য মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। টিভি পর্দায় ও পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিরপরাধ নারী, বৃদ্ধ ও ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুদের সারিবদ্ধ লাশ প্রতিদিন দেখেছে দুনিয়ার মানুষ। তা দেখে কেঁদেছে মানবতা, কেঁদেছে বিবেক। কিন্তু কাঁদেনি তারা, যাদের হাতে আল্লাহ ক্ষমতা দান করেছেন। কাঁদেনি বুশ, কাঁদেনি ওবামা, কাঁদেনি এহুদ ওলমার্ট। কাঁদেনি মুসলিম বিশ্বের কাপুরুষ রাষ্ট্রনেতাদের বুক। কিন্তু সবকিছু দেখেছেন একজন, যিনি আছেন সবার অলক্ষ্যে সবার উপরে। নিশ্চয়ই তাঁর অমোঘ শাস্তি নেমে আসবে ঐ যালেমদের উপর। যারা শক্তির অপব্যবহার করছে ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে। কারণ যারা মরছে ওরা মুসলমান। ওরা বেঁচে থাকলে যে আল্লাহ্র নাম নিবে। অতএব ওদের খতম করাই কর্তব্য।

তাইতো দেখছি জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) যখন ইসরাঈলের গাযা অভিযানের পক্ষে সাফাই গান, তখন তার বিরোধী দলের ভাবী প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন

ওবামা চুপটি মেরে থাকেন। এর কারণ বুশের রিপাবলিকান ও ওবামার ডেমোক্রেটিক উভয় দলই ইহূদী লবীর কাছে যিম্মী। তাই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতেও সাহস করেননি বুশের প্রতিনিধি। এখন বরাক ওবামা কি পারবেন মযলূম মানবতার পক্ষে সাহসী ও উদার ভূমিকা রাখতে? ধন্যবাদ তুর্কি প্রধানমন্ত্রী রিসেপ এরদোগানকে, যিনি সুইজারল্যাণ্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনে রণোন্মাদ ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট শেমন পেরেজের মুখের উপর বলেছেন, 'আপনি একজন খুনী। আপনার হাত ফিলিস্তীনীদের রক্তে রঞ্জিত'। অতঃপর গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ভড়ংধারী বিশ্বনেতাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সম্মেলন ত্যাগ করে সোজা নিজ দেশে চলে এসেছেন। তাঁর এ সাহসী প্রতিবাদ সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরে তাই হাযারো মানুষ তাকে বরণ করে নিয়েছে বীরোচিত সম্বর্ধনা দিয়ে। মযলূম মানবতার পক্ষে কথা বলার জন্য আমরাও তাকে অভিনন্দন জানাই। আমরা চাই মুসলমানের ঘুমন্ত ঈমান জেগে উঠুক! লুণ্ঠিত মানবতার পক্ষে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হউক! আল্লাহ তুমি সাহায্য কর- আমীন![২২২]

৬২. টিপাইমুখ বাঁধ : আরেকটি ফারাক্কা

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে খ্যাত যে ভারতের ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র পীড়িত। যার মধ্যে প্রায় ১১ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, সেই ভারতের মানুষের একটা অংশ জোঁকের মত গরীবের রক্ত শোষণ করে পুঁজিবাদী আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডকে ডিঙিয়ে এখন বিশ্বের সেরা ধনী হিসাবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে। সেই সাথে টাকার চাকতি আর মিথ্যা আশ্বাসের জালে আটকিয়ে গরীবের ভোট নিয়ে ঐসব পুঁজিবাদী শোষকরা নিজেরা বা নিজেদের অনুগতদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে নিজ রাষ্ট্রের বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের যেখানেই তাদের পুঁজির স্বার্থ দেখতে পায় সেখানেই তারা হামলে পড়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজির পাহাড় গড়ার জন্য। আর সেজন্য তারা তৈরী করে

২২২. ১২তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৯।

নানাবিধ প্রতারণার কৌশল। ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশী হামলাকারীদের লোভনীয় ভূমি হিসাবে পরিচিত। আর সবসময় তাদের সহযোগিতায় ছিল দেশীয় দালাল শ্রেণী। যারা বিদেশীদের দেওয়া জমিদার, নওয়াব, স্যার, নাইট ইত্যাদি লকবের তকমা এঁটে নিজ দেশীয় লোকদের উপর যুলুম করত ও তাদের রক্ত শোষণ করত। ’৪৭-এর স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী শোষকরা শাসনক্ষমতা ছেড়ে চলে গেলে দেশীয় শোষকরা ক্ষমতায় বসে দু’হাতে লুটেপুটে খেতে শুরু করে। বিদেশীরা যে শাসননীতি এদেশে রেখে যায়, তাতে শোষকদের ক্ষমতা লাভের সুন্দর সুযোগ থাকায় দেশীয় দালাল শাসকরা তার কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। ফলে স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ৬১ বছর যাবত ভারত বর্ষের কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি বৃটিশের রেখে যাওয়া শোষণমূলক রাজনীতি ও অর্থনীতির পায়রবী করে চলেছে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে। আর সেকারণেই ‘গরীবী হটাও’ শ্লোগান দিয়ে ‘গরীবী বাড়াও’-এর প্রতিযোগিতা চলছে দেশীয় প্রভুদের হাতেই।

পুঁজিবাদীদের নযর সর্বদা ভারতবর্ষের সর্বত্র সার্চ লাইটের আলোর মত ঘুরতে থাকে। শকুন যেমন আকাশে উঠেও মাটিতে নযর থাকে কোথায় একটা মড়া পাওয়া যায়, এইসব শোষকরা সর্বদা তাকিয়ে থাকে কোথায় গিয়ে শোষণের সুযোগ পাওয়া যায়। ফেরাঊন-হামান ও কারূণের গোষ্ঠী এইসব শোষকদের নযর থাকে সর্বদা ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার প্রভৃতি এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহের দিকে। চাই তা মাটির উপরে হৌক বা পানির নীচে ভূতলে হৌক।

প্রতিবেশী শকুনীরা এবার বিদেশী আন্তর্জাতিক শকুনদের সাথে মিলে উত্তর-পূর্ব ভারতের হিমালয় ও বরাক অববাহিকা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুবিধা ব্যবহার করে পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০ হাযার মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল এক মুনাফা বাণিজ্যের আয়োজন করে চলেছে। যা ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশকে চূড়ান্ত ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেবে।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারত থেকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা প্রধান তিনটি নদী গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গা চাপাই নবাবগঞ্জে পদ্মা হয়ে

বাংলাদেশে ঢুকেছে। যার বিপরীতে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় ভারত বাঁধ চালু করেছে ১৯৭৫ সালের ২১শে এপ্রিলে। এর ফলে রাজশাহী-খুলনা সহ উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যেলাগুলি মরুভূমিতে পরিণত হবে। সুন্দরবন শেষ হয়ে যাবে। **দ্বিতীয়ঃ** ব্রহ্মপুত্র নদী। যা কুড়িগ্রাম দিয়ে ঢুকে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ইত্যাদি নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর বিপরীতে ভারত ৩০টি সংযোগ খাল খনন করে ৩৭টি শাখা নদী সহ অন্যান্য নদীর মধ্যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প স্থাপন করে সব পানি উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি উজানের রাজ্যগুলিতে টেনে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গ মরুভূমি হ'তে চলেছে। এই প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হবে ২০১৬ সালে। **তৃতীয়ঃ** মেঘনা নদী। যা বরাক নদী নামে মণিপুর রাজ্য থেকে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে সুরমা-কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অতঃপর মেঘনা নাম নিয়ে চাঁদপুরের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ছোট-বড় অন্যূন ২৩০টি নদীর প্রায় সবগুলি এ তিনটির সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত। এগুলির মধ্যে উপরোক্ত বড় তিনটি সহ মোট ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং আরও ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। এভাবে সর্বমোট ৫৭টি নদী হ'ল আন্তর্জাতিক নদী। যার মধ্যে কেবল গঙ্গা নদীর ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা চুক্তি আছে কাগজে-কলমে নামকাওয়াস্তে। বাকীগুলির ব্যাপারে ভারত বা মায়ানমার কারু সাথে বাংলাদেশের কোন চুক্তি নেই। বাংলাদেশ ভাটিতে হওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে ভারত। সবক'টির উজানে সে বাঁধ দিয়েছে কথিত পানি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে। যেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হ'ল, গঙ্গায় ফারাক্কা (পশ্চিমবঙ্গ), তিস্তায় গজলডোবা (জলপাইগুড়ি), ব্রহ্মপুত্রে আন্ত ঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বরাকে টিপাইমুখ বাঁধ (মণিপুর)। বাঁধ সন্নিহিত ভারতীয় এলাকা সমূহ মজে উঠেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় এলাকা ও বাংলাদেশ এখন ডুবছে ও শুকাচ্ছে ও নাকানি-চুবানি খাচ্ছে।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নদীতে পানির স্রোত ও চাপ কমে যাওয়ায় স্থলভাগে সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশ ঘটছে। ফলে মিঠাপানির উৎস শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচ থেকে পানির সাথে আর্সেনিক বিষ উপরে উঠে আসছে। ফসল ও মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হ'তে চলেছে। বিশ্ব

ঐতিহ্য সুন্দরবনের প্রাণবৈচিত্র শেষ হ'তে চলেছে। ভারতের এই প্রতিবেশগত আগ্রাসন অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে তেমনি মণিপুর রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিজ দেশের ক্ষতি করেও তারা এ আত্মঘাতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জনগণের কল্যাণের নামে গুটিকয়েক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মুনাফাখোর পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর কপট স্বার্থ হাছিলের জন্য। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি পুঁজিবাদের বিশ্বমোড়লরা এসব প্রকল্পে অর্থ যোগান দিচ্ছে। যেমন ইতিপূর্বে ফারাক্কা বাঁধের সময় তারা দিয়েছিল। এর মধ্যে উভয় দেশের ভোটদাতা কোটি কোটি জনগণের কোন মঙ্গল নেই। আছে কেবলি ক্ষতি, বঞ্চনা আর সাক্ষাৎ ধ্বংসের যন্ত্রণা। এরপরেও নির্যাতিত মানবতা জেগে উঠবে কী?

সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটি দু'দেশের জন্য অপেক্ষা করছে, সেটি হ'ল ধ্বংসকারী ভূমিকম্প। যেসব বাঁধ তারা দিয়েছেন, তার ফলে নদীর স্রোত বাধাগ্রস্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে যে বিশাল বিশাল জলাধার সৃষ্টি হয়েছে, তার চাপে ভূতলের শিলাস্তরের উপর যে অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি হয়, তাতে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেড়ে যায়। জলাধার প্রভাবিত ভূমিকম্পের বিষয়টি প্রথম নযরে আসে ১৯৩২ সালে আলজেরিয়ার কুয়েড বাড্ডা বাঁধের ক্ষেত্রে। আর এযাবতকালে বিশ্বের সবচেয়ে তীব্র মাত্রার জলাধার প্রভাবিত ভূমিকম্প হয়েছে খোদ ভারতের মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধের কারণে ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে। ৬.৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি তার কেন্দ্র থেকে ২৩০ কিঃমিঃ দূরেও তীব্র আঘাত হেনেছিল।

এসব জেনেশুনেও ভারত তার নিজ রাজ্য মণিপুরের যে স্থানে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে, সেটি হ'ল পৃথিবীর ৬টি ভয়ংকর ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে একটি। বাকী পাঁচটি হ'ল আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো, জাপান, তুরস্ক ও তাইওয়ান। টিপাইমুখ বাঁধের ১০০ থেকে ২০০ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে ১০০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে ৫ মাত্রা বা তার

বেশী মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে ১০০টিরও বেশী এবং ৭-এর বেশী মাত্রার হয়েছে দু'টি। তার মধ্যে একটিতো হয়েছে গত ১৯৫৭ সালে টিপাইমুখ থেকে মাত্র ৭৫ কিঃমিঃ দূরে। ভারত ও মায়ানমারের টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের জন্য এলাকাটি দুনিয়ার অন্যতম ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। কাজেই এরকম একটি এলাকায় ১৬৮.২ মিটার উচ্চতার একটি জলাধার নির্মাণ করা মানে বাংলাদেশ ও ভারতের পুরা এলাকার জন্য সেধে ঘন ঘন ভূমিকম্প ডেকে আনা। আর তাতে উভয় দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতার মুখে ভারত বাঁধ নির্মাণ করতে বা চালু করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশী শাসকদের নতজানু নীতির কারণে তারা একে একে বাঁধ দিয়েই চলেছে। টিপাইমুখ এখন সর্বশেষ বাঁধ, যার ভিত্তি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ২০০৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এবং যা শেষ হবে ২০১১ সালে। এখন উভয় দেশের সচেতন জনগণের ঐক্যবদ্ধ চেতনাই পারে দেশী ও বিদেশী শোষকদের পরিকল্পিত শোষণ ও ধ্বংসের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে। মনে রাখতে হবে যে, নদী আল্লাহ্র দান। এটা কোন রাজা-মহারাজা বা সরকার প্রধানের দান-অনুদান নয়। আল্লাহ্র দেওয়া সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, বায়ুর প্রবাহ ভোগের অধিকার যেমন সবার জন্য সমান, আল্লাহ্র সৃষ্ট নদীর পানি ভোগের অধিকার তেমনি সকলের জন্য সমান। তাই যেকোন মূল্যে আন্তর্জাতিক নদীগুলির স্রোত অব্যাহত রাখতে হবে। দেহের শিরা-উপশিরায় ব্লক হ'লে যেমন রক্তের স্রোত বন্ধ হয় ও তাতে চাপ সৃষ্টি হয়ে মানুষ মারা যায়, নদীতে বাঁধ দিলে তেমনি পানির স্রোত বন্ধ হয়ে পানির উত্থান-পতনে দেশ ধ্বংস হয়। তাই রাষ্ট্রের সীমানা দিয়ে পানির সীমানা বেঁধে দেওয়া যাবে না। এখানে-ওখানে বাঁধ দিয়ে নদী-মহানদীগুলিকে হ্রদ ও পুকুরে পরিণত করা যাবে না। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে এই অন্যায় ও অমানবিক ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেকের শাণিত উত্থান চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২২৩]

২২৩. ১২তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৯।

৬৩. চলে গেলেন আফ্রিকার সিংহ

সাদ্দাম, বিন লাদেন অতঃপর গাদ্দাফীকে হত্যা করল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। ওবামা হুমকি দিলেন পূর্বের ন্যায় এই বলে যে, আবারও প্রমাণিত হ'ল, 'আমেরিকা যা চায় তাই করে'। শান্তিতে নোবেলজয়ী ব্যক্তির এই দম্ভোক্তি আল্লাহ শুনেছেন ও দেখেছেন। নিশ্চয়ই আসমানী ফায়ছালা নেমে আসবে এ যুগের ফেরাঊনদের বিরুদ্ধে। তবে চলুন আমরা অতীত নিয়ে কিছু কথা বলি।-

(১) ১৯৬৭ সালের জুনে ইংল্যাণ্ডে সামরিক প্রশিক্ষণরত তরুণ ক্যাডেট মু'আম্মার আল-ক্বাযযাফী (গাদ্দাফী) তার তিনজন সাথীকে নিয়ে লণ্ডনের লেসাম্বাডর রেস্টুরেন্টের জুয়ার আড্ডায় দেখতে পান তার দেশের বাদশাহ ইদ্রীসের তৈল উপদেষ্টাকে এক ঘণ্টার মধ্যে দেড় লাখ পাউণ্ড হারতে। আর তাকে অর্থের যোগান দিচ্ছে পাশে বসা গ্রীক জাহায কোম্পানীর এক মালিক। যিনি লিবিয়া থেকে তৈল নিয়ে তার জাহাযে করে ইউরোপে পৌঁছে দিয়ে কোটি কোটি পাউণ্ড শুষে নেন (২) ১৯৬৯ সালে তার নিজ জন্মস্থান সিরত বন্দর থেকে পাইপ লাইন বসিয়ে তৈল পরিবহনের শুরুতে বিদেশী অক্সিডেন্টাল কোম্পানীর আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বয়োবৃদ্ধ বাদশাহকে গার্ড অব অনার দেওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি দেখতে পান দেশের মন্ত্রী ও সরকারী লোকদের চরম বিলাসিতা ও বিদেশী তোয়াজের মহড়া। অথচ তখন ত্রিপোলীর রাস্তায় চলত ছিন্ন পোষাক পরিহিত নগ্নপদ হাযার হাযার মানুষ। যখন ছিল না কোন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা, ছিল না যথেষ্টসংখ্যক হাসপাতাল। অথচ মন্ত্রীরা ঘন ঘন বিদেশে গিয়ে জুয়ার আসর মাত করত, আর দেশের টাকা লুট করে সুইস ব্যাংকে জমা করত (৩) ১লা সেপ্টেম্বর'৬৯ বাদশাহ ইদ্রীস তখন রাষ্ট্রীয় সফরে তুরস্কে। সুযোগ নিলেন গাদ্দাফী। কয়েকজন তরুণ সৈনিক বন্ধু মিলে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেন। তখন তার বয়স মাত্র ২৭। ক্ষমতায় বসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আটক করলেন বাদশাহর সেই জুয়াড়ী তৈল উপদেষ্টাকে এবং অন্যান্য লুটেরা মন্ত্রী ও আমলাকে। (৪) কয়েকদিন পরে রাতের বেলায় ছদ্মবেশে

ঢুকলেন রাজধানী ত্রিপোলীর এক নামকরা নৈশ ক্লাবে। মদে চুর নর্তকী ও তাদের ভোগকারীদের মাঝে দঁড়িয়ে হঠাৎ ছদ্মবেশ ফেলে বাঁশিতে ফুঁক দিলেন গাদ্দাফী। সাথে সাথে অপেক্ষারত সৈনিকেরা এসে দেড়শ' নারী-পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে গেল। ঐদিনের পর থেকে রাজধানীর সকল মদ্যশালা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল যা গত ৪২ বছরে আর কখনো খোলেনি (৫) কয়দিন পরে ছদ্মবেশে গেলেন এক হাসপাতালে। কোন ডাক্তার নেই। তার বারবার কাকুতি-মিনতিতে দয়াপরবশ হয়ে অবশেষে গল্পরত জনৈক নার্স বলল, তুমি কাল এসো'। ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্র হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, আমি কালকে যখন আসব, তখন তোমরা কেউ আর এখানে থাকবে না, থাকবে জেলে'।

লিবীয় বিপ্লবের এই তরুণ ব্যাঘ্রের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কথা বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। মযলূম মানবতা তাকে ত্রাণকর্তা হিসাবে বরণ করে নিল। অফিস-আদালত ঘুষমুক্ত হ'ল, দেশ থেকে মদ দূর হ'ল, দুর্নীতি উঠে গেল। এবারে নযর দিলেন বিদেশী আমেরিকান ও বৃটিশদের দিকে। প্রথমে তিনি আমেরিকার 'হুইলাস' বিমান ঘাঁটি গুটিয়ে নেবার নির্দেশ জারি করলেন। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল সারা আরব জাহান। কিন্তু না। সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হ'ল। এরপর বৃটিশদের পালা। নির্দেশ পেয়ে তারাও বেনগাজীর সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে গেল। এবারে পশ্চিমা প্রভাব দূরীকরণের দিকে মন দিলেন। সিনেমা-টিভিতে নগ্ন ছবি প্রদর্শন ও রাস্তায় নগ্ন মেয়েদের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। লিবিয়াকে তার নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলার দৃঢ় পদক্ষেপ শুরু হয়ে গেল সর্বত্র। মনোযোগ দিলেন দেশের অর্থনীতির দিকে। আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত ভূগর্ভের তৈলভাণ্ডার যা এতদিন বিদেশীরা নামমাত্র মূল্যে লুট করছিল, তিনি তার মূল্য বাড়িয়ে দিলেন। ফলে দ্রুত লিবিয়ার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। ফলে গাদ্দাফী শাসনের প্রথমার্ধেই লিবিয়া পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হ'ল।

ফলাফল :

(১) ইতিপূর্বে লিবিয়ার সাধারণ মানুষের কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। তারা তাঁবুতে যাযাবর জীবন যাপন করত। গাদ্দাফী নিজেও সেভাবে থাকতেন। তেলের টাকা হাতে পেয়ে এবার তিনি লিবীয়দের জন্য গৃহনির্মাণ শুরু

করলেন। একসময় তার পিতা তাকে নিজের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করতে বললে তিনি বলেন, একজন লিবীয়র গৃহনির্মাণ বাকী থাকতে আপনার ছেলে নিজের জন্য কোন বাড়ী বানাবে না (২) দেশে শিক্ষিতের হার ২৫ শতাংশ থেকে তিনি ৮৩ শতাংশে উন্নীত করেন (৩) তৈল ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় শহরগুলির বাইরে লিবীয়রা যেখানে বিদ্যুতের দেখা পেত না, সেখানে সর্বত্র ফ্রি বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং লিবীয় নাগরিকদের ভাষ্যমতে গত ৪২ বছরে কখনো বিদ্যুৎ চলে গেছে বলে তাদের জানা নেই (৪) তৈল বিক্রির টাকা ব্যাংকে জমা হ'লেই তার একটা অংশ প্রত্যেক লিবীয় নাগরিকের ব্যাংক একাউন্টে চলে যেত (৫) বিবাহ উপলক্ষে নবদম্পতির জন্য এককালীন ৫০ হাযার ডলার এবং সন্তান হ'লে ৫ হাযার ডলার পাঠিয়ে দিতেন (৬) চিকিৎসা বা পড়াশুনার জন্য বিদেশ গেলে মাসিক ২৩০০ ডলার (৭) কোন কারণে কেউ বেকার হয়ে পড়লে তার একাউন্টে চলে যেত নির্দিষ্ট হারে বেকার ভাতা (৮) কেউ ব্যবসা করতে চাইলে বিনা সূদে ব্যাংক ঋণ দেওয়া হত এবং (৯) গাড়ি কিনতে চাইলে গাড়ির মূল্যের অর্ধেক সরকার বহন করত (১০) এতদ্ব্যতীত লিবীয় নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান বাবদ যাবতীয় খরচ সরকার বহন করত (১১) কৃষকদের জমি, বীজ, খামারবাড়ী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিনামূল্যে দেওয়া হ'ত (১২) ১৯৮৩ হ'তে ৯০ সালের মধ্যে কোনরূপ বিদেশী ঋণ ছাড়াই ২৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত সারা লিবিয়া ব্যাপী ২৮৪০ কি.মি. দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ পানির পাইপ লাইন ছিল বিশ্বের ৮ম আশ্চর্য। যা আজও লিবিয়াবাসীকে দৈনিক ৬৫ হাযার ঘন লিটার বিশুদ্ধ পানি নিয়মিতভাবে পৌঁছে দিচ্ছে। যাকে বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম মনুষ্য নির্মিত ভূগর্ভ নদী। এভাবে লিবীয় নাগরিকরা গাদ্দাফীযুগে বেদুঈন জীবন থেকে উত্তরণ করে রাজার হালে বাস করত (১৩) তার সময়ে তার দেশের কোন বৈদেশিক ঋণ তো ছিলই না। বরং তাঁর মৃত্যুকালে লিবিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৫০ বিলিয়ন ডলার।

অনেকেই তাকে স্বৈরাচারী বলে সস্তা গালি দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বুঝেন না যে, যিনি শূন্য থেকে দেশটিকে তুঙ্গে এনেছেন, তিনি কিভাবে তার জীবদ্দশায় তাকে আবার শূন্যে নিক্ষেপ করবেন? লিবীয় বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য এখানে এই যে, (১) বিপ্লবের সাথী অনেককে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ করার পর তাদের

দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা তাকে দারুণভাবে ব্যথিত করে (২) পরবর্তী যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতা তিনি কাউকে পাননি (৩) কঠোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ বল্গাহীন চরিত্রের কিছু লোককে তার বিরোধী করে তোলে (৪) অবাধ লুটপাটে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকা তার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-কে দিয়ে সর্বদা একদল লোককে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে তৈরী করতে থাকে। সম্প্রতি উইকিলিক্সের ফাঁস করা তথ্য অনুযায়ী গাদ্দাফী হত্যার পুরা ষড়যন্ত্র সিআইএ-র পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে। যা তারা বহুদিন থেকে করে আসছিল। গাদ্দাফী সেটা বুঝতে পেরেই রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়তে চাননি। ২০০৯ সালে গাদ্দাফী জাতিসংঘে ভাষণ দেবার সময়সীমা ১৫ মিনিটের স্থলে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। এই সময় তিনি জাতিসংঘ সনদ ছিঁড়ে ফেলেন ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে ‘সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনামলে অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের অভিযোগে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে ৭ লাখ ৭০ হাযার কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। পাশ্চাত্যের লুটেরা শক্তির বিরুদ্ধে তার এই আপোষহীন দৃঢ়তাই তার জন্য কাল হয়। শুরু থেকেই আমেরিকা তাকে হত্যার চেষ্টা চালাচ্ছিল। ১৯৮৬ সালে ত্রিপোলীতে তার বাড়ীতে বিমান হামলা চালানো হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর শিশু কন্যা নিহত হয়। অতঃপর গত আগষ্টে তার বাড়ীর উপর কয়েকবার বিমান হামলা করা হয়, যাতে তাঁর পরিবারের অনেকেই নিহত হন। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদ্রোহীদের হাতে জীবন দিতে হয়।

নিহত হওয়ার কিছুদিন আগে তিনি বলেন, আমি দেশ ছেড়ে যাব না। ইহূদী-খ্রিষ্টান হায়েনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে দেশের মাটিতেই জীবন দেব। আল্লাহ তাঁর এই প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে নিজ জন্মস্থানেই নিজ পুত্র ও সহকর্মীদের সাথে বিদেশী হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মানুষ হিসাবে তাঁর অনেক ভুল ছিল। আল্লাহ তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন ও তাঁকে জান্নাত নছীব করুন। আমীন![২২৪]

২২৪. ১৫তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১১।

৬৪. রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কাম্য

পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজ্যের বাঙ্গালী মুসলিম ভাই-বোনেরা আবারও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মিয়ানমারের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাখাইন মগ দস্যুরা এবং নাসাকা পুলিশ বাহিনী সম্মিলিতভাবে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে গত ৮ই জুন শুক্রবার থেকে। যুলুম ও অত্যাচারের এমন কোন দিক নেই, যা এই নরপশুরা চালিয়ে যাচ্ছে না নিরীহ মযলূম মুসলমানদের উপরে। ফলে ১৯৪২, ১৯৭৮ ও ১৯৯২-য়ের মত ২০১২-তে এসে তারা আবারও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হ'ল। বিগত দিনেও তারা প্রতিবেশী বাংলাদেশ-এর টেকনাফ অঞ্চলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে এসেছে। এবারও স্বাভাবিকভাবে তারা এদেশমুখী হয়েছে। সর্বস্বহারা মানুষগুলো যখন বাঁচার আশায় নৌকায় ভেসে পরিবার নিয়ে বাংলাদেশী দ্বীপগুলোর দিকে ছুটছে, তখন বর্বর বর্মী সেনাবাহিনী তাদেরকে নৌকাসহ ডুবিয়ে মারছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আধা সামরিক বাহিনী বিজিবি তাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পুনরায় বধ্যভূমি আরাকানের দিকে। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মানুষগুলি এভাবেই সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে অথবা ডুবে মরছে। সভ্য সমাজে এদৃশ্য কল্পনাতীত। বিগত দিনে বাংলাদেশ কখনো তাদের তাড়িয়ে দেয়নি। বরং আশ্রয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে মানবিক কারণে। কিন্তু এবার এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল। তাই বলতে হয়, অসহায় ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানোই প্রথম কাজ, না তাকে নিয়ে রাজনীতি করাই প্রথম কাজ? পৃথিবীর সকল দেশ প্রতিবেশী দেশের নির্যাতিত আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। আমাদের জনগণও বিগত দিনে ভারতে এবং বর্তমান সময়ে ইরাক, লিবিয়া ও অন্যান্য হাঙ্গামাপূর্ণ দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ আজ আমরা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিয়ে যে অমানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, তাতে আমাদের বিপদের সময় কেউ আর আশ্রয় দেবে কি-না সন্দেহ।

একটি বাম জাতীয় দৈনিকের কলামিষ্টের ভাষায় 'সংসদে পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপুমণি রোহিঙ্গা আন্দোলনের পিছনে জামায়াতে ইসলামীর উসকানি খুঁজে পেলেও ভাসমান মানুষের চোখের পানি দেখতে পাননি'। কথাটা অতীব সত্য। মিয়ানমারের যালেম সরকার ও শান্তিতে নোবেলজয়ী গণতন্ত্রী নেত্রী অং সান

সুচি মযলূম রোহিঙ্গাদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, তাদেরকে যে ভাষায় তারা কটূক্তি ও অপদস্থ করে চলেছেন, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় একই ভাষায় তাদের প্রতি তীর্যক মন্তব্য করেছেন। কথিত গণতন্ত্রী নেত্রী নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যা অং সান সুচির প্রতি সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন? হাস্যোজ্জ্বল সুচি তখন বলে ওঠেন, রোহিঙ্গা! তারা আবার কারা? তিনি এখন এদেরকে Kala অর্থাৎ 'বিদেশী' বলছেন। সুচির দল এন.এল.ডি-র এক এম.পি গত এপ্রিলে তার সশস্ত্র ক্যাডারদের প্রথম রোহিঙ্গাদের উপর লেলিয়ে দিয়ে দাঙ্গা বাঁধান। আর তখন থেকেই রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সমূহ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে উত্তেজনা ছড়াতে শুরু করে। অতঃপর ৮ই জুন থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। অথচ সুচি হয়ত ভুলে গেছেন যে, তার পিতা অন সানের অন্যতম প্রধান সহযোগী রাজনীতিক ছিলেন মুসলমানদের নেতা উ, রাযাক। শিক্ষা ও পরিকল্পনামন্ত্রী হিসাবে তিনি রোহিঙ্গা মুসলিম ও বৌদ্ধ বার্মিজ সকলের নিকটে সমান জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সহিংসতায় সুচির পিতার সাথে তিনিও নিহত হন। অথচ আজ সুচি তার পিতার বন্ধুকে চিনেন না। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে, শান্তির মেডেলধারী সুচি তখন ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছেন। উচিত ছিল তার সব ফেলে ছুটে যাওয়া নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে। হয়তবা তাতেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যেত।

তাদেরকে 'অপরাধপ্রবণ' জাতি বলে কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটা দেওয়া হচ্ছে। অথচ ২০ লক্ষ মুসলিম অধ্যুষিত একটা জাতিকে ঢালাওভাবে 'অপরাধপ্রবণ' বলা যে কত বড় অপরাধ তা যে কেউ বুঝতে পারেন। বরং বর্মী পানিদস্যুদের হামলায় এক সময়ে পর্যুদস্ত বাংলাদেশে আজও 'বর্গী হামলা' ও 'মগের মুল্লুক' বলে প্রবাদবাক্য চালু আছে। সে সময়ের লুটপাটকারী এইসব বর্মী দস্যুরা তাদের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী আজও 'রাখাইন' নামে আরাকানী মুসলমানদের উপর সশস্ত্র দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। রখ-ইঙ্গ অর্থ রাক্ষস ভূমি। হ্যাঁ, এ নামে পরিচিত হ'তে তারা আদৌ লজ্জাবোধ করে না। কারণ আসলে তারা রাক্ষসই বটে। এইসব নর রাক্ষসদের খোরাক হ'ল শান্তিপ্রিয় মুসলিম বাঙ্গালী রোহিঙ্গা জাতি। বিগত পঞ্চাশের দশকে বার্মার সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ১৮০টির বেশী

স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সকলে অস্ত্র হাতে নিলেও রোহিঙ্গারা তা করেনি। বরং তাদের নেতা উ, রাযাক সুচির পিতা অং সানের সাথে মিলে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছিলেন।

অপরাধপ্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত। যখন সে অপরাধ করে, তখন সে দায়ী হয়, অন্যেরা নয়। অনুরূপভাবে কেউ অপরাধ করলে পুরা জাতিকে অপরাধী বলা যায় না। সম্প্রতি সঊদী আরবে ৮জন বাংলাদেশীর এবং দুবাইয়ে দু'জন বাংলাদেশীর শিরশ্ছেদ করা হয়েছে খুনের মত কঠিন অপরাধের কারণে। তাই বলে কি বাংলাদেশীরা সবাই খুনী? এর পরেও রোহিঙ্গারা সেদেশে যে নাগরিকত্বহীন মানবেতর জীবন যাপন করছে এবং আমাদের দেশে তাদের যারা শরণার্থী শিবিরে আছে, তারা কি স্বাভাবিক মানবাধিকার ভোগ করতে পারছে? তাই জীবনের তাকীদে তাদের কেউ যদি কোন অপরাধ করেই বসে, তাই বলে তাদের পুরা জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' বলে অভিহিত করা কারু জন্যই সমীচীন নয়। সবচেয়ে বড় কথা এদেশী যেসব পাপিষ্ঠ তাদেরকে নানা অপকর্মে বাধ্য ও প্ররোচিত করছে, সরকার তাদের কি বলে আখ্যায়িত করবে?

রোহিঙ্গাদের ইতিহাস :

রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের আদি বাসিন্দা। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন থেকে চট্টগ্রামের ন্যায় এখানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে *(থিসিস ৪০৩ পৃ.)*। অনেকে ছূফীদের কথা বলেন। কিন্তু এটা ভুল। কেননা ইসলামের প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগে কথিত ছূফীবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বহু পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আরাকান হ'ল টেকনাফের পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদীর পূর্ব পাড়ে ৭২ মাইল দীর্ঘ দুর্লংঘ্য ও সুউচ্চ ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী প্রায় ১৫ হাযার বর্গমাইল ব্যাপী একটি সমতল ভূমি। এটাকে প্রাচীন রাহমী (رهمي) রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়। যাকে এখন 'রামু' বলা হয়। তৎকালীন রাহমী রাজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

যা তিনি ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[২২৫] এতে ধরে নেওয়া যায় যে, তখন থেকেই এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং স্থানীয় রাজাসহ সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামকে সাদরে বরণ করেছে। জাহায ডুবির কারণেও বহু আরব এখানে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিয়ে-শাদী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইসলাম আগমনের বহু পরে ভারত থেকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, মিয়ানমার, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়। ভারত এখন প্রায় বৌদ্ধশূন্য বলা চলে। অথচ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। মধ্যযুগে আরাকানের রাজধানীর নাম ছিল ম্রোহাং। সেটারই অপভ্রংশ হ'ল রোহাং বা রোসাঙ্গ এবং সেখানকার অধিবাসীরা হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩০ থেকে ১৭৮৫ খৃ. পর্যন্ত সাড়ে তিনশ' বছরের অধিক সময় আরাকানের রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এখানকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী মুসলমান। আর মুসলিমদের শতকরা ৯২ জন হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ খৃ. পর্যন্ত দু'শো বছরের অধিক কাল যাবৎ কলিমা শাহ, সুলতান শাহ, সিকান্দার শাহ, সলীম শাহ, হুসায়েন শাহ প্রমুখ ১৭ জন রাজা স্বাধীন আরাকান রাজ্য শাসন করেন। তাদের মুদ্রার এক পিঠে কালেমা ত্বাইয়িবা ও অন্য পিঠে রাজার নাম ও সাল ফারসীতে লেখা থাকত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন বাংলা ভাষার চরমোন্নতি সাধিত হয়। কবি আলাওল, দৌলত কাযী, মরদান শাহ প্রমুখ কবিগণ আরাকান রাজসভা অলংকৃত করেন। আজকে যেমন বাংলা ভাষার রাজধানী হ'ল ঢাকা, সেযুগে তেমনি বাংলা ভাষার রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এক সময় আকিয়াবের চাউল বন্যা উপদ্রুত বাংলাদেশের খাদ্যাভাব মিটাতো। মগদস্যুদের দমনে শায়েস্তা খাঁকে তারাই সাহায্য করেছিল। যার ফলে মাত্র ৩৬ ঘণ্টায় তাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম জয় করা ও মগমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তাই রোহিঙ্গাদের নিকট বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ঋণ অনেক বেশী। আজ তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। আমরা কি পারি না এই সুযোগে তাদের ঋণের কিছুটা হলেও পরিশোধ করতে? প্রশ্ন জাগে,

---

২২৫. হাকেম হা/৭১৯০; থিসিস, ৪২৫ পৃ.।

কোলকাতার বাঙ্গালীদের প্রতি সরকারের যতটা গলাগলি, আরাকানের বাঙ্গালীদের প্রতি তার বিপরীত কেন? তারা নির্যাতিত মুসলমান, সেজন্যেই কি?

রাজনৈতিক অবস্থান :

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলের আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক দিক দিয়ে দুর্গম ইয়োমা পর্বতমালা আরাকানকে বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সেকারণ নাফ নদীর তীরবর্তী টেকনাফ, বান্দরবন, কক্সবাজার ও সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানের সবচাইতে নিকটতম ও সুগম্য এলাকা। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন বৃটিশ ও ভারতীয় হিন্দু নেতারা কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দরাবাদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য সমূহের ন্যায় আরাকান রাজ্যকেও ১৯৩৭ সালে বার্মার সাথে জুড়ে দেয়। অথচ ধর্ম, ভাষা ও ভৌগলিক কারণে এটা বাংলাদেশেরই অংশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে এখানে কাশ্মীরের ন্যায় স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরানোর ব্যবস্থা করা হয়। দেখা গেল যে, ১৯৪২ সালের এক অন্ধকার রাতে ইয়োমা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বর্মী শাসকদের উস্কানীতে নিরীহ আরাকানী মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা চালালো হিংস্র মগ দস্যুরা এবং মাসাধিককাল ব্যাপী হত্যাযজ্ঞে প্রায় এক লাখ মুসলমানকে তারা হত্যা করল। বিতাড়িত হ'ল কয়েক লাখ মুসলমান। এরপর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বৃটিশের কাছ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হ'তে নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলে। তাদের জন্য বার্মার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। ফলে তারা নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে যায়। এইভাবে শত শত বছর ধরে মুসলিম ও বৌদ্ধ একত্রে বসবাসকারী নাগরিকদের স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকারে পরিণত করা হয়। বার্মিজ বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা আরাকানী বৌদ্ধ রাখাইনদের সাথে মিলে আরাকানকে মুসলিমশূন্য করার মিশনে নেমে পড়ে। আদি ফিলিস্তীনীদের হটিয়ে যেমন সেখানে বাইরের ইহূদীদের এনে বসানো হচ্ছে, একইভাবে আদি রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করে সেখানে রাখাইনদের এনে বসানো হচ্ছে। অথচ পৃথিবী নির্বিকার।

এক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রধান দায়িত্ব হবে রোহিঙ্গাদের উপর বর্মী সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং ১৯৪২ সালের পূর্বের ন্যায় তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। অথবা তাদেরকে স্বাধীন আরাকান রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। বাংলাদেশ আরাকানের নিকটতম প্রতিবেশী মুসলিম দেশ। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীন মুখে কুলুপ এটে মজা দেখছে। এমতাবস্থায় যদি আমরা এই মহা বিপদে তাদের সাহায্য করি, তাহ'লে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। বিশ্বসভায় আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি আগামী দিনে রোহিঙ্গারাই হ'তে পারে আমাদের ব্যবসায়িক সহযোগী ও পূর্বমুখী কূটনীতির সেফ গার্ড। অথবা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যদি আমরা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসন করে দিই, তাহ'লে বিগত দিনে তারা যেভাবে পাহাড়-জঙ্গল কেটে আরাকানকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেছিল, সেভাবে তারা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে আবাদ করে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া পার্বত্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এবং দেশের এক দশমাংশের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন দমনে এরাই হ'তে পারে সরকারের শক্তিশালী হাতিয়ার।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, জাতিসংঘ সহ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার জন্য। অথচ অত্যাচারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে না। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দাবাড়ুদের ইঙ্গিতেই মিয়ানমার সরকার এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অবশ্যই ঈমানী শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে বিপন্ন ভাই-বোনদের পাশে। ইনশাআল্লাহ তাতে আল্লাহ্র গায়েবী মদদ নেমে আসবে বাংলাদেশে। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর যাকির হোসায়েনের দৃঢ় ভূমিকায় ভীত হয়ে বার্মার অত্যাচারী জেনারেল নে উইন যেমন তার ঠেলে দেওয়া বিশ হাযার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে ফিরিয়ে নিতে ও তাদের বাড়ীঘরে সম্মানজনক পুনর্বাসনে বাধ্য হয়েছিল, আজকে আমাদের সরকার তেমনি শক্ত ভূমিকা নিলে মিয়ানমার সরকার প্রমাদ গণতে বাধ্য হবে। তাই প্রতিবেশী মুসলিম দেশ হিসাবে আমাদেরই দায়িত্ব রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া।

আগামী ১৫ই জুলাই মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসছেন। তাঁর সামনে সর্বাগ্রে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য

সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও' *(নিসা ৪/৭৫)*। আল্লাহ্র এই একান্ত আহ্বান অবিশ্বাসী-কাফের সুচি-সোনিয়া-হুজিনতাওদের প্রতি নয়, বরং এ আহ্বান ইসলামে বিশ্বাসী শেখ হাসিনাদের প্রতি। যাদের হাতে বর্তমানে আল্লাহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করেছেন। এক্ষণে যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করি, তাহ'লে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। যে গযবের হাত থেকে নমরূদ-ফেরাঊনরা বাঁচতে পারেনি। তাই শুধু আমরাই নই, বিশ্বের যে প্রান্তে যে মুসলমান বসবাস করছে, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাগণ ও মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবেরগণ এবং অর্থ-সম্পদের অধিকারী দেশের ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণী ও মানবতাবাদী সকল মানুষকে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। সেই সাথে আমাদের সরকার ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের একান্ত আহ্বান, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুন!

সকালে রাস্তায় হাঁটছি। হঠাৎ নযর পড়ল শত শত কাকের সমস্বরে কা কা ডাকের প্রতি। দেখলাম নীচে পড়ে আছে একটা আহত কাক। ঠিকভাবে চলতে পারছে না। আমাদের একজন কাকটাকে ধরে উড়িয়ে দিল। অতঃপর কাকের দল সব চলে গেল। স্থানটি ফাঁকা হয়ে গেল। দেখলাম, কাকের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও মমত্ববোধ। সেই সাথে পারস্পরিক ঐক্য ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। আমরা কি তাহ'লে কাকের চাইতেও অধম? ১৯৭৮ সালে নিজে গিয়েছি সাথীদের নিয়ে। শরণার্থী শিবিরে তাদের দুঃখ-কষ্টের সাথী হয়েছি। ১২ দিন বর্ষা-কাদায় ভিজে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছি। ১৯৯২-য়ে সাথীদের পাঠিয়েছি। অথচ ২০১২-তে কিছুই করতে পারছি না। তাই নির্যাতিত রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করছি, 'হে আল্লাহ! তুমি যালেমকে পাকড়াও কর ও মযলূমকে সাহায্য কর- আমীন![২২৬]

---

২২৬. ১৫তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১২।

৬৫. আসামে মুসলিম নিধন

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের ওপারে ভারতের আসাম রাজ্য অবস্থিত। ৭৮ হাযার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যে ৩ কোটির কিছু বেশী লোকের বাস। ভাষাগত দিক দিয়ে 'অহমিয়া' হ'ল প্রধান ভাষা প্রায় ৫৮ শতাংশ। এর পরেই বাংলার অবস্থান প্রায় ২২ শতাংশ। ধর্মীয় দিক দিয়ে প্রায় ৬০ ভাগ হিন্দু ও ২৫ ভাগ মুসলমান। বাদবাকী খ্রিষ্টান ও শিখ প্রভৃতি। হিন্দুরা 'বোড়ো' নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আসামের চা, তৈল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং আসাম থেকেই ভারতীয় রাজ্যসভার এম.পি।

আসামের সংসদ সদস্যা রুমি নাথ ইসলাম কবুল করে একজন মুসলমানকে বিয়ে করায় গত ১লা জুলাই হিন্দুদের হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার হওয়ার কয়েকদিন পরেই গত ১৬ই জুলাই বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন আসামের কোকড়াঝাড় যেলায় দু'জন বাঙ্গালী মুসলিম ছাত্রনেতা খুন হন। এরপর ১৯শে জুলাই আরও ২ জন। একই দিনে খুন হয় বোড়ো ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্টের ৪ জন। অতঃপর শুরু হয় বাঙ্গালী মুসলিম নিধনযজ্ঞ। জ্বালাও-পোড়াও, খুন-ধর্ষণ, লুটপাট সবই চলতে থাকে বাধাহীন গতিতে। দিল্লীগামী রাজধানী এক্সপ্রেস থামিয়ে সেখানেও হামলা চালানো হয়। কোকড়াঝাড় সহ ৪টি যেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস দলীয় রাজ্য সরকার দেশব্যাপী তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ২৫শে জুলাই সেনাবাহিনী নামায়। এতে দাঙ্গার ব্যাপকতা কমলেও বোড়াদের হিংস্রতা বন্ধ হয়নি। ইতিমধ্যে শতাধিক নিহত হয়েছে এবং গৃহহীন হয়েছে প্রায় ৪ লাখ মানুষ। ২ লাখের উপর মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সরকারের খোলা প্রায় ২৫০টি আশ্রয় শিবিরে। বাকীরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে পালিয়ে গেছে। আশ্রয় শিবিরে খাবার নেই, পানি নেই, মাথা গোঁজার ঠাই নেই। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থ। অভিযোগের ঝড় বয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ অবশেষে ২৮শে জুলাই উপস্থিত হয়েছেন মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধী। ঘোষণা দিয়েছেন নিহত ব্যক্তি প্রতি ২ লাখ রূপী এবং আহত ব্যক্তি প্রতি ৫০ হাযার রূপী দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দাঙ্গায় হতাহতদের জন্য ৩০০ কোটি

রূপী অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দেবেন তো রাজ্য সরকারের দলবাজ প্রশাসনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে নিহতদের তালিকা কমিয়ে বলা হয়েছে ৫২ জন। যা প্রকৃত সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। এরপর বলা হবে উপদ্রুতদের বহু সংখ্যক বোড়ো হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এরপরেও সরকারী অফিসার ও দলীয় ক্যাডারদের খায়েশ মিটিয়ে প্রকৃত ব্যক্তিরা অবশেষে কত টাকা হাতে পাবে, কতদিনে পাবে, তার খবর কে নেবে? কেননা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় এখানেও ঘুষ-দুর্নীতি, দলীয় ক্যাডারবাজি ও চাঁদাবাজি একটি সাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া যায়। আসল কথা হ'ল, টাকা দিয়ে জীবনের মূল্য দেওয়া যায় না। যে মূল্যবান জীবনগুলি চলে গেল, তা আর কখনোই ফিরে আসবে না। নিহতদের উত্তরাধিকারী ও নিকটাত্মীয়দের হৃদয়ে রক্তাক্ত স্মৃতির যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হ'ল, যুগ যুগ ধরে তা অমলিন থাকবে। এই দুঃসহ স্মৃতিকে উসকে দিয়ে রাজনৈতিক দাঙ্গাবাজরা আগামীতে আবার দাঙ্গা বাধাবে। শত শত বছর ধরে সহাবস্থানকারী বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা আবারও বিনষ্ট হবে। কেননা সাধারণ মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তারা অশান্তি চায় না। সমাজনেতা ও সরকারের উচিত সর্বদা নিরপেক্ষ থাকা। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে নিরপেক্ষ শাসন অলীক চিন্তা মাত্র।

বাঙ্গালীদের ইতিহাস :

আসামের বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বোড়াদের প্রধান অভিযোগ হ'ল এই যে, তারা বহিরাগত। অতএব তাদের বাংলাদেশে পাঠাতে হবে। অথচ আসামে তাদের বসবাস অহমিয় হিন্দুদের আগমনের বহু আগে থেকেই। কেননা বাংলাভাষী মুসলমানেরা বাংলা থেকে আসামের কামরূপ যায় ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে। আর অহমিয়রা বার্মা থেকে এখানে আসে ১২২৮ সালে। অথচ তারাই এখন মুসলমানদের 'ফরেনার' বলছে। আদি হিন্দু বোড়ো কাচাড়ি সম্প্রদায় এখানকার প্রথম অধিবাসী হ'লেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কলিতরা আসে অনেক পরে কনৌজ ও উড়িষ্যা থেকে। কিন্তু তাদের বিতাড়ন করা হচ্ছে না। অথচ রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিক যেকোন স্থানে বসবাস করতে পারে নিজ নিজ ধর্ম ও আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে। রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা দিবে। কারা আগে এল বা পরে এল এটা দেখার বিষয় নয়। কিন্তু বস্তুবাদী ধারণায়

মানুষ ভেবেছে, সে নিজেই মাটির মালিক। অথচ মাটির প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র যমীনে যেখানে খুশী বসবাস করতে পারে। মানুষের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কোন রাষ্ট্রের উচিত নয় সঙ্গত কারণ ব্যতীত।

কেবল আসাম নয় ভারতের প্রায় সর্বত্র মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস প্রধানতঃ বৃটিশ শাসনের যুগ থেকে শুরু হয়ে আজও চলছে। অথচ প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর মুসলমানেরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। তখন ধর্মীয় দাঙ্গার কোন খবর ছিল না। বরং মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বৃটিশরা এসে সদ্য শাসনহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুনেতাদের ব্যবহার করে। অতঃপর 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' এই মন্দ নীতি সামনে রেখে তারা এদেশকে কব্জায় রাখতে চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সালে তারা চলে গেলেও রেখে যায় 'গণতন্ত্র' নামক ইলাহী সার্বভৌমত্বহীন মেজরিটির শাসনের এক অত্যাচারী মতবাদ। ফলে মেজরিটি হিন্দুদের হাতে মাইনরিটিরা মার খাচ্ছে এবং খাবে, যতদিন এই মতবাদের খপ্পর থেকে জাতি মুক্ত না হবে। এই শাসনে ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্ধারিত হয় মেজরিটির নিরিখে। আদালতের কথিত ন্যায়বিচার কখনোই নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের হৃদয়ের কান্না থামাতে পারেনি। অথচ ইসলামী শাসন সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে। সেখানে মেজরিটি-মাইনরিটিতে কোন প্রভেদ নেই। যার বাস্তব নমুনা ভারতবর্ষের ও বাংলার বিগত যুগের মুসলিম শাসকদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আধুনিক মতবাদীরা ইসলামের এই নিরপেক্ষ শাসনকে ভয় পায়। সেকারণ তারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর এবং এর মাধ্যমে মানবতাকে তাদের দুঃশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করতে চায়।

ভারতের প্রগতিশীল পত্রিকা Front line ১৯৯১ সালের ১৫ই নভেম্বরে প্রকাশিত হিসাব মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সেদেশে ১৩,৯০৫টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে পশ্চিম বঙ্গ সরকার তার রাজ্য বিধান সভায় প্রদত্ত রিপোর্টে বলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার ও গোরস্থান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে'। উক্ত হিসাব মতে দেখা যায়

Contents

যে, বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে কথিত ভারতে তার স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৩০৯টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ২০০১-২০০৯ সাল পর্যন্ত সেদেশে ৬৫৪১টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। জান-মাল ও ইযযত হারিয়েছে এবং গৃহহারা হয়েছে কত অসংখ্য মানুষ তার হিসাব কে রাখে? ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ৪৬৫ বছরের সুপ্রাচীন 'বাবরী মসজিদ' ভেঙ্গে তারা সেখানে কথিত 'রাম মন্দির' গড়েছে। ২০০২ সালে গুজরাটে প্রায় ২০০০ মুসলিমকে তারা হত্যা করেছে সরকারী ছত্রছায়ায়। আজও যার বিচার হয়নি। এখনো প্রতিদিন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে মুসলিম নির্যাতন চলছে। সারা ভারত থেকে বাংলাভাষী মুসলিমদের হ্যাঁকিয়ে এনে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার চেষ্টা চলছে হরহামেশা। সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা চলছে প্রতিদিন। এখন আবার আসাম থেকে মুসলিমদের খেদিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর মিশন শুরু হয়েছে। কি চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষতা! আমরা আসামের মযলূম অসহায় ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র গায়েবী মদদ প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি মযলূম মানবতাকে রক্ষা কর- আমীন![২২৭]

৬৬. ইনোসেন্স অফ মুসলিম্স

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ১১শ বার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর Innocense of Muslims (মুসলিমদের নির্দোষিতা) শিরোনামে আমেরিকা থেকে একটি সিনেমা চিত্র ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে। যাতে পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে জঘন্যতম মন্তব্য ও কুরুচিপূর্ণ চিত্রায়ন করা হয়েছে। ভিডিও চিত্রটি তারা ইউটিউব নামক সামাজিক ওয়েবসাইটে পোষ্ট করেছে এবং আরবীতে অনুবাদসহ মধ্যপ্রাচ্যে ছেড়েছে। ১০০ জন ইহূদীর ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে দীর্ঘদিন ধরে নির্মিত উক্ত নিকৃষ্টতম চলচ্চিত্রটির নির্মাতা ও প্রযোজক হ'ল ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত মার্কিন ইহূদী নাগরিক ক্যালিফোর্নিয়ার ৫৬ বছর বয়সী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী স্যাম বাসিলে। উক্ত সিনেমায় ইসলামকে 'ক্যান্সার' ও

---

২২৭. ১৫তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২।

মুসলমানকে 'গাধা' হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানে শেষনবী মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামকে* কুৎসিত চরিত্রের মানুষ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং তাঁকে জঘন্যতম ভাষায় গালি-গালাজ করা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে ২০১০ সালে ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট ফিনলে গার্ড জেনসেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করে প্রচার করেছিল ও সারা বিশ্বের নিন্দা কুড়িয়েছিল। সিনেমাটি তথ্যগত ভাবে ডাহা মিথ্যায় ভরা এবং নির্মাণশৈলীর দিক দিয়ে চরম বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

প্রতিক্রিয়া : Every action has a reaction 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে'। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সেটাই হয়েছে। মার্কিনী হামলায় সদ্য বিধ্বস্ত লিবিয়ার বেনগাযী শহরে মার্কিন কনস্যুলেটে জনগণের হামলায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেন্সসহ ৪ জন মার্কিন কুটনীতিক ও ১০ জন লিবীয় রক্ষী নিহত হয়েছে। আফগানিস্তানে দু'জন মার্কিন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। কায়রোতে হাযার হাযার মানুষ বিক্ষোভ করেছে ও দেওয়াল টপকে মার্কিন দূতাবাসে প্রবেশ করে গাড়ী পুড়িয়েছে ও মার্কিন পতাকায় আগুন দিয়েছে। একই অবস্থা তিউনিসিয়া, সূদান, ইয়ামন, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কুয়েত ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে হয়েছে। এমনকি ইসরাঈলেও ইহূদী শান্তিবাদীরা এর বিরুদ্ধে মিছিল করেছে ও এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ইরানী পার্লামেন্টের আর্মেনীয় ও আসীরিয় দু'জন খ্রিষ্টান প্রতিনিধি এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, এরা অজ্ঞতার যুগে ফিরে গেছে। কুরআনে ঈসা ও মারিয়ামের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। ফলে এরা কুরআন পুড়িয়ে নিজেদের নবীকে অপমান করেছে'। মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক রিক সানচেজ বলেছেন, মুসলমানেরা যদি এখন বাইবেল পোড়ায়, তাহলে কেমনটা হবে? অতএব তাদের একাজটি একেবারেই অজ্ঞতাসুলভ হয়েছে'। প্রেসিডেন্ট ওবামা এ ঘটনার নিন্দা করেছেন ও রাষ্ট্রদূত হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়ে লিবিয়া সীমান্তে দু'টি রণতরী পাঠিয়েছেন। এছাড়াও বিদেশে সকল মার্কিন দূতাবাসে যরূরী সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন। ইরান মুসলিম বিশ্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত সিনেমা বন্ধ করার জন্য মার্কিন সরকারের

প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এভাবে বিশ্বের সর্বত্র নিন্দাবাদ অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ভীত হয়ে বীরপুঙ্গব স্যাম বাসিলে গা ঢাকা দিয়েছে। অতঃপর গোপন অবস্থান থেকে টেলিফোনে বলেছে যে, ‘সে ইসলামকে ক্যান্সারের মত মনে করে এবং এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সে ইসলাম ধর্মের ত্রুটিগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। যা ইসরাঈলের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সহায়ক হবে’। উল্লেখ্য যে, তার এই ভিডিও নির্মাণে সমর্থন জুগিয়েছেন নিউইয়র্কের বিতর্কিত খ্রিষ্টান ধর্মযাজক টেরি জোন্স। যিনি ২০১১ ও ১২ সালে প্রকাশ্যে কুরআন পোড়ানোর কারণে সারা বিশ্বে নিন্দিত হন। এখন প্রকাশ পেয়েছে যে, ঐ যাজক হ’ল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চর। পাদ্রী হওয়াটা তার বাহ্যিক রূপ মাত্র।

ফিরে দেখা : ১৯১৭ সালে কুখ্যাত ‘বেলফোর’ চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের তদারকিতে ফিলিস্তীনের মুসলিম ভূখণ্ডে ইহূদী রাষ্ট্র কায়েমের চক্রান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। হাযার বছরের আরব মুসলিমদের বিতাড়িত করে সেখানে বিভিন্ন দেশে ছড়ানো-ছিটানো ইহূদীদের এনে বসতি স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনের একাংশে ‘ইসরাঈল’ নামক রাষ্ট্র কায়েম করা হয় এবং সেখানকার স্থায়ী মুসলিম অধিবাসীরা বিতাড়িত হয়ে আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে উদ্বাস্তু হিসাবে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আজও তারা সেভাবেই মানবেতর জীবন যাপন করছে। পরাশক্তিগুলির পারস্পরিক যোগসাজশে প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্র মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যের তৈল ভাণ্ডারের উপর স্থায়ীভাবে ছড়ি ঘুরানোর জন্য এবং সেখানকার তৈল স্বল্পমূল্যে ভোগ করার জন্য একটি সামরিক কলোনী মাত্র। পরাশক্তির সমর্থন ব্যতীত একদিনও এ রাষ্ট্রের টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, ‘যেখানেই তারা থাকুক না কেন তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হবে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও মানুষের অঙ্গীকার ব্যতীত। তারা আল্লাহ্র ক্রোধ অপরিহার্য করে নিয়েছে এবং তাদের উপর পরমুখাপেক্ষিতা আপতিত হয়েছে। এটা এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ ওরা অবাধ্য হয়েছে ও সীমা লংঘন করেছে’ *(আলে ইমরান ৩/১১২)*।

খ্রিষ্টানরা ঈসা ও তার মা মারিয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে।

ইহূদী ও নাছারা উভয় জাতি আল্লাহ্র কিতাবকে বিকৃত ও বিনষ্ট করেছে ও তার বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করেছে *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*। তাদের কেতাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা তা মানেনি এবং শেষনবীকে পেয়েও তাঁকে স্বীকার করেনি *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। শুধু তাই নয়, তারা তাঁর ও তাঁর উম্মতের বিরুদ্ধে সবধরনের চক্রান্ত করেছে। অতঃপর বিগত নবীগণের ন্যায় শেষনবীকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। আজও তারা একই বদভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করছে। তাই এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র নিকটে আমাদেরকে প্রতি ছালাতে সূরা ফাতিহায় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঐসব লোকদের পথে পরিচালিত করোনা, যারা অভিশপ্ত হয়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। এই দো'আর শেষে বলতে হয় 'আমীন' (হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর)। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ লোকগুলি কারা? তিনি বললেন, ওরা হ'ল ইহূদী ও নাছারারা'।[২২৮] মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। ওদের চক্রান্তে অতিষ্ঠ রাসূলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*।

দুর্ভাগ্য! মুসলিম উম্মাহ্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের কাছে অহি-র বিধান কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থাকা সত্ত্বেও তা বাদ দিয়ে ইহূদী-নাছারাদের চালান করা নানা ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী হয়েছেন ও প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাদের

---

২২৮. আহমাদ হা/২০৩৬৬; তিরমিযী হা/২৯৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৮২০২।

তাবেদার হয়েছেন। পাশ্চাত্য বিশ্বের নেতারা সালমান রুশদী সহ এযাবত কোন ব্যঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়নি। বরং বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। যদি তারা তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতেন, তাহলে আজকে এ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতো না। অতএব বর্তমান ঘটনার জন্য মূলতঃ পাশ্চাত্যের নেতারাই দায়ী। সেকারণ তাদের উপরে নেমে আসছে একের পর এক লাঞ্ছনা ও অপমানকর পরিণতি। শান্তিপ্রিয় বিশ্বের এ ক্ষোভ ও ঘৃণা থেকে বাঁচার উপায় তাদের নেই।

ক্রোধের কারণ : (ক) ওরা কুরআনের উপরে নাখোশ। কারণ কুরআনই পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইলাহী ধর্মগ্রন্থ, যা অবিকৃত রয়েছে ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং যা পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*। কুরআন মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইলাহী গ্রন্থ। যা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। যার পরিবর্তনকারী কেউ নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। তাওরাত-ইনজীল ছিল অপূর্ণাঙ্গ ও কেবল বনু ইস্রাঈলের জন্য। তাই আল্লাহ তার হেফাযতের দায়িত্ব নেননি। ফলে তা স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই রাগে ও ক্ষোভে ওরা কুরআনকে গুলি করে। যেমন ইরাকের আবু গারীব কারাগারে তারা করেছে। কুরআনকে পুড়িয়ে মনের ঝাল মিটায়। যেমন পাদ্রী টেরি জোন্স নিউইয়র্কে গত বছর ও এ বছর করেছে। ইরাকে গত ১৯শে মে'১২ এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সেনারা এ বছর কুরআন পুড়িয়েছে। ১৯৮৯ সালে ওরা সালমান রুশদীকে দিয়ে Satanic Verses (স্যাটানিক ভার্সেস) লিখিয়ে কুরআনের আয়াত সমূহকে 'শয়তানের পদাবলী' বলেছে। ১৯৯৪ সালে তাসলীমা নাসরীনকে দিয়ে 'লজ্জা' উপন্যাস লিখিয়ে কুরআন পরিবর্তনের দাবী করেছে। যেমন ইতিপূর্বে আবু জাহলরা দাবী করেছিল *(ইউনুস ১০/১৫)*। (খ) ওরা 'ইসলাম'-কে বরদাশত করতে পারে না। কেননা 'আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। ইসলামের বাণী যার অন্তরে প্রবেশ করে, সে মুসলমান হয়ে যায়। যেমন ওয়ান ইলেভেনের পরে পাশ্চাত্যের মানুষ এখন অধিক হারে ইসলাম কবুল করছে। তাদেরই হিসাব মতে ২০৫০ সালের মধ্যে 'ইসলাম' বিশ্বধর্মে পরিণত হবে। বড় কথা হ'ল, অন্য ধর্ম ছেড়ে মানুষ ইসলাম কবুল করে। কিন্তু ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্ম

কবুলের ঘটনা একেবারেই বিরল। তাই তারা ইসলামকে 'ক্যান্সার' বলেছে। আর মুসলমানকে বোকা, 'গাধা' বলেছে। আর সেকারণেই খাঁটি ঈমানদারগণের উপর ওদের ক্ষোভ বেশী। তাই এ বছর আফগানিস্তানে তালেবানদের মৃত লাশের উপর দাঁড়িয়ে মার্কিন সেনাদের পেশাব করতে এবং তা ভিডিও চিত্রে ধারণ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতেও এদের লজ্জা হয়নি। দেশে দেশে প্রকৃত ইসলামী নেতারাই এখন এদের টার্গেট। (গ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রাগের কারণ, তিনিই একমাত্র বিশ্বনবী। মূসা ও ঈসা সহ সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। শেষনবীর আবির্ভাবের পর এখন মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় একমাত্র নবী হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার আগমনের সুসংবাদ স্বয়ং ঈসা (আঃ) দিয়ে গিয়েছেন *(ছফ ৬১/৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলে গেছেন 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি যে, ইহূদী হৌক, নাছারা হৌক, পৃথিবীর যে কেউ আমার আবির্ভাবের কথা শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসী হবে'।[২২৯] তিনি আরও বলেন, ভূপৃষ্ঠের এমন কোন শহর-গ্রাম ও বস্তিঘর থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না। তারা সম্মানিত অবস্থায় ইসলাম কবুল করবে অথবা অসম্মানিত অবস্থায় এর অনুগত হবে। আর এভাবেই দ্বীন আল্লাহ্র জন্য পরিপূর্ণ হয়ে যাবে'।[২৩০]

ইহূদী-নাছারা ও তাদের দোসরদের হাযারো চেষ্টা সত্ত্বেও ইসলাম দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এক হিসাবে জানা যায় ইসলামের বিরুদ্ধে বছরে তারা ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করে এবং তাদের দু'শোর বেশী ইলেকট্রনিক মিডিয়া বর্তমানে এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও ইসলামী নেতাদের তারা ছলে-বলে-কৌশলে দলে ভিড়াচ্ছে। অথবা ভয় দেখিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু উল্টা মার্কিন সেনারাই এখন মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। খোদ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা মুসলমান হয়ে গেছেন। তাই বর্তমানে যা কিছু ঘটছে, সবই তাদের আদর্শিক পরাজয়ের ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের ব্যতীত

২২৯. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।
২৩০. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০১; মিশকাত হা/৪২।

অন্যদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। যারা তোমাদের ক্ষতি করতে আদৌ ত্রুটি করবে না। তারা চায় তোমরা কষ্টে পতিত হও। বিদ্বেষ তাদের যবান দিয়েই বেরিয়ে আসে। আর তাদের বুকের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে, তা আরও মারাত্মক। আমরা তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা বুঝ'। 'দেখ, তোমরা ওদের ভালবাস। কিন্তু ওরা তোমাদের ভালবাসে না। অথচ তোমরা আল্লাহ্র সকল কিতাবে বিশ্বাস রাখো। (কিন্তু ওরা কুরআনে বিশ্বাস করে না)। যখন ওরা তোমাদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন পৃথক হয়, তখন তোমাদের উপর রাগে আঙ্গুল কামড়ায়। তুমি বল! তোমরা তোমাদের ক্রোধে জ্বলে-পুড়ে মরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের অন্তরের কথা সম্যক অবগত' *(আলে ইমরান ৩/১১৮-১৯)*।

অতএব হে মুসলিম ভাই ও বোন! ধৈর্য ধারণ কর। নিজের দ্বীনের উপর আরও দৃঢ় হও। অন্যদের থেকে সাবধান থাক। সার্বিক জীবনে ইসলামের যথার্থ অনুসারী হও। 'এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই' *(আ'রাফ ৭/১২৮)*।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের যেসকল বিবেকবান মানুষ এ ঘটনার নিন্দা করেছেন, আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে এর প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। নইলে শত্রুরা এটাকে অজুহাত বানাবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, মসজিদে নববীতে জনৈক বেদুঈন দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিল। ছাহাবীগণ তাকে মারতে উদ্যত হলে রাসূল (ছাঃ) তাদের নিবৃত্ত করেন ও সেখানে পানি ঢালতে বলেন। অতঃপর বলেন, 'তোমরা প্রেরিত হয়েছ মানুষের উপর সহজকারী হিসাবে, কঠোরতাকারী হিসাবে নয়'।[২৩১] বস্তুতঃ এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য। আর এভাবেই ইসলাম মানুষের অন্তর জয় করে থাকে ও সর্বত্র বিজয়ী হয়।

পরিশেষে আমরা প্রেসিডেন্ট ওবামা সহ সকল ইহূদী-নাছারা ও অমুসলিম বনু আদমকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ইসলাম কবুল করার

২৩১. বুখারী হা/২২০; মিশকাত হা/৪৯১।

আহ্বান জানাচ্ছি। সেদিনের খ্রিষ্টান বাদশাহ নাজাশী ও তাঁর পাদ্রীরা কুরআন শুনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আজকের ওবামারা কি সেটা পারেন না? অতএব দু'দিনের এ দুনিয়াবী মরীচিকায় আচ্ছন্ন না থেকে আসুন আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের কাছে মাথা নত করি ও জান্নাতের অধিকারী হই। কুরআনকে বুকে ধারণ করি ও মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করে ধন্য হই। ঐ শুনুন, আপনাদের জন্যই নেমে এসেছে আসমানী তারবার্তা : '(ক্বিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে) তবে তাদের নয়, যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। হে আল্লাহ! তুমি কুরআন, ইসলাম ও ইসলামের নবীর সম্মানকে আরও উচ্চ কর এবং অসম্মানকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও। যেমন তুমি দিয়েছিলে ফেরাঊনকে। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন![২৩২]

[এ ঘটনার বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ হ'তে আমীরে জামা'আতের বিবৃতি ১৭ ও ১৮-ই সেপ্টেম্বর'১২ দৈনিক ইনকিলাবের ২য় পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। -সম্পাদক!]

৬৭. আমেরিকার নির্বাচন

বারাক হোসেন ওবামা গত ৬ই নভেম্বর'১২ পুনরায় ৪ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। গতবারের ন্যায় এবারও আইনসভার উচ্চকক্ষ (সিনেট) ডেমোক্রাটদের দখলে এবং নিম্নকক্ষ (কংগ্রেস) রিপাবলিকানদের দখলে গেছে। সেদেশের ঐতিহ্য হ'ল দ্বিদলীয় নির্বাচন : ডেমোক্রাট (গণতন্ত্রী) ও রিপাবলিকান (প্রজাতন্ত্রী)। দুই তন্ত্রীর মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া কাজের কোন পার্থক্য নেই। প্রথমোক্ত দলের মার্কা হ'ল 'গাধা' এবং দ্বিতীয় দলটির মার্কা হ'ল 'হাতি'। গাধা ও হাতির পুরোদস্তুর লড়াই। চার বছর অন্তর বলা হ'লেও নির্বাচনের দু'বছরের মাথায় পরবর্তী নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মার্কিন নির্বাচনকে পৃথিবীর জটিলতম ও ব্যয়বহুল নির্বাচন প্রথা বলা হয়। সেখানে দলীয় মনোনয়ন পেতে প্রায় দু'বছর ব্যাপী যে ধকল ও তহবিল সংগ্রহের বিড়ম্বনা পোহাতে হয়, তা পৃথিবীতে বিরল। এবারের নির্বাচনে উভয়

---

২৩২. ১৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১২।

প্রার্থীর মোট ব্যয় হয়েছে ৬০০ কোটি ডলার। এজন্য ইরানের প্রেসিডেন্ট একে ‘ধনিকদের যুদ্ধ’ বলেছেন।

সেদেশের ৫০টি রাজ্যে ৫০ রকম সংবিধান ও নির্বাচনী বিধি। এক রাজ্যে যা সিদ্ধ, অন্য রাজ্যে তা নিষিদ্ধ। ব্যালটে কেবল প্রেসিডেন্ট ভোটই থাকে না, আইনের বিষয় মতামতও দিতে হয়। যেমন এবারের নির্বাচনে মেরিল্যাণ্ড রাজ্যের বাল্টিমোর সিটির এক স্কুল শিক্ষিকা ভোট দিয়েছেন জুয়ার আড্ডা (ক্যাসিনো) চালুর পক্ষে এবং সমকামী বিবাহ (গে ম্যারেজ) চালুর বিপক্ষে। জুয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, অবৈধ তৎপরতার চেয়ে বৈধ উত্তম। ৭২ বছরের এক বৃদ্ধ, যার দু’চোখ অন্ধ এবং দু’পা হাটু থেকে কাটা, হুইল চেয়ারে করে ভোট দিতে এসেছেন। তিনি ওবামা, ক্যাসিনো ও গে ম্যারেজের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। অমনিভাবে সমকামী নারী ও পুরুষরা ওবামাকে ব্যাপকহারে ভোট দিয়েছে। তাদেরও নিশ্চয়ই যুক্তি আছে।

আমেরিকায় ভোট দু’রকম : পপুলার ভোট এবং ইলেক্টোরাল ভোট। শেষোক্ত ভোটাররা হ’লেন দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ। যাদের মধ্যে থাকেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। তাদের সংখ্যা সারা দেশে নির্ধারিত মোট ৫৩৮ জন। তাদের মধ্যে যিনি অর্ধেক অর্থাৎ ২৭০ টি ভোট পাবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। পপুলার ভোট হ’ল সাধারণ মানুষের ভোট। তাতে কেউ বেশী পেলেও যায় আসে না। যেমন বিগত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশ-এর চাইতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আল-গোর পপুলার ভোট ১০ লাখ বেশী পেয়েছিলেন। কিন্তু ইলেক্টোরাল ভোট ৫টি কম পাওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্ট হ’তে পারেননি।

এর মধ্যে একটা বিষয় শিক্ষণীয় যে, সেদেশে জ্ঞানী-গুণীদের ভোটের মূল্য আছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত ইলিশ মাছ ও পুটি মাছের দর এক নয়। আরেকটি বিষয় ভাল, সেটি হ’ল এই যে, তাদের মধ্যে নির্বাচনী সহিংসতা নেই। যেটা আমাদের দেশে অপরিহার্য বিষয়। সম্ভবতঃ ভোটচুরিও নেই। থাকলে সহিংসতা হ’ত। কিন্তু এই যে বিশ্ব কাঁপানো ইলেকশন। তার ফলাফলটা কি?[২৩৩]

---

২৩৩. সিভিল সার্ভিস সবাইকে পদত্যাগ করতে হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর বলা হয় এবং আমেরিকাকে আর্থিক পরাশক্তি বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? মিট রমনি আর ওবামা ব্যক্তি ও দল হিসাবে যতই পৃথক হন, রাষ্ট্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র একটাই। প্রেসিডেন্ট বদলালেও সেদেশের জাতীয় স্বার্থ কখনো বদলায় না। সেই স্বার্থ ঠিক করে যুক্তরাষ্ট্রের সিভিকো-মিলিটারী করপোরেট ত্রিভুজ। ভিতর থেকে যাদের নিয়ন্ত্রণ করে একটি শক্তিশালী ইহূদী লবি। বর্তমানে ৩১ কোটি ৪৭ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে যাদের সংখ্যা মাত্র ৬৫ লাখ (২.১ %)। অথচ ১৯৬৭ সাল থেকে তারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ামক। সেদেশের ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা, মিডিয়া সব তাদের হাতে। প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের তহবিলের মূল যোগানদাতা তারাই। ফলে এদের প্রতাপকে সমীহ না করে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষেই ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। এরপরেও চেক এণ্ড ব্যালান্সের নামে কংগ্রেস আর সিনেটে দু'দলের টানাপোড়েনে প্রেসিডেন্টের কোন সদিচ্ছা বাস্তবায়ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই ব্যক্তি ওবামা যতই শান্তিতে নোবেলজয়ী হন না কেন, প্রেসিডেন্ট ওবামা তা প্রমাণ করতে পারেননি বিগত চার বছরে। অন্যান্য প্রেসিডেন্টদের মত তিনিও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলী স্বার্থের বরকন্দাজ মাত্র। আফগানিস্তান, ইয়ামন ও পাকিস্তানে তিনি ড্রোন হামলাকারী ও শতশত নিরীহ মানুষের হত্যাকারী। লিবিয়াকে তিনি ধ্বংসকারী ও তৈল লুটকারী। এখন সিরিয়াকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনেছেন। কারণ সিরিয়া হ'ল ইস্রাঈলের নিকটতম প্রধান বিরোধী রাষ্ট্র। অথচ নিজের দেশের হাযার হাযার বেকার ও হতদরিদ্র মানুষ কর্মসংস্থানের দাবীতে ওয়াল স্ট্রীটে অবস্থান ধর্মঘট করছে। যারা নিজেদেরকে সেদেশের ৯৯ শতাংশ নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি বলে দাবী করছে। অর্থাৎ এক শতাংশ ধনিক শ্রেণী বাকী নিরানব্বই শতাংশ মানুষের রক্ত শোষণ করছে। বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। ফলে চিরশত্রু চীনের কাছ থেকে ও অন্যান্য বন্ধু দেশ থেকে ট্রিলিয়নকে ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে ও অস্ত্র বিক্রি করে কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দেশটি। ফলে মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও সেদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে কতটা গণবিরোধী, তা ওবামার গত চার বছরের ব্যর্থতা দিয়েই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই ওবামা এবারে তাঁর শেষ সুযোগে পারবেন কি ইস্রাঈলের স্বার্থ রক্ষাকারী না হয়ে মানবতার রক্ষক হতে? পারবেন কি গণতন্ত্র ফেরি করার নামে অস্ত্র ও সন্ত্রাস রফতানী বন্ধ করতে?

পারবেন কি বাহরায়েন, কুয়েত, জর্ডান, কাতার, সঊদী আরব, ওমান, আরব আমিরাত, ইয়ামন, জিবুতি, মিসর, তুরস্ক, ইরাক, উযবেকিস্তান, তাযিকিস্তান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানসহ মোট ১৬টি মুসলিম দেশ থেকে তাদের সামরিক ঘাঁটি গুটিয়ে নিতে? পারবেন কি কিউবার গুয়ান্তানামো বে সহ বিভিন্ন দেশে তাদের স্থাপিত মুসলিম নির্যাতনকারী বন্দী শিবিরগুলি বন্ধ করতে? পারবেন কি বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়ার পাঁয়তারা বন্ধ করতে? শান্তির জন্য কাজ করতে না পারলেও অশান্তি ছড়াবেন না বা তার পক্ষে ভেটো দেবেন না, এটুকুও যদি করতে পারেন, তাহ'লেও তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আগামী ২৯শে নভেম্বর জাতিসংঘে ফিলিস্তীনের সদস্যপদ লাভের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। সারা বিশ্ব এর পক্ষে। কিন্তু ভেটো ক্ষমতাধারী আমেরিকা এর বিপক্ষে। দেখা যাক গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মোড়ল রাষ্ট্রটি সেখানে কি ভূমিকা রাখে। আগামী ১৯শে নভেম্বর ওবামা যাচ্ছেন মিয়ানমারে। সেখানে গিয়ে শান্তিতে নোবেল জয়ী আরেক নেত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে। তারা দুই শান্তির মেডেলধারী ইচ্ছা করলে খুব সহজেই নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। ইতিমধ্যে মিয়ানমারে আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়েছে। শক্তিশালী ভূমিকম্পে রাখাইন রাজ্য তছনছ হয়ে গেছে। যালেম বৌদ্ধরা এখন এটাকে 'ভগবানের ক্রোধ' বলে ভীত হয়ে পড়েছে। ওবামার আমেরিকাতেও সদ্য স্যাণ্ডির গযব হয়ে গেল। দুই অভিশপ্ত দেশের নেতারা তা থেকে কি উপদেশ গ্রহণ করেছেন, বিশ্ববাসী এখন সেটাই দেখবে। যদিও আমরা নিশ্চিত যে, ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সহ তাবৎ অমুসলিম বিশ্ব এক। তবুও আমরা আশা করতে পারি এজন্য যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ অবশ্যই ফাসেক-ফাজের লোকদের দিয়ে তার দ্বীনকে শক্তিশালী করে থাকেন'।[২৩৪]

পরিশেষে বলব, আমেরিকার এই নির্বাচন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার নির্বাচন মাত্র। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত ২৩৬ বছর ধরে চলে আসা আমেরিকার এই নির্বাচনী রাজনীতির ফলাফল গরীবদের জন্য শূন্য। দিন দিন তাদের অংশগ্রহণ কমছে। বুশ-এর নির্বাচনে ৫৪ শতাংশ লোক ভোট

---

২৩৪. বুখারী হা/৪২০৩; মুসলিম হা/১১১; মিশকাত হা/৫৮৯২।

দেয়নি। এবার ওবামার নির্বাচনে ৫০ শতাংশেরও কম লোক অংশগ্রহণ করেছে। প্রদত্ত মোট ১২ কোটি ৩৫ লাখ পপুলার ভোটের ৫০.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ওবামা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে তিনি আমেরিকার মোট ভোটারের গড়ে সিকি শতাংশের প্রেসিডেন্ট। এই নির্বাচনী জুয়ার খেলা মানুষ ক্রমেই বুঝতে পারছে। ফলে মানুষ ক্রমেই এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অতএব আমরা বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দেব, ফিরে এসো দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনের দিকে। ফিরে এসো আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধানের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মেনে নিয়ে যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার দিকে। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন- আমীন![২৩৫]

৬৮. মুরসির বিদায়

মুরসির পতন। গণতান্ত্রিক বিশ্ব নীরব। ইসলামী বিশ্ব হতবাক। ইসলামী নেতাদের মুখ বন্ধ। মিসরের ইতিহাসের সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত (৫১.৭%) প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসির পতন হ'ল মাত্র এক বছরের মাথায় গত ৩রা জুলাই'১৩ বুধবার। এখন তিনি সেনাবাহিনীর হেফাযতে। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে কারাগারে পাঠানোর অপেক্ষায়। অতঃপর হয় ফাঁসি, নয় মুক্তি অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস। ইতিমধ্যে শতাধিক নিহত হয়েছে সেনাবাহিনীর গুলিতে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। যে তাহরীর স্কয়ারের গণজোয়ার ২০১২ সালে মুরসিকে ক্ষমতায় আনার মূল ভূমিকায় ছিল, সেই স্কয়ারে এখন মুরসির বিদায়ে আনন্দ উল্লাস চলছে। খুশীতে চলছে সমানে নারী ধর্ষণ। ৪ দিনে ৯১ জন নারী প্রকাশ্যে গণধর্ষিতা হয়েছে। জানিনা ইতিমধ্যে আরও কত অনাচার ঘটেছে সেখানে ও অন্যখানে।

পাশ্চাত্যের গ্রহণযোগ্য 'মডারেট' ইসলামী দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে সরালো কারা? এক কথায় জবাব আমেরিকা। কাদের মাধ্যমে সরালো? মিসরীয় সেনাবাহিনী ও বিরোধী দল সমূহের মাধ্যমে। কেন সরালো? সবকিছু উজাড় করে দিয়েও ওবামার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারার কারণে। সেনাবাহিনীর বেঁধে দেয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শর্ত মানতে ব্যর্থ হওয়ায় সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট মুরসিকে উৎখাত করার পরেও ওবামা কেন একে

২৩৫. ১৬তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১২।

Contents

সেনা অভ্যুত্থান বলছেন না? কেননা তাতে সেনাবাহিনীকে দেয়া তাদের বার্ষিক নিয়মিত সহযোগিতা বন্ধ করতে হ'ত। ১৯৮৫ সালে গৃহীত এক মার্কিন আইনে বলা আছে যে, কোন দেশে কোন নির্বাচিত সরকার সেনা অভ্যুত্থানে উৎখাত হ'লে সেদেশে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করতে হবে। ওবামা সে জন্যেই 'মিলিটারী ক্যু' না বলে গণ অভ্যুত্থানের পক্ষে সেনাবাহিনীর সমর্থন বলছেন। অথচ উৎখাতের প্রায় ছয় মাস আগে থেকে ওবামা ও ইস্রাঈলী প্রশাসনের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে সেনা প্রশাসনের দেন-দরবার চলছে। এমনকি বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-বারাদী ইসরাঈলেরই প্রস্তাবিত ব্যক্তি।

মিসরের এই ঘটনায় গণতন্ত্র যে স্রেফ একটা প্রতারণা সেটাই আবার প্রমাণিত হ'ল। তাদের বহু ঘোষিত বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা সবই কেবল ইসলাম বিরোধীদের জন্য, ইসলামপন্থীদের জন্য নয়। ইসলামপন্থীরা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় গেলেও ইসলামের কোন বিধান কায়েম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বা করতে দেয়া হবে না, এটাই হ'ল গণতন্ত্রীদের মূল কথা। তুরস্ক, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মিসর হ'ল তার একেবারে টাটকা প্রমাণ।

ইহূদী-নাছারা আন্তর্জাতিক চক্র তাদের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা ও শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে হেন অপকর্ম নেই যা করতে পারে না। গণতন্ত্র তাদের দেওয়া একটা গালভরা বুলি মাত্র। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৫১ সালে ইরানে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার এসেছিল মোহাম্মাদ মোছাদ্দেক-এর নেতৃত্বে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও তাদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অপরাধ করেছিলেন এই যে, তিনি ইরানী তৈল কোম্পানী জাতীয়করণের মাধ্যমে প্রথমবারের মত দেশের তৈল সম্পদের মালিকানা ইরানী জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সাথে পাহলবী রাজার ক্ষমতা কমিয়ে নির্বাচিত সরকার প্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে সেদেশের তৈল লুণ্ঠনকারী মার্কিন ও বৃটিশ চক্র তাদের স্ব স্ব গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের প্লট তৈরী করে। যে মোছাদ্দেক ছিলেন ইরানী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা, লাখ লাখ ডলার খরচ করে তার বিরুদ্ধে সেদিন তেহরানে লাখো মানুষের ঢল নামানো হয়। যাতে তাঁর পতন ঘটে এবং পাহলবী রাজার মাধ্যমে তাদের শোষণের পথ অবারিত রাখা হয়। ১৯৬০ সালে

তুরস্কের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারেসকে ইসলামপন্থী হবার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ার নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করতে যাওয়া ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে গৃহযুদ্ধে সেখানে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়। ২০০৬ সালে ফিলিস্তীনে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার খেসারত ইসলামপন্থী হামাসকে আজও দিতে হচ্ছে ভিতরে-বাইরে অবরোধ ও হামলার শিকার হয়ে। মুরসি তেমনি জিতে হেরেছেন। মিসর এখন বিভক্ত। এটাই পাশ্চাত্যের কাম্য। মিসরে ইসরাঈলের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই পাশ্চাত্যের ব্রত। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাঈলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি করেন। যার প্রধান ধারাই ছিল ইসরাঈলের অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা। বিনিময়ে আমেরিকা ইসরাঈলের পরে মিসরকে তাদের সেরা সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা দেয়। প্রতি বছর প্রদত্ত ১৫০ কোটি ডলার সাহায্যের মধ্যে ১৩০ কোটি ডলার কেবল সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়, যার কোন হিসাব নেওয়ার অধিকার মিসর সরকারের থাকবে না। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সেরা সেনাবাহিনীকে মার্কিনীরা কব্জায় নেয়। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট হয়েই মুরসি প্রথমে গাযা সফর করেন। সিনাইয়ের রাফাহ সীমান্ত খুলে দেন। অতঃপর সঊদী আরব ও ইরান সফর করেন। পরে ইরানী প্রেসিডেন্ট মিসর সফর করেন। এরপর তিনি সংবিধান সংশোধন করার উদ্যোগ নেন। এতে তিনি ইসরাঈল ও ওবামার সন্দেহে পতিত হন। মুবারকপন্থী প্রার্থী বিগত নির্বাচনে দ্বিতীয় (৪৮.৩%) স্থানে ছিল। এছাড়াও ছিল নোবেলজয়ী আল-বারাদীর দল ও অন্যান্যরা। আর ছিল দীর্ঘ ৩০ বছরের মোবারকপন্থী শক্তিশালী আমলাচক্র। সেই সাথে স্বাধীনচেতা সেনাবাহিনী। যারা এখন মিসরের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশের মালিক। সেদেশের প্রায় সব শিল্প ও কল-কারখানার মালিকানা সেনাবাহিনী সদস্যদের হাতে। তাদের বিলাসী জীবন যাপনের পাশে হতদরিদ্র নিঃস্ব জনগণ যুগ যুগ ধরে শোষিত হ'তে হ'তে এখন কংকালসার হয়ে পড়েছে। একটা ভোট দেওয়া ছাড়া তাদের কোনই শক্তি বা ক্ষমতা নেই। তাদের বিরাট আশা ছিল মুরসিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তারা জানেনা যে, ভোটের মৌসুমে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলা হলেও ভোটাধিকারহীন সেদেশের প্রায় ৮ লাখের অধিক সেনাবাহিনীই

রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতার উৎস। সাথে সাথে তাদের উপরে রয়েছে মার্কিন ছড়ি ও আর্থিক টোপ। তাদের সংবিধানে সেনাবাহিনীকে এমন ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, তারা ইচ্ছা করলে সংবিধান স্থগিত করতে পারে। তাদের মনোনীত সাংবিধানিক আদালত যেকোন সময় নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল করে দিতে পারে। মুরসির বেলায় সব হ্যাতিয়ারই তারা প্রয়োগ করেছিল। ফলে মুরসি বাধ্য হন আপোস করতে। পতনের সপ্তাহখানেক আগে তিনি কায়রোতে লক্ষাধিক সমর্থক জড়ো করে জোরালো ভাষণ দিয়ে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরোধিতা করেন এবং সেখানে আমেরিকার প্রস্তাবিত নো ফ্লাই জোন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে সমর্থন দেন। এমনকি তিনি গাজাবাসীদের বাঁচার পথ রাফাহ সীমান্ত যা খুলে দিয়েছিলেন তা আবার বন্ধ করে দেন। এমনকি মোবারকের আমলে রাস্তার তল দিয়ে চালু করা টানেল বা সুড়ঙ্গ পথটুকুও শেষ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতেও মার্কিন প্রভুরা খুশী হননি। শেষে পতনের আগ রাতের সর্বশেষ ভাষণে তিনি সেনাবাহিনীর চাহিদা মোতাবেক আপোষ প্রস্তাবের ঘোষণা দেন। কিন্তু তাতে আর কাজ হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন, মার্কিনীরা আর যাই হৌক জনগণের ভোটকে সম্মান করবে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু তাঁর সব হিসাবই ভুল প্রমাণিত হ'ল। তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল সেনাবাহিনীর গায়ে হাত দেয়া। তিনি মোবারক আমলের সেনাপ্রধানকে সরিয়ে তাঁর পসন্দের ব্যক্তিকে সেনাপ্রধান করলেন। অথচ সেই-ই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে দিল। কারণ তিনি বুঝলেন, যিনি তার পূর্বসূরীকে সরিয়েছেন তিনি দু'দিন পরে তাকেও সরাবেন। তাছাড়া তিনি সংবিধান সংশোধন করেন। যদিও সেখানে সেনাবাহিনীকে স্পর্শ করেননি। ইন্দোনেশিয়া, মিসর, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিয়ানমার ও যেসব দেশে সেনাবাহিনীই মূল ক্ষমতাধর, সেসব দেশে গণতন্ত্র একটা শ্রুতিমধুর শব্দ মাত্র। যার কোন বাস্তবতা নেই। বিশেষ করে বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনী যখন একটা ব্যবসায়িক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং দেশের ধনিক শ্রেণী ও তাদের বশংবদ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে, তখন তাদের এই লাভজনক অবস্থান সামান্যতম ক্ষুণ্ণ হৌক, এটা তারা চায় না। তাই মুরসির উচিৎ ছিল সর্বাগ্রে দেশে সুশাসন কায়েম করা। সবার সাথে সদাচরণ করা ও নিজেকে সকল দেশবাসীর প্রেসিডেন্ট হিসাবে

প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ইমাদুদ্দীন আব্দুল গফুর সম্প্রতি আমেরিকার দি ওয়াশিংটন পোষ্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণা করা উচিৎ যে, তিনি মিসরের সকল মানুষের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আসল সমস্যা হ'ল, মিসরের অনেক মানুষই ভাবে যে, তিনি সকল মিসরীয়ের প্রেসিডেন্ট নন'। আমরা মনে করি, বিষয়টি কেবল ঘোষণা দেওয়ার নয় বরং আচরণের ব্যাপার। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে ইসলামী পন্থায় নির্বাচন হবে। দলীয় ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তি কখনোই বাস্তবে নির্দলীয় হ'তে পারেন না, অতি মানব কিংবা সত্যিকারের আল্লাহভীরু কোন সাহসী মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া।

প্রশ্ন হ'ল, বঞ্চিত দলটি ও তাদের সমর্থক জনগণ এখন কোন পথে যাবে? মনে পড়ে বর্তমান আল-কায়েদা নেতা ডাঃ আয়মন আল-জাওয়াহেরী চৌদ্দ বছর বয়সে ইখওয়ানুল মুসলেমীনে (মুসলিম ব্রাদারহুডে) যোগ দেন। পরে ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ঘেঁষা প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাছের ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করলে অন্যান্যদের সাথে তিনিও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কারাগারে নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। ফলে কারামুক্তির পরে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন। সে হিসাবে বলা যায় গণতন্ত্রের দাবীদারদের যুলুম-নির্যাতনই বিশ্বব্যাপী চরমপন্থী আন্দোলনসমূহের ব্যাপ্তিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই দেখা যায় মুরসি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আল-কায়েদা নেতা ডাঃ আয়মন তাঁকে ৫৮ মিনিটের এক দীর্ঘ অডিও বার্তা প্রেরণ করে বলেন, গণতন্ত্র একটি প্রতারণা মাত্র। এর মাধ্যমে আপনি মিসরের নির্যাতিত জনগণের বা অবরুদ্ধ ফিলিস্তীনীদের কোন কল্যাণ করতে পারবেন না'। এভাবে একদিকে পুরানো সাথী আয়মন আল-জাওয়াহেরীর তীব্র সমালোচনা এবং অন্যদিকে সেনাবাহিনী, আদালত ও আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর অসহযোগিতা ও সাথে সাথে বিরোধী দল সমূহের অন্যায় চাপ মুরসিকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলে।

এক্ষণে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ইসলামপন্থীরা কি করবে? জবাব হ'ল, তারা এর পক্ষে জনমত গঠন করবে এবং সরকারের প্রতি উপদেশদাতা ও চাপ সৃষ্টিকারী দল হিসাবে কাজ করবে। সরকারের ভাল

কাজের প্রশংসা করবে এবং মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে। তারা সর্বদা জনকল্যাণে কাজ করে যাবে। ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার আদায়ে সর্বদা সোচ্চার থাকবে। সরকারী যুলুম সহ্য করবে ও মন্দ লোকদের গালি হযম করবে। তথাপি জনবিচ্ছিন্ন হবে না। সকল কাজের লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। লক্ষ্যচ্যুত হ'লেই তারা কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত হারিয়ে যাবে জনান্তিকে। আর আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত দল কখনো জনগণের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না।

এক্ষেত্রে মিসরের সালাফীদের কথা স্মরণযোগ্য। ২০১১ সালের বিপ্লবে তারা খেই হারিয়ে রাতারাতি গণতন্ত্রী হয়ে যায়। অতঃপর আন-নূর পার্টি গঠন করে নির্বাচনে নেমে পড়ে। জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আগে থেকেই ছিল। ফলে তারা এককভাবে ১১১টি ও জোটগতভাবে ১২৩টি আসন লাভ করে। সেই সাথে মুরসির দলের ২৩৮টি মিলে তারা সরকারের পার্টনার হয়ে যায়। তাদের এই তাক লাগানো সাফল্যে চমকে যায় সবাই। তাদেরকে যিনি এপথে এনেছিলেন সেই তরুণ নেতা ইমাদুদ্দীন আবদুল গফুর প্রেসিডেন্ট মুরসির ঘনিষ্ঠ তিনজন উপদেষ্টার অন্যতম নির্বাচিত হন। তিনি আন-নূর পার্টিকে অন্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে বলেন। এতে সালাফীরা সঙ্গত কারণেই অসম্মত হন। তখন তিনি বেরিয়ে গিয়ে জানু'১৩ থেকে 'আল-ওয়াত্বান' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। ওয়াশিংটন পোষ্টের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমরা আমেরিকাকে আমাদের বন্ধু মনে করি'। আমরা বলি, আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের অন্য কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না। বরং এরাই সুকৌশলে সালাফীদের পথচ্যুত করেছে। বর্তমান বিপ্লবে আন-নূর পার্টি সেক্যুলারদের সঙ্গে এক হয়ে মুরসির পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু যখন দেখেছে যে, সেনাবাহিনীই রয়েছে মূল ক্ষমতায়, তখন আবার পিছুটান দিয়েছে। এখন তারা কারু সাথে নেই। অথচ সেনা সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৩৫ জনের সব সদস্যই সেক্যুলার। সেখানে কেউ ইসলামপন্থী নেই। এভাবে সালাফীরা আদর্শচ্যুত হয়ে একূল-ওকূল দু'কূল হারালো। জনগণের এতদিনের শ্রদ্ধাবোধ সবই নিমেষে উবে গেল। তারা ভেবে নিল সেক্যুলার ও ব্রাদারহুডের মত সালাফীরাও ক্ষমতা দখলের জন্য সবকিছু করে। বাংলাদেশের সালাফীদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মুরসির পতনে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামী শাসন ইসলামী তরীকায় আসতে হবে। আর তা হ'ল, দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনগণের রায় গ্রহণ করা। সেখানে যিনি খলীফা হবেন, তিনি সকল দল ও মতের লোকদের প্রতি ইসলামী নীতি অনুযায়ী সদাচরণ করবেন। সকলের দাবী-দাওয়া সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন। আল্লাহভীতি ও আনুগত্যের দর্শনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করবেন। বিদেশী চাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন। দেশবাসী যদি তার আন্তরিকতা বুঝতে পারে, তাহলে তারা তার জন্য জীবন দেবে। শত্রু-মিত্র সবাই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। এমতাবস্থায় বিদেশীরা চক্রান্ত করলেও ব্যর্থ হবে। আর নিহত হলেও তিনি হবেন 'শহীদ'। জনগণের হৃদয়ে তিনি থাকবেন প্রেরণার উৎস হয়ে। ইসলামী নেতারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবেন কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২৩৬]

৬৯. মালালা ও নাবীলা : ইতিহাসের দু'টি ভিন্ন চিত্র

গত ১০ই অক্টোবর সুইডেনের নোবেল কমিটি পাকিস্তানের ১৭ বছরের তরুণী মালালা ইউসুফযাঈকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। মালালা হ'ল এযাবৎকালের সর্বকনিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় নোবেল জয়ী। মালালা শান্তির জন্য কি কাজ করেছে যে, তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে? এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে নোবেল কমিটির সভাপতি বলেন, 'বয়সে তরুণ হলেও গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি নারীশিক্ষার অধিকার আদায়ে লড়াই চালিয়ে আসছেন। শিশু ও তরুণদের সামনে তিনি এই নযীর গড়েছেন যে, নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে তারাও অবদান রাখতে পারে। আর এ লড়াই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন সবচেয়ে বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে'। তখন একজন সাংবাদিক বলেন, Aspirations but has'nt actually done anything (স্রেফ আশাবাদ; কিন্তু বাস্তবে সে কিছুই করেনি)। একথা শুনে সভাপতির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তার মুখে কোন উত্তর ছিল না।

১৯৯৭ সালের ১২ই জুলাই পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার সিঙ্গোরা গ্রামে মালালার জন্ম। তার পিতা যিয়াউদ্দীন ইউসুফযাঈ এলাকায় একটি স্কুল

---

২৩৬. ১৬তম বর্ষ, ১১ম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১৩।

চালাতেন। অতঃপর ২০১২ সালের ৯ই অক্টোবর স্কুলযাত্রী ১৫ বছরের মালালাকে তালিবানরা গুলি করে। যা তার মুখে ও মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব মিডিয়ায় তালেবানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অতঃপর দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে মালালা এখন যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে পিতার সঙ্গে অবস্থান করছে। বর্তমানে সে বিশ্ব মিডিয়ায় শীর্ষ নারী এবং সকলের নিকট অতি পরিচিত একটি নাম। মালালা সর্বদা অহিংস নীতির কথা বলছে। অথচ তার জন্মস্থানেই যে আরেক নোবেলজয়ী ওবামার হুকুমে প্রায় প্রতিদিনই ড্রোন হামলা হচ্ছে এবং তাতে প্রাণ হারাচ্ছে অগণিত নিরপরাধ নারী-শিশু, সে বিষয়ে মালালার কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না। মালালার নোবেল প্রাপ্তির ৭ দিনের মাথায় ইস্রাঈলী সেনাবাহিনী গাযায় ১৩ বছরের এক কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে। এমনকি গত জুলাইয়ে সর্বশেষ ইস্রাঈল-হামাস যুদ্ধে ওবামার দেওয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যে ইস্রাঈল পাঁচ শতাধিক নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও মালালার কোন শব্দ শোনা যায়নি। তাহ'লে ব্যাপারটা আসলে কি?

এবার চলুন, ইতিহাসের আরেকটি চিত্র অবলোকন করি। মালালা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ১৫ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ২৫শে অক্টোবর একই এলাকা পাকিস্তানের উত্তর ওয়াযীরিস্তানে ৯ বছরের শিশুকন্যা নাবীলা তার ৬৭ বছরের দাদীর সাথে বাড়ীর পাশে নিজেদের ক্ষেত থেকে সবজি তুলছিল। এমন সময় মার্কিন ড্রোন বিমানের হামলায় দাদী নিহত হন ও নাবীলা গুরুতরভাবে আহত হয়। যাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই মর্মান্তিক ঘটনা বিশ্ব মিডিয়ায় কভারেজ পায়নি। অতঃপর কিছুটা সুস্থ হয়ে নাবীলা পিতার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে যায় দাদী হত্যার বিচার চাইতে। মার্কিন কংগ্রেসের শুনানীতে প্রায় ৪৩০ জন সদস্যের মধ্য থেকে মাত্র ৫ জন আসেন নাবীলার কথা শুনতে। নাবীলার পিতা দোভাষীর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে তার অভিযোগ পেশ করে বলেন, একজন শিক্ষক হিসাবে আমি আমেরিকানদের জানাতে চাই যে, আমার পরিবার ও সন্তানেরা কতই না ক্ষত-বিক্ষত'! এ সময় তার দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। নাবীলা প্রশ্ন করল, আমার দাদীর কি অপরাধ ছিল? পিনপতন নীরবতায় সেদিন উক্ত প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয়নি। বরং মার্কিন আইন প্রণেতাগণ ও তাদের আদালত বিষয়টিকে চরমভাবে 'অবজ্ঞা' করে এবং নাবীলা

ও তার পরিবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলাচলে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। সাংবাদিকদের সংস্পর্শে যাতে তারা যেতে না পারে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। উল্টা সেদেশের কথিত স্বাধীন গণমাধ্যম তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আগমনকে 'আন-ওয়েলকামড' (অবাঞ্ছিত) বলে শিরোনাম করে।

মালালা ও নাবীলা একই স্থানের একই রকম মর্মান্তিক ঘটনার শিকার। অথচ বিশ্বব্যাপী তার প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত দুই চিত্র দেখা গেল। এর কারণ, মালালা কথিত তালেবান আক্রমণের শিকার। যাকে প্রতীক হিসাবে দেখিয়ে বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্যের কথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের' বৈধতা দেওয়া যায়। পক্ষান্তরে নাবীলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের নায়কদের আসল চেহারা বিশ্বের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে। যা পাশ্চাত্য সর্বদা গোপন রাখতে চায়। মালালাকে নোবেল পুরস্কার ধরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য অপশক্তি বছরের পর বছর ধরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তাদের অব্যাহত গণহত্যাকে আড়াল করতে চায়। ঠিক যেমন আফগানিস্তান দখলের অজুহাত সৃষ্টির জন্য তারা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিজেরা বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়ে তালেবানের উপর দোষ চাপায়। অতঃপর তালেবানের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তানে হামলা চালায়। অথচ এই তালেবান তাদেরই সৃষ্টি।

মালালা কে? পাকিস্তানের ইংরেজী দৈনিক ডন পত্রিকায় ২০১৩ সালের ১১ই অক্টোবর সংখ্যায় Malala : The real story (with evidence) 'মালালা : আসল কাহিনী (সাক্ষ্য-প্রমাণসহ)' শিরোনামে যে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয় যে, মালালা পাকিস্তানী মুসলিম মেয়ে নয়, বরং ১৯৯৭ সালে পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরীতে তার জন্ম এক খ্রিষ্টান মিশনারী পরিবারে। তার আসল নাম 'জেন'। ২০০২ সালে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে পাকিস্তানের সোয়াত ভ্রমণে আসেন এবং মালালার বর্তমান পিতা-মাতা গোপনে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে ঐ মিশনারীর পক্ষ হতে জেন-কে দান করা হয়। অতঃপর 'জেন' হয়ে যায় 'মালালা ইউসুফযাঈ'। তারা জেন-এর বর্তমান উচ্চাভিলাষী পিতা যিয়াউদ্দীন ইউসুফযাঈকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগায় এবং মালালা ও তার কথিত পিতাকে দিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কল্পকথা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে

তাদের পরিচিতি তুঙ্গে উঠলে মালালাকে গুলি করা হয় কথিত তালেবানকে দিয়ে। কিন্তু মালালা মরে না। চিকিৎসার নামে তাকে ও তার পরিবারকে উড়িয়ে নেয়া হয় আমেরিকায়। অতঃপর সে এখন হয়ে গেল শান্তিতে নোবেল জয়ী। কি চমৎকার নাটক! আসলে কি তালেবান তাকে গুলি করেছিল? ঐ শ্যুটারের ডিএনএ টেস্ট করে দেখা গেছে যে, সেও মালালার মত বিদেশী রক্তের অধিকারী। সম্ভবতঃ ইতালীর লোক। যাকে দক্ষ তালেবান সাজিয়ে এই হামলা করানো হয়েছে। যাতে মালালা না মরে। অথচ কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানী ও মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্সীগুলি যৌথভাবে এই নাটক মঞ্চস্থ করে। ডন-এর এই অনুসন্ধানী রিপোর্টে বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হলেও পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলি এ বিষয়ে নীরব থাকে। এমনকি নোবেল পুরস্কার পেতেও তাতে বাধা হয়নি। পাকিস্তানের একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মুলতানের জামশেদ দাস্তি তাই বলেছেন, ইসলাম ও তালেবানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র মালালাকে ব্যবহার করেছে'। একইভাবে বর্তমানে ইরাকের আইএস তাদেরই সৃষ্টি বলে পাশ্চাত্যের অনেক যুদ্ধবিশারদ মন্তব্য করেছেন। অতএব ইসলামের অকৃত্রিম অনুসারীগণ কখনোই তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেবে না, এটাই কাম্য।[২৩৭]

---

২৩৭. ১৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৪।

আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্ট অবলম্বনে মালালার ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলাম আমাদের মূল বিষয়বস্তুর সমর্থক হিসাবে। পরে ইন্টারনেট যাচাইয়ে দেখা যায় যে, লেখাটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক ও কাল্পনিক। বৃহৎশক্তিবর্গ বন্ধুবেশে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অবিরতভাবে যেসব অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অত্র ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক Dawn ২০১৩ সালের ১১ই অক্টোবর মালালাকে নিয়ে একটি 'অনুসন্ধানী' প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যা নিয়ে সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়। অনেকে এটাকে সত্যি ভেবে প্রকাশ করে দেয়। যেমন পাকিস্তানের Lahore Times ও ইরানের Press TV সহ বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পরে এটি 'প্রতারণাপূর্ণ ও অবাস্তব' (Fraud unearthed) বলে প্রকাশ করা হয়। অতএব ঘটনাটি স্রেফ একটি গল্প ধারণা করে মূল বিষয়বস্তুটি অনুধাবনের জন্য পাঠকদের প্রতি পরামর্শ রইল।

উল্লেখ্য যে, সাংবাদিকতায় এ ধরনের ফিকশন নতুন কিছু নয়। বিদেশে এগুলি প্রায়ই ছাপা হয়। তবে এতে বিপদের ঝুঁকি থাকে। এর উদাহরণ আমাদের দেশেই রয়েছে। যেমন প্রখ্যাত সাংবাদিক শফিক রেহমান তাঁর জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন'-য়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে এ ধরনের ফিকশন লিখে বিপদে পড়েছিলেন। জেনারেল এরশাদ তাকে দেশছাড়া

৭০. নেপালের ভূমিকম্প ও আমাদের শিক্ষণীয়

গত ২৫শে এপ্রিল শনিবার বাংলাদেশ সময় বেলা ১২-টা ১১ মিনিটে ঘটে গেল উপমহাদেশে শতাব্দী কালের ইতিহাসে ভয়ংকরতম ভূমিকম্প। যার উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে ৮০ কি.মি. পূর্বে। এটি ছিল বিগত ২০৫ বছরের ইতিহাসে কাঠমাণ্ডুতে ৫ম শক্তিশালী ভূকম্পন। এরপরই সেখানে থেকে থেকে ৫০টি ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়ে গেছে। গত ১২ই মে মঙ্গলবার দুপুর ১-টা ৫মিনিটে পুনরায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে পুরা উপমহাদেশ। এরও উৎপত্তিস্থল ছিল কাঠমাণ্ডু থেকে ৮৩ কি.মি. পূর্বে এভারেস্ট-এর কাছে নামচি বাজার। প্রথমটির কেন্দ্রস্থল ছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৪.৮ কি.মি. গভীরে এবং এবারেরটির ছিল ১৯ কি.মি. গভীরে। এ সময় ২৪ ঘণ্টায় ৩১ বার কেঁপে উঠে পৃথিবী। রাজধানী কাঠমাণ্ডু তার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে গেছে এবং হিমালয় পর্বত তার অবস্থান থেকে কিছু নীচে নেমে গেছে। এভাবে লাগাতার ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবী ক্রমেই এগিয়ে চলেছে মহাপ্রলয়ের দিকে। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী নেপালের ২৫শে এপ্রিলের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের চাইতে ৩২ গুণ তীব্রতা নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছে আরেকটি মহা ভূমিকম্প। যাতে পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুরা অঞ্চল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভূগর্ভস্থ টেকটনিক প্লেট সমূহের পরস্পরের সংঘর্ষে ভূমিকম্প হয়। বিজ্ঞানের দৌলতে কারণ জানা সহজ হয়েছে। কিন্তু কারণ যিনি ঘটান, তিনি কে এবং কেন ঘটান, তার জবাব বিজ্ঞান দিতে পারেনি। অতএব এরূপ ঘটনা মানুষকে বাধ্য করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস আনতে।

দূর অতীতে নবী শু'আইব (আঃ)-এর কওম মাদিয়ানবাসীদের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে এসেছিল ভূমিকম্পের মাধ্যমে *(হূদ ১১/৯৪; আনকাবূত ২৯/৩৭)*। সেই সাথে ছিল সপ্তাহব্যাপী ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অবশেষে বজ্রনিনাদ *(আ'রাফ*

করেন। তাঁর পতনের আগ পর্যন্ত শফিক রেহমান আর দেশে ফিরতে পারেননি। বর্তমানে ৮১ বছর বয়সে (এপ্রিল ২০১৬) তিনি অন্য একটি সরকারী মামলায় কারাগারে। -*লেখক*।

৭/৮৮)। যা তাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। কি অপরাধ ছিল তাদের? আল্লাহ বলেন, ‘আর আমরা মাদিয়ানের প্রতি তাদের ভাই শো‘আয়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার স্বজাতিকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে প্রমাণ (অর্থাৎ নবুঅত) এসে গেছে। অতএব তোমরা ওযন ও মাপ পূর্ণ মাত্রায় দাও। মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(আ‘রাফ ৭/৮৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘আর আমরা মাদিয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শো‘আয়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও বিচার দিবসে (প্রতিদান) কামনা কর। আর তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না’। ‘কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করল। অতঃপর তারা স্ব স্ব গৃহে মরে পড়ে রইল’। ‘আর আমরা ‘আদ ও ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদের অপকর্ম সমূহকে শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করেছিল। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিয়েছিল। অথচ তারা এর পরিণাম বুঝত’ *(আনকাবূত ২৯/৩৬-৩৮)*। তিনি আরও বলেন, ‘তারা বলল, হে শো‘আয়েব! তোমার ছালাত কি তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসবের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি?...’ *(হূদ ১১/৮৭)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে নিম্নোক্ত কারণগুলি প্রতিভাত হয়। যেমন (১) আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক নষ্ট করা : তারা আল্লাহকে ছেড়ে বিভিন্ন সৃষ্টিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বৈষয়িক বিষয়গুলিকে আল্লাহ্র আনুগত্য হ’তে মুক্ত ভেবেছিল। পৃথিবীর ঘোষিত একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকে। তাদের পুরোহিতরা বলেছে দেব-দেবীরা নাখোশ হওয়াতেই ভূমিকম্প হয়েছে। যারা নিয়মিত দেব-দেবীর পূজা দিত, তারা নাকি ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছে। হাতে গড়া মূর্তি কিছুই

করার ক্ষমতা রাখেনা। তবুও আধুনিক যুগের কথিত জ্ঞানী মানুষেরা এসবেরই পূজা করে ও তাদেরকে মহা শক্তিধর মনে করে। অথচ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায়। পাশাপাশি আমরা যারা মুসলিম, তারা মৃতদের কবরপূজায় লিপ্ত। আরেকদল আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে মানুষের মনগড়া বিধান পূজায় লিপ্ত। ফলে উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ্র দাসত্ব নির্বাসিত। (২) পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা : আল্লাহ্র নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমরা কিন্তু সেটাই করছি। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের ৭৯ শতাংশ মেধাশক্তি ব্যয়িত হচ্ছে মারণাস্ত্র তৈরীতে। সেই সাথে চলছে সর্বত্র নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লড়াই। চলছে যুদ্ধ ও ধ্বংসের মাধ্যমে পৃথিবীকে লুটেপুটে খাওয়ার প্রতিযোগিতা। সমৃদ্ধ দেশগুলির অগণিত শিল্পকারখানার অবিরতভাবে ধোঁয়া উদ্গীরণের ফলে বায়ুমণ্ডল ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠছে। ফলে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ পানির উৎস দক্ষিণ গোলার্ধের ২.৬ কি.মি. পুরু বরফাচ্ছাদিত এ্যানটার্কটিকা মহাদেশ থেকে এখন পরিমাণের চাইতে বেশী গলতে শুরু করেছে। একইভাবে উত্তর মেরুর বাইরে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বরফের স্তূপ রয়েছে ‘ওয়াটার টাওয়ার অফ এশিয়া’ বলে খ্যাত হিমালয় পর্বতমালায়। যা এশিয়া মহাদেশের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মেকং, হোয়াংহো সহ ৭টি বড় বড় নদীকে পানির যোগান দেয়। চীন, মিয়ানমার ও ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ যে পানির উপরে নির্ভরশীল। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলে যাচ্ছে। যা আশপাশের দেশগুলিকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

মানব সৃষ্ট এসব বিপর্যয়ের ফলেই নেমে আসছে একের পর এক আল্লাহ্র গযব। বর্তমান ভূমিকম্প মহান আল্লাহ্র তেমনই একটি মহা পরীক্ষা। যাতে বান্দা আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরে আসে। এই ভূমিকম্প নেপালে হ’লেও এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববাসী সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসবেন কি? আল্লাহ আমাদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুগত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন![২৩৮]

---

২৩৮. ১৮তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১৫।

মুসলিম বিশ্ব

৭১. গাযায় গণহত্যা ইহূদীবাদীদের পতনঘণ্টা

মিথ্যা অজুহাতে গত ৮ই জুলাই থেকে গাযায় ইস্রাঈলের একতরফা গণহত্যা চলছে। সারা বিশ্ব চেয়ে চেয়ে দেখছে। যাদের ক্ষমতা নেই, তারা চোখের পানি ফেলছে, প্রতিবাদ করছে, মিছিল-মিটিং করছে ও আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণভরে দো'আ করছে। পক্ষান্তরে যাদের ক্ষমতা আছে, তারা নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য ও রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে চুপ করে আছে। অন্যদিকে ইস্রাঈলের অবৈধ জন্মদাতাদের বর্তমান নেতা বিশ্ব শান্তিতে নোবেল পুরস্কারধারী কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রকাশ্যভাবে এই গণহত্যার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, ইস্রাঈলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে'। অতএব এজন্য তিনি ২২ কোটি ডলারের অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করেছেন ইস্রাঈলের নিকট।

সাম্প্রতিক এ জঘন্যতম হামলা হঠাৎ করে হয়নি। বরং দীর্ঘ পরিকল্পনার মঞ্চায়ন মাত্র। ১৯৪৮ সালে পাশ্চাত্য বলয়ের সরাসরি মদদে ফিলিস্তীনীদেরকে তাদের হাযার বছরের আবাসভূমি থেকে হটিয়ে সেখানে হিটলারের হাতে বিতাড়িত ইহূদীদের সারা দুনিয়া থেকে এনে জড়ো করা হয় এবং 'ইস্রাঈল' নামে একটি অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ৬০ লাখ ইহূদীকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করার পর হিটলার নাকি বলেছিলেন, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু ইহূদী এখনো বেঁচে থাকল। এরা যে কত নিকৃষ্ট, এদের আচরণেই লোকেরা টের পাবে। আর তখনই লোকেরা বলবে, কেন আমি ওদেরকে এভাবে হত্যা করেছি'। বর্তমান পৃথিবীতে ইহূদীদের মোট জনসংখ্যা মাত্র ০.১৯% (২০০৯)। অথচ তারাই এখন বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদের মাত্র ৩টি প্রস্তাব অমান্য করায় আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোট ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল। অথচ ৬৭টি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে বিশ্বসংস্থা কিছুই করতে পারল না। উল্টা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী বৃটেন-আমেরিকা সর্বদা তাদের পাশে থাকছে। কারণ এটা তাদেরই সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনী মাত্র। যার উদ্দেশ্য হ'ল, ইস্রাঈলকে লেলিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে কবজায় রাখা। আর

মধ্যপ্রাচ্যকে কব্জায় রাখার অর্থ হ'ল মুসলিম দুনিয়াকে কব্জায় রাখা। আল্লাহ্‌র রহমতে বিশ্বের সকল সম্পদের সিংহ ভাগের মালিক হ'ল মুসলিম বিশ্ব। এরা যদি কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহ'লে খ্রিষ্টান বিশ্ব চোখে অন্ধকার দেখবে। যদিও প্রকৃত ইসলামী শাসন কখনো কারু জন্য হুমকি নয়। তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বিগত ইসলামী খেলাফত সমূহ।

১৯৪৮ সাল থেকে ফিলিস্তীনীরা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করছে। আর যারা ভূমি কামড়ে পড়ে আছে, তারা ইস্রাঈলী বর্বরতার শিকার হয়ে সর্বদা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বাস করছে। মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা হৃদয়ে দরদ অনুভব করলেও তারা কার্যত নীরব। তার কারণ একাধিক। যেমন (১) তারা তাওহীদ ছেড়ে শিরকী মতবাদ সমূহকে লালন করছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ছেড়ে মানুষের উপর ভরসা করছে। যারা এক সময় ঐক্যবদ্ধভাবে চালকের ভূমিকায় ছিল, তারাই এখন বিভক্ত হয়ে চালিতের কাতারে এসে গেছে। ফলে তারা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

(২) পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব। সব দেশেই এগুলি থাকে। কিন্তু এগুলি বড় ক্ষতি ডেকে আনে তখনই, যখন তার দ্বারা বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বে যেকোন স্থানে কোন মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে সব স্বার্থ ভুলে সবাইকে তার পাশে দাঁড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্য ছিল। যেমন ইরাকের ৭ লাখ খ্রিষ্টানকে বাঁচানোর অজুহাতে আমেরিকা সেখানে ইসলামিক স্টেট যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একটানা কয়েকদিন বিমান হামলা চালালো। অথচ ফিলিস্তীনের নির্যাতিত ১৮ লাখ মুসলিম নর-নারীকে লক্ষাধিক বর্বর ইহূদী সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচানোর জন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রকাশ্যে এগিয়ে যায়নি। কারণ তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে বৃহৎ ইসলামী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারেনি।

ইহূদীরা আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত জাতি। আল্লাহ বলেন, তাদের উপর আরোপ করা হ'ল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। ... কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী' *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত ও মানুষ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই ওদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১১৩)*। ইহূদী-নাছারাদের পথে

না যাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে প্রতি রাক'আত ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে।

এক্ষণে এদের দুষ্কর্ম থেকে বাঁচার একটাই পথ, এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করা। এখন 'হামাস' রকেট হামলার মাধ্যমে সীমিতভাবে যে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে নয়, স্রেফ যুদ্ধের টার্গেটে মারতে হবে। তাহ'লে সাধারণ ইস্রাঈলীরা হামাসের পক্ষে থাকবে। আর মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সরকারী ও বেসরকারীভাবে ইস্রাঈলের সাথে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করুক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুক। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পানিসীমা ও আকাশসীমা দিয়ে ইস্রাঈলের ও তাকে সাহায্যকারীদের জাহায ও বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করুক। সেই সাথে জাতিসংঘে ও নিরাপত্তা পরিষদে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যোরদার করুক। আশার কথা এই যে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি এখন ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। ইতিমধ্যে বলিভিয়া ইস্রাঈলকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। অতএব যে আমেরিকা ও বৃটেনের প্রতিশ্রুতির উপর ইস্রাঈল টিকে আছে, আশা করি তারা নিজেদের বাঁচার স্বার্থে ঐ প্রতিশ্রুতির বন্ধন ছিন্ন করবে। সাথে সাথে ইস্রাঈল রাষ্ট্র পৃথিবী থেকে হাওয়া হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, কিছু কষ্ট দেওয়া ব্যতীত ওরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তারা অবশ্যই পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। তখন ইনশাআল্লাহ ইস্রাঈলের সৎকর্মশীল লোকেরা মুসলমান হয়ে যাবে। অথবা মুসলমানদের অনুগত হবে। যেমন ইতিমধ্যেই শান্তিপ্রিয় ইস্রাঈলীরা রাজধানী তেলআবিবে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এবং ফিলিস্তীনীদের উপর হামলা বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

অতএব যদি হামাস ইস্রাঈলের সাথে সন্ধিচুক্তি না করে এবং তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। আর যদি তারা স্রেফ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তাহ'লে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সন্ত্রাসীনেতা বেনিয়ামীন নেতানিয়াহু ও তার দোসরদের পতন হবে এবং ইহূদীবাদী ইস্রাঈল ইসলামী ফিলিস্তীনে পরিণত হবে *ইনশাআল্লাহ*।[২৩৯]

---

২৩৯. ১৭তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৪।

৭২. উন্মত্ত হিংসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ

গত ১৬ই ডিসেম্বর সকালে পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুলে 'তাহরীকে তালেবান পাকিস্তান' (টিটিপি) হামলায় বার্ষিক পরীক্ষারত ১৩২ জন শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-অভিভাবক ও কর্মকর্তা মিলে ১৪৫ জনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমরা গভীর ভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। আমরা এ ঘটনার নায়কদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানাই। হিংস্র মানুষ যে হিংস্র পশুর চাইতে নিকৃষ্ট এটা তার অন্যতম প্রমাণ। ঘটনার নায়ক ছয়জন আত্মঘাতিকে তাদের নেতারা শহীদ ও জাতীয় বীর আখ্যা দিয়েছে এবং আরও এরূপ হামলা হবে বলে পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। ওদিকে পাক সেনাপ্রধান ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩০০০ তালেবান জঙ্গিকে ফাঁসিতে ঝুলাবার জন্য সেদেশের সরকারের প্রতি আল্টিমেটাম দিয়েছেন এবং ঘটনার পরদিন থেকেই তাঁর হুকুমে তালেবান এলাকায় সমানে বিমান হামলা চলছে। তাতে গত কয়দিনে শতাধিক মরেছে ও এখনো মরছে। ১৯৭১ সালে টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীদের কণ্ঠে যে হুংকার আমরা শুনেছিলাম, 'আদমী নেহী, মেট্টী চাহিয়ে' আজও সেকথাই শুনছি পাক সেনাপতির কণ্ঠে। সেদিনের সেই যুলুমের পরিণতিতে তারা পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছিল। কিন্তু তাদের শিক্ষা হয়নি। সেনাপতি বুঝেন না যে, তিন হাযার মারলে বহু হাযার মরবে। এমনকি তার নিজের পরিবার ও সন্তানেরাও হামলার শিকার হতে পারে। কেননা হিংসা কেবল হিংসাই আনয়ন করে। ওদিকে পাক সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ড বাতিলের আইন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে এখন কারাগারে থাকা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকশ' তালেবানের ফাঁসি দ্রুত কার্যকর করা হবে। সব মিলিয়ে পাকিস্তানে নতুন করে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে সরকার বনাম তালেবানের মধ্যে। পার্থক্য এই যে, সরকার জনগণের কাছে ও আইনের কাছে দায়বদ্ধ। তালেবানরা তা নয়। তাই তারা যা পারে, সরকার তা পারবে না। অতএব এ যুদ্ধে সরকার হারবে এটা নিশ্চিত। অবশেষে তারা হয় সন্ধি করবে অথবা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর এটাই ইসলামের শত্রুদের লক্ষ্য। তালেবানরা বলেছে 'স্বজন হারানোর বেদনা বুঝাতেই তারা এ হামলা করেছে'। কারণ সরকার তাদের উপর আমেরিকার বিমান হামলা বন্ধ করতে পারেনি। তদুপরি আমেরিকাকে খুশী করতে গিয়ে গত কয়েক

বছর ধরে সরকার তাদের উপর সেনা হামলা চালাচ্ছে। ইতিপূর্বে রাতের অন্ধকারে হামলা করে সেনাবাহিনী তাদের ৮৬ জনকে এক সাথে হত্যা করেছে। সেনা পরিচালিত যারব-ই-আযব অপারেশনে ইতিমধ্যে ১৬০০ তালেবান ও নারী-শিশু নিহত হয়েছে। তারা বলছে, এখন আমরা প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমাদের কোন সহযোগীকে ফাঁসি দেওয়া হলে প্রধানমন্ত্রীর পরিবার সহ পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও সেনা কর্মকর্তাদের সন্তানদের হত্যা করা শুরু হবে। আমরা নেতাদের গৃহগুলিকে শোকের আধারে পরিণত করব'।

মুশকিল হ'ল এই যে, উভয় পক্ষ ইসলামের দাবী করছে। তালেবানরা তাদের ভাষায়, তাগূতী সরকার হটিয়ে ইসলামী খেলাফত কায়েমের জন্য 'জিহাদ' করছে। অন্যদিকে পাক সরকার ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত দেশটিতে ইসলাম টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তালেবানদের হত্যা করছে। অথচ এখানে কেবলই রয়েছে ক্ষমতার লড়াই, ইসলামের কিছু নেই। কেননা ইসলামের জন্য হ'লে ইসলামী বিধান ও নীতি-আদর্শ মেনে চলতে হয়। বিগত ৬৬ বছর যাবত পাকিস্তান খ্রিষ্টানী রাজনীতি ও ইহূদী অর্থনীতি অনুসরণ করছে। তারা নগ্নভাবে পরাশক্তিগুলির লেজুড়বৃত্তি করছে। অন্যদিকে তালেবানরাও আমেরিকার সৃষ্টি। তাদেরকে ব্যবহার করেই তারা আফগানিস্তান থেকে রাশিয়াকে হটাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এখন তারাই হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে 'সন্ত্রাসী'। যে পাক সরকার তাদেরকে কাজে লাগিয়েছে, তারাই এখন তাদেরকে মারছে পাশ্চাত্যকে খুশী করার জন্য। পাকিস্তান সরকার সেদেশে ইসলামী শাসন কায়েম করেনি, এটা সুস্পষ্ট। কিন্তু তালেবান যারা ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা কি ইসলামী বিধান মেনে তাদের কথিত জিহাদ পরিচালনা করছে?

ইসলামের প্রতিশোধ নীতি কি? আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহ'লে অতটুকু নাও যতটুকু তোমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ছবর কর, তাহ'লে সেটাই ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম হবে' *(নাহল ১৬/১২৬)*। এখানে সরকার ও তালেবান উভয় পক্ষই ইসলামের ধৈর্যধারণ নীতি লংঘন করেছে। আল্লাহ বলেন, একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। অথচ তালেবানরা মারল নিরপরাধ শিশুদের। এটাতো কাফেরদের নীতি। গত ৮ই জুলাই'১৪ থেকে ৫১ দিন ব্যাপী একতরফাভাবে

ইস্রাঈল গাযায় বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ছাড়াও সেখানে প্রায় আড়াই হাযার মুসলিমকে হত্যা করে। তার মধ্যে প্রায় ৮০০ শিশু-কিশোর এবং অসংখ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী-পুরুষ ছিল। তখন কিন্তু বিশ্বশান্তির মোড়লরা কিছুই বলেনি। কেননা এগুলি তাদের যুদ্ধনীতিতে কোন অপরাধ নয়। কিন্তু ইসলামী শাসন কায়েমকারীরা কোন অজুহাতেই ইসলামী বিধান লংঘন করতে পারে না।

ইসলামের যুদ্ধনীতি কি? 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে আল্লাহভীতির নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে গমন কর এবং যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের সাথে যুদ্ধ কর...।[২৪০] অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর, তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ করো কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না'।[২৪১] আরেকটি বিষয় হ'ল, সরকার ও তালেবান দু'পক্ষের বিধান কি সমান? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজ অপসন্দনীয় মনে করে, সে যেন তাতে ছবর করে'।[২৪২] অতএব সরকার যুলুম করলেও তাতে ধৈর্য ধারণ করাই হ'ল ইসলামের নীতি।

সবশেষে পাকিস্তান সরকার কি কাফের? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৪৩] এক্ষণে কোন মুসলিম সরকার ইসলাম কায়েম না করলে তারা বেশীর বেশী ফাসেক বা যালেম হ'তে পারে। কাফের কখনোই নয়। তাদের রক্ত হালাল নয়। মায়েদাহ ৪৪ আয়াতে যে তাদেরকে 'কাফের' বলা হয়েছে, তার অর্থ ঐ কাফের নয়, যার জন্য তারা ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যায়। এটাই হ'ল ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা। তাছাড়া ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে একই অপরাধে তাদের 'যালেম' ও 'ফাসেক' বলা হয়েছে। কিন্তু তালেবানরা

---

২৪০. মুসলিম হা/১৭৩১; মিশকাত হা/৩৯২৯।
২৪১. মুসলিম হা/১৭৩১; আহমাদ হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৩৯২৯।
২৪২. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
২৪৩. বুখারী হা/১২৮; মুসলিম হা/৩২; মিশকাত হা/২৫।

মুসলিম সরকারকে সরাসরি তাগূত ও কাফের বলছে। বিভিন্ন দেশে তাদের অনুসারীরা একই আক্বীদা পোষণ করে। ফলে তাদের এই চরমপন্থী আক্বীদা ও হঠকারী কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলাম সর্বত্র প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যার সুযোগ নিচ্ছে বিরোধীরা।

এক্ষণে দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় কি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা? না। বরং সে পথ হ'ল, উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা। সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা। অবশেষে যালেম সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা'। মনে রাখতে হবে, মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ফরয, ইসলামকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো মুমিনের উপর ফরয করা হয়নি। আমাদের দাওয়াত জনগণ কবুল করলে এবং আমাদের নিঃস্বার্থপরতায় আল্লাহ খুশী হলে তিনি যেকোন সময় আমাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসাবেন। এটা তাঁর এখতিয়ার। অতএব সকলের প্রতি আবেদন, চরমপন্থা ও হঠকারিতা পরিহার করুন। মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২৪৪]

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***

২৪৪. ১৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৫।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	নবীদের কাহিনী-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)]	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	দিগদর্শন-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	শবেবরাত (৪র্থ সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	ইনসানে কামেল (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents